ঘুড়ী



দেবদাস ঘোষ

সুধেন্দু শেখর দাশ-গুপ্ত'কে

কুট্টি,

ঝর্ণা যদি উৎসের ঋণ অস্বীকার করে
তবে তাকে যেতে হয় অচিরেই শুকিয়ে;
তাই, তোমার কর-পদ্মে এই দীন-অর্ঘ
অর্পন করে কৃতার্থ হ'তে চাই—

দেবদাস

মূল্য তিন টাকা

বোস প্রেস, মজঃফরপুর, জে. সিং কর্ত্তৃক
মুদ্রিত।

প্রথমোক্তি

ধ্যান-তন্ময়তা কিচ্ছু না; কিন্তু আবার অসহিষ্ণু কিংবা বিক্ষিপ্তচিত্ত লোকের উপন্যাস পড়ার মনোভাবও না। শুধু মনশ্চঞ্চলতা কোনো রকমে একটু দমিয়ে তূষ্ণীভূত হ'য়ে আমাদের জীবনের ঘটনাগুলি নিরীক্ষণ করলে সব চেয়ে যে-জিনিষটি খুব বেশী বিস্ময়ের সৃষ্টি করে,—সেটা হ'চ্ছে মানুষের স্পর্দ্ধিত-বাক্যের প্রতিক্রিয়া।···অহং সর্ব্বস্ব মনুষ্য-হৃদয় আত্ম-গরিমারূপ হলাহলে পরিপূর্ণ। তাই বিকার-সলিলে-নিমজ্জিত-মানুষ নিজের বর্ত্তমান অবস্থাকে সর্ব্বকালের জন্য একেবারে নিজস্ব মনে করে নিয়ে কথায় কাজে সহ-যাত্রীদের নির্ম্মমভাবে আঘাত হেনে চলে কোনো দিকে দৃক্‌পাত না করে···আর তার বক্ষ-জ্বালা-রূপ-বিষ বাক্যে মিশ্রিত করে; সেই বিষ মিশ্রিত বাক্যই তার নীচের প্রতি ক্রূর বচন, সমশ্রেণীর প্রতি প্রীতিভাষণ এবং উচ্চের প্রতি আক্রোশ-আলাপ। এই 'ভাব' মানুষের হৃদয় বৃত্তির এক অদ্ভুত রসায়ন! আর এই জিনিষটাই হ'চ্ছে তার ওজনদাঁড়ি। যা'-দিয়ে সে মাপ করে সব কিছু। যার জন্য প্রতি পদে পদে হ'তে হ'চ্ছে তাকে প্রতিহত।···ওই জিনিষটাই তার পরিণাম-দর্শনের ক্ষমতাকে রেখেছে পঙ্গু করে। ভবিতব্যের পট-ভূমিকায় তার কল্পিত 'সুন্দর' বিকলাঙ্গ হ'য়ে ফুটে উঠছে: 'কাল' তার চোখের সামনে সেটাকে ধরল তুলে, সেদিকে তার দৃষ্টিই গেল না। সে চাইছে সহযাত্রীকে পিছু ফেলে অগ্রসর হ'তে;

কিন্তু কার ক্রূর নিয়মে সে পড়ে যাচ্ছে যোজনাধিক পিছুতে!····
পরলোক পর্য্যন্ত অবসর চিন্তাটা মানুষের মন-গড়া; তার ভালো-মন্দের পারিশ্রমিক চুকে যায় এইখানেই।····সেইটে দেখাবার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস—কতদূর সফল হ'ল, তা' সুধীজনের বিচার্য্য। যেখানে 'কাল' কথাটার উল্লেখ করেছি, সেটা অতি-মানবিক শক্তিকে বোঝাতে চেয়েছি।

অভিজ্ঞ প্রুফ রীডার মুদ্রণ কার্য্যে পরম সহায়ক; যার অভাবে মাঝে মাঝে অবাঞ্ছিত ভুল চুক রয়ে গেল একটু আধটু। সহৃদয় পাঠক-পাঠিকা এটা ক্ষমার চোক্ষে দেখবেন আশা করি।

মজঃফরপুর
১৯শে এপ্রিল '৪৪

দেবদাস ঘোষ

আমার মাথা নত ক'রে দাও হে তোমার

চরণ-ধূলার তলে।

সকল অহঙ্কার হে আমার

ডুবাও চোখের জলে।

নিজেরে করিতে গৌরব দান,

নিজেরে কেবলি করি অপমান,

আপনারে শুধু ঘেরিয়া ঘেরিয়া

ঘুরে মরি পলে পলে।

সকল অহঙ্কার হে আমার

ডুবাও চোখের জলে।

—গুরুদেব

বালুপুর গ্রামের উত্তর প্রান্তে এসে দাঁড়িয়ে পূর্ব্ব-উত্তর-পশ্চিম দিগন্ত-বিস্তৃত মাঠটার প্রতি তাকালে প্রথমেই চোখে পড়বে একটা আঁকা বাঁকা সামা রেখা; মনে হবে যেন দু'টি প্রদেশ বা ঐ রকমই কোনো কিছু একটা উদ্দেশ্য নিয়ে মাঠটাকে দু'ভাগে ভাগ করা হ'য়েছে। কিন্তু তা' নয়; ওটি একটি নদী, আর তার দু'তারে তাল-বন-জাম বেনা প্রভৃতি বনবৃক্ষ জন্মে ওই রেখাটি সৃষ্টি করেছে। নদীটি উত্তর দিকে প্রায় দু' মাইল দূরে একটা আমবাগানের—যেটা প্রকাশ্য দিবালোকেও মনে হ'বে কে যেন পুঞ্জিভূত অন্ধকার স্তূপী-কৃত করে রেখেছে—কোণ ঘেঁসে সোজা দক্ষিণ দিকে প্রায় মাইল খানেক চলে এসেছে; এসে পশ্চিম দিকে প্রায় আধ মাইল ঘুরে পূর্ব্ব দক্ষিণ কোণাকোণি ভাবে বেড়িয়ে গিয়েছে। এখন নদীটি যেখান থেকে বেঁকে পশ্চিম দিকে ঘুরে গিয়েছে সেইখানে দাঁড়িয়ে কেউ যদি ভাবে যে নদীটা প্রথম যখন এখান দিয়ে বেয়ে গিয়াছিল, তখন মাত্র এই বিঘা কয়েক জমি সোজা না গিয়ে পশ্চিম দিকে আধ মাইল ঘুরতে গিয়েছিল কেন! কেন না সোজা একটা সরল রেখা টানলে পাঁচশ' গজের বেশী হ'বে না—এদিকের দক্ষিণ তীর আর ওদিকের উত্তর তীরের মধ্যের ব্যবধানটুকু। এর পিছনে একটু কাহিনী আছে। কিঞ্চিদধিক শতাব্দী পূর্ব্বে নদীটি সোজাই ছিল। কিন্তু ইহার উভয় তীরস্থিত বৃহদকার দুইটি বটপী বৃক্ষের তলা খেয়ে নদীর মধ্যে পড়ে যায়। তাতে বাধার সৃষ্টি হয় নদীর

গতিপথের। সে বাধা উত্তরোত্তর বাড়তে থাকল শলি পানা শেওলা প্রভৃতি গাছ তুটির ডাল পালায় জমে। তখন এদেশে সাঁওতাল কোরা প্রভৃতি বন্যজাতিদের আগমন হয় নাই—আর বটপী বৃক্ষের অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করত না হিন্দু অধিবাসীরা। বৎসরের পর বৎসর বন্যার জলে ডুবে থাকার ফলে গাছ তুটির নিশ্বাস বন্ধ হ'য়েই দেহত্যাগ করে এবং সকল জিনিষের পরবর্ত্তী পরিণতি যা তাই হ'ল—অর্থাৎ মাটী হ'য়ে গেল। কিন্তু নদী সে বেয়ে চলবার প্রতিজ্ঞা ত্যাগ করল না—তাই পশ্চিম দিক ঘুরে সে তার পথ করে নিলে।

গ্রামের প্রান্তর থেকে নদী-তীরের দূরত্ব প্রায় আধ মাইল। এ অঞ্চল সম্বন্ধে যে কিছু জানে না, সে কিছুতেই ভাবতে পারবে না যে ওই সীমা রেখাটার মধ্যে একটা নদী আছে। যতক্ষণ না তার চোখে পড়ছে বংশ নির্ম্মিত পারাপারের পোলটা। পোলটা সমতল ভুমি থেকে প্রায় দু'হাত বুক চিতিয়ে আছে। নদীর জল থেকে পোলের ওপরটা প্রায় আট দশ হাত হ'বে। পোলের খুঁটিগুলোয় জল ও শেওলার দাগ দেখলে বোঝা যায় বর্ষাকালে নদীর জল প্রায় পোলটার কাছাকাছি উঠে। পোলটা সংস্কার অভাবে স্থানে স্থানে ভেঙ্গে গিয়েছে। এক পাশের ধরনার বাঁশগুলো ঝুলছে, বোধ হয় বাঁধনের দড়িগুলো কেউ খুলে নিয়েছে। পোলের বাঁশগুলো শুকিয়ে সাদা হ'য়ে গিয়েছে। পোলের পাশ দিয়ে গরুর গাড়ী যাতায়াত করে। এঁটেল মাটিতে গাড়ীর চাকা বসে প্রায় এক হাত দেড় হাত

গর্ত্ত হ'য়ে আছে। নদীতে এখন এক হাঁটুর বেশী জল হ'বে না। নদীর জলের ওপর পানপাতারী ভাসছে। পানপাতারী-ফুল ফুটে রয়েছে মেলাই। ফুলগুলো সাদা, মাঝখানে হলদে রঙের পরাগ রেণু। মৌমাছিগুলো মধুর লোভে মাতালের মতো মাতামাতি করছে।

গ্রাম থেকে যে-রাস্তাটা বেড়িয়ে মাঠের দিকে গিয়েছে সেটা সোজা এসেছে উত্তর দিকে কিছু দূর; তারপর খাড়া বেঁকে পূর্ব্বদিকে চলে গিয়েছে। রাস্তার দু'ধারে আমন ধানের জমি। জমিতে ঝুরি ঝুরি সাড় ফেলেছে কৃষকরা। প্রায় সাড় গাদাতেই ছোট ছোট চারা তরমুজ তেঁতুল বাবলা প্রভৃতি গাছ জন্মেছে। রাস্তাটা যেখান থেকে মোড় ঘুরে পূর্ব্ব দিকে গিয়েছে; তার গজ পঞ্চাশ দূরে রাস্তার পাশে একটা অশ্বত্থ গাছ। গাছটার বয়স কত—তা গ্রামের লোক কেউ ঠিক ভাবে বলতে পারে না। তবে ওর বয়স যে বহু বৎসর হোয়েছ তা' দেখলেই বোঝা যায়। গাছটার ডালগুলো সব মুড়ো—যেন দশ হাত-ওয়ালা একটা নর কঙ্কাল লেবরেটরিতে ঝুলানো রয়েছে। ওর সর্ব্বাঙ্গে অসংখ্য আবের মতো ফুলে উঠেছে। ওগুলো উঠত না, যদি সাঁওতাল কোরার ছেলেরা আটাকাঠি পাতবার জন্য চুপিয়ে চুপিয়ে আঠা বার করে না নিত। দেহের পুরাণো ক্ষতের মধ্যিখান থেকে যেমন বাড়তি মাংস জন্মায়—আবগুলো দেখতে কতকটা সেই রকম। মুড়ো ডালগুলোর মাঝখান থেকে সরু সরু মেলা শাখা গজিয়ে গাছটার জীবনী শক্তি সম্বন্ধে

সন্দেহের নিরসন করছে। যেমন বৃদ্ধ জরাজীর্ণ ঠাকুরদার ঘারেপিঠে নাতী নাতনীরা চড়ে জানিয়ে দেয় যে তার গঙ্গাযাত্রার দিন এখনও হয়নি। গাছটার শিকরগুলো বেড়িয়ে পড়েছে: দেখলে মনে হয় যেন বহু শতাব্দী পূর্ব্বে ও কারুর কাছে ত্রিসত্য করেছিল—সে ফিরে না আসা পর্য্যন্ত ও ওর অস্তিত্ব বজায় রাখবেই;—তাই থাবা গেড়ে মাটি আঁকড়ে ধরে কোনো রকমে দাঁড়িয়ে আছে।

রাস্তাটা কিছু দূর গিয়ে একটা পড়ার ওপর উঠেছে। পড়াটার পশ্চিম দিকে কতকগুলো বুনো পেয়ারা গাছ। গাছগুলোর মসৃণ গা দেখলে মনে হয় যেন পল্লবহীন চক্ষু প্যাট প্যাট করে চেয়ে আছে। কেউ কোনো দিন একটা পেয়ারাও পোকাহীন পায়নি। অধিকাংশ পেয়ারাই কচি অবস্থায় শুকিয়ে ঝরে যায়; নয় ত বা অর্দ্ধেকটা পাকে আর অর্দ্ধেকটা শুকিয়ে পেঁচোয় পাওয়া শিশুর আকার ধারন করে। পড়াটার একদিকে ফুটবল খেলার বাঁশ পোঁতা আছে, আর একদিকে হিঙ্গেদাঁড়ী খেলবার চিক কাটা। পড়াটার পূর্ব্ব প্রান্তে একটা অশ্বত্থ গাছের গোড়া থেকে একটা মনসা গাছ বেড়িয়েছে; গাছটার গোড়া শান বাঁধানো। তার 'পর কতকগুলো ছোটো বড় মাটীর ঘোড়া, কলসী। এক পাশে ছোট ছোট ঘোড়া স্তূপীকৃত করা আছে; কোনোটার পা ভেঙ্গে গিয়েছে, আবার কোনোটা দু'আধখানা। প্রায় এক হাত লম্বা ও উঁচু দু'একটা ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে, তাদের কাপালে সিঁদুর মাখানো। কলসী দু'টোর ওপরে দু'টো শুকনো ডাব। কলসীর গায়ে সিঁদুর দিয়ে মানুষ আঁকা। দেখলে

হিন্দুদের কোনো দেবদেবীর স্থান বলেই মনে হবে। পাড়ার নীচে রাস্তাটা নেমে একটা মেটো রাস্তার সৃষ্টি করেছে, করে এদিক সেদিক করে তিন চারটা আল রাস্তার সঙ্গে গিয়েছে মিশে।

পূর্ববর্ণিত রাস্তাটা যেখানে মোড় ঘুরে পূর্ব্বদিকে গিয়েছে, সেইখানে পশ্চিমদিকে মুখ করে দাঁড়ালে অনতিদূরে একটা বাগান চোখে পড়বে। আম কাঁঠাল জামরুল কামরাঙ্গা প্রভৃতি গাছের ফাঁকে ফাঁকে খড়ের ছাউনি কয়েকটা ঘর দেখতে পাওয়া যাবে; প্রথম দৃষ্টিতে মনে হ'বে কুলি-পল্লী বলেই। বাগান বাড়ীর উত্তর দিকে পূর্ব্বোক্ত নদী। দক্ষিণ দিকে জিওল-ভেরেণ্ডা মেহদি সেঁয়াকুল প্রভৃতি গাছের বেড়া দেওয়া; আবার তার মধ্যে কাঁটা তারও আছে। বাগানের প্রবেশ পথ মাত্র একটি শান বাঁধানো একটা তুলসী মণ্ডপের মতো। তার উভয় দিকে চারটি করে সিঁড়ি আছে, প্রথম সিঁড়িটি লম্বা তিন হাত—ওপরের চাতালটা দেড় হাত দীর্ঘে প্রস্থে। এই সিঁড়ি বেয়ে উঠে তবে বাগানের ভিতর নামতে হয়। বাগানে প্রবেশ করে কিছুদূর উত্তর মুখে গেলেই পূর্ব্ব-মুখী একটা বাড়ী। বাড়ীর দরজাটা একটা দো-চালা ঘরের মতো। দরজার বহির্দেশে উভয় পার্শ্বে দু' হাত চওড়া তিন হাত লম্বা দাওয়া; দরজার দেওয়াল দাওয়া তুষ-রাঙ্গামাটির দ্বারা ল্যাপা। দেওয়ালগুলো চির চির করে ফেটে গিয়েছে, দাওয়াটাও। চালার খুঁটিগুলো বাঁশের; সেগুলো আলকাতরা মাখানো। দরজার কাপাটের বাজুগুলোর মাঝে মাঝে গর্ত্ত; সেগুলোতে আলকাতরা মাখানো ন্যাকড়া গোঁজা।

শান্ত সৌগন্ধোচ্ছ্বাসবাহিনী আষাঢ়ের উষা। পূর্ব্ব দিগন্তে—যেন সদ্যপ্রসূত একটি শিশুকে ধাত্রীমাতা সবেমাত্র রক্তকুণ্ড হ'তে তুলে ধুইয়ে মুছিয়ে নীলাভ শয্যায় শুইয়ে রেখেছে। রক্তের ছিটে ফোঁটা এখনো এখানে সেখানে একটু আধটু লেগে আছে। কিন্তু সেগুলো বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। শিশুর হাস্যোচ্ছটায় ধরণী আলোকোজ্জ্বলা। কৃষকরা লাঙ্গল নিয়ে পূর্ব্ববর্ণিত পথ ধরে পূব দিকে যাচ্ছে। প্রভাতারুণালোকে তাদের মুখমণ্ডল রঞ্জিত। কারুর কাঁধে লাঙ্গল; এক হাতে লাঙ্গলটা ধরেছে, অপর হাতে হুঁকো ধরে তামাক খেতে খেতে চলেছে। ডাঁশ মাছিতে গরুগুলকে অতিষ্ঠ করছে; অবিরত লেজ নেড়েও তাড়াতে পারছে না।

উক্ত বাড়ীর দরজার দাওয়ায় খেজুর-পাতা-দ্বারা-নির্ম্মিত চাটাই-এ একটা লোক বসে এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য প্রাণ ভরে অবলোকন করছে। মাঝে মাঝে ঘাড়টা এপাস ওপাস হেলাচ্ছে; থেকে থেকে বিস্ফারিত করছে চোখ দু'টি; যেন সূর্য্যোদয় জীবনে এই প্রথম দেখছে কিম্বা আর কোনো দিন দেখতে পাবে না, তাই সবটুকু শেষ করে দেখে নিচ্ছে। লোকটির বেদানার দানার মতো রংটি সকলের প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। গোল মুখের উপর উন্নত ললাট, ভ্রূদু'টি তির্য্যক, কপালের কুঞ্চিত রেখাগুলি চিন্তাশীলতার পরিচয় দেয়, আর এটাকে সমর্থন করে চিবুকের নীচে আর একটি মাংসাল চিবুক। মাথার বারো আনা পাকা চার আনা কাঁচা চুলগুলি একটা উত্তরীয় দিয়ে ঢেকে গোঁফ দাড়ি কামানো মুখখানা দেখলে বেশ একটু

বিব্রত হ'য়ে পড়তে হ'বে তার বয়সটা ঠিক্ করতে—আটাশ কি আটত্রিশ। মৃদু অথচ অদ্ভুত তাঁর চোখের চাউনী। এই চাউনীটিই বলে দেয় এ লোকটি আর যাই হোক না হোক দার্শনিক না হয়ে যায় না। আর এই চাউনী নিয়ে কারুর প্রতি যদি এক চোখ তাকায় আর যদি সে অসৎ লোক হয় তবে এক মুহূর্ত্তও ঘাড় সোজা ক'রে সে চোখের উপর চোখ রাখা তার পক্ষে সম্ভব হবে না।

"নিমাই—" শান্ত স্বরে ডাকলেন; অনতি দূর দিয়ে একটী যুবক পথ অতিক্রম করছিল, তাকে।

যে যুবকটি এসে দাঁড়াল তাঁর সামনে–তার রংটা ফর্সা না হ'য়ে যদি সাঁওতালদের মতো কালো হ'তো, তবে যে কেউ দেখতো, তারই মনের মধ্যে উদয় হ'ত আফ্রিকার কিম্বা ক্যানাডার আদি অধিবাসীর রক্তে তার জন্ম। কারণ তার মাথার চুলগুলো এত অস্বাভাবিক কোঁক্‌ড়ানো যা এ দেশের রক্তে খুব কম কেন—চোখে পড়ে না বল্লেও অত্যুক্তি হ'বে না। লম্বা মুখখানার উপর খাড়াই নাকটা না থাকলে তার সমস্ত সৌন্দর্য্য নষ্ট হ'য়ে যেত; গোঁফ দাড়ি কামানো; বেশ ঈষৎ কালো আভা ফুটে উঠেছে। মুখখানা দেখলে সংবেদন-শীল মনের পরিচয় দেয়। পণ্ডিতদের সিদ্ধান্ত অনুসারে যদি মুখ-মণ্ডলের ভাবই অন্তরের পরিচয় দেয়,—তবে তার মুখের ভাব দেখে এইটেই বোঝা যায় যে, মনের মধ্যে কাপট্যের লেশ নাই; কিন্তু লজ্জা-দুর্ব্বলতা মিশ্রিত এমন একটি জিনিষ আছে যা' সাধারণত

লোককে তার ন্যায্য অধিকার মুখ খুলে দাবী করবার সাহসের গলা টিপে ধরে। তার হাতে একটী কাঠের বাঁটওয়লা খোন্তা। বাঁটটার রং সাদা কালো; কালো রংটা কাঠের সারাংশ। খেন্তাটার মুখের দিকটা চক্ চক্ করলেও মরচের দাগ পড়ে রয়েছে।

"বস—" চোখ ঈসারা করে বৃদ্ধ নিমাইকে সামনে বসতে বলেলেন। "কাজের বিশেষ তাড়া নেই তো—?" জিজ্ঞাসা করলেন।

"না, কাজ এমন বিশেষ কিছু নেই;—তবে কিষেণগুলো এসেছে, ওদেরই কাছে যাচ্ছিলাম—" নিমাই উত্তর দিল।

"রাখাল বাবুর চিঠির কি জবাব দিলে ?" উত্তরের অপেক্ষা না করেই পুনরায় প্রশ্নের সঙ্গে যোগ করলেন,—"মানে চাকরীটা নেবার মনস্থ করলে কিনা ?"

"আপনার পরামর্শ নেবার জন্যেই তো কাল সন্ধ্যা বেলায় এসে-ছিলাম—" বলে নিমাই নাক মুখ কুঁচকে আস্তে আস্তে কপালটা ঠুকতে লাগল খোন্তার বাঁটটায়।

"তা' আমি বুঝতে পেরেছিলাম। তবে লোক ছিল বলে তোমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিনি—" বললেন ধীরে ধীরে; একটু পরে আবার বললেন, "পরামর্শ দিতে হলে ব্যাপারটা ভালো করে চিন্তা করে দেখতে হবে তো ?... না কি তুমিই বল ?" বলে নিমাই-এর প্রতি তাকিয়ে ঘাড়টা আস্তে আস্তে দোলালেন।

"হুঁ, তা' তো বটেই—" বলে নিমাই এক হাত দিয়ে চোখ দুটো টিপে ধরে আস্তে আস্তে ভ্রূ দুটো উপর দিকে তুলতে লাগল।

"আমি বলি কি অস্থায়ী হলেও চাকরীটা তুমি নেবার মত কর—"

নিমাই ঘাড় গুঁজে খোস্তার বাঁটটায় নাক রেখে চোখ তুলে বৃদ্ধের প্রতি করুণ দৃষ্টিতে তাকাল মাত্র।

"জানি, আশ্রমের প্রতি তোমার মায়া বসে গিয়েছে; এ কথাও ভুলিনি যে, তোমার মন ছিল আমার কাছ থেকে মন্ত্র নিয়ে আশ্রম-জীবন যাপন করবার—" বৃদ্ধ তাঁর স্বভাব সিদ্ধ শান্ত স্বরে বলে চললেন,—"কিন্তু নিমাই, একটা জীবন যাপন করা সত্যিই খুব সহজ কাজ নয়। কত ঝড় শিলাবৃষ্টি বুক পেতে সহ্য করলে তবে এ জীবন সার্থক হয়। তা' ছাড়া গুরুমন্ত্র নিয়ে জপ-মালা ভজন করে জীবন কাটাবার যুগ চলে গিয়েছে; এখন নিজেকে নিজের গুরু করে নিয়ে আত্মশক্তিতে আস্থা রেখে জীবনকে মহত্ত্বের পথে চালিয়ে নিয়ে যাবার যুগ এসেছে বলেই আমার বিশ্বাস। কেন না তুমিই বল—" বৃদ্ধ গলার স্বর আরও ছোট করে পূর্ব্বের মত ধীরে ধীরে বলে চললেন,—"আমি নাক বন্ধ করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেন বসে থাকি, ধর্ম্ম সংক্রান্ত কাজ কর্ম্মে তদ্‌গত হয়ে থাকি কেন, তা' তুমি কি করে বুঝবে? যতক্ষণ না অন্তর্নিহিত সত্যকে জান্‌তে পারছ?" বলে কিছুক্ষণের

শুনা যেন তন্ময় হয়ে গেলেন। পরে এক চোখ দেখে নিলেন নিমাইকে। তারপর ধীরে ধীরে দৃষ্টি নামিয়ে নিয়ে বলতে লাগলেন,—"স্বেচ্ছায় প্রকৃতিদত্ত কর্ত্তব্যের বোঝা মাথায় নিয়ে কর্ম্মস্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দিলে তবেই সে-সত্যকে উপলব্ধি করা যায়; তার আগে নয়।"

উভয়েই কিছুক্ষণ নীরব থাকবার পর নিমাই সহাস্যে প্রশ্ন করলে,—"আপনি কি করে তা' হলে—" এর পরে নিমাই কি বলবে ঠিক করে উঠতে না পেরে বৃদ্ধের প্রতি হাসিভরা মুখে চেয়ে রইল।

"আমি?" আনত মুখে চোখ দুটো তুলে নিমাইয়ের প্রতি তাকালেন; পরে স-শব্দ অথচ শান্ত স্বরে একটু হেঁসে বললেন,—"ওরে বাবা, ত্রিশটা বছর সংসারের জোয়াল বয়েছি। তারপর আপনা থেকে যখন পায়ের শেকল খুলে গেল,—যখন দেখলাম আমার সাহায্য না পেলে সংসারের কারুর কোনো ক্ষতি হবে না—শুধু তখনই সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আজ ছত্রিশ বছর এ পথে আছি—" বলে বৃদ্ধ দৃষ্টি চালিয়ে দিলেন পূর্ব্ব দিগন্তে; যেন তলিয়ে গেলেন অতীতের কোলে, এক বিশেষ ঘটনার মধ্যে।

নিমাই অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে গিয়েছে। মিনিট কয়েক পড়ে ধীরে ধীরে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করে বললে,—"চাকরীটা অস্থায়ী বলেই—

"সাহস হ'চ্ছে না বেড়িয়ে যেতে, কি বল— ?" নিমাইয়ের কথা শেষ না হ'তেই সহাস্যে বললেন। বৃদ্ধ আবার দৃষ্টিটা ফিরিয়ে নিয়ে কি যেন চিন্তা করতে লাগলেন।

"পরশু অফিসে হাজির হ'বার তারিখ, তা' হ'লে আজকের ডাকেই একখানা চিঠি ছেড়ে দিতে হয়—"

"হ্যাঁ, তাই দাও বাবা, তাই দাও—" একটু থেমে পুনরায় বলে চললেন,—"ওটা থাকতে থাকতে আর একটার চেষ্টা করবে; নিজের সক্রিয় চেষ্টা থাকলে কিনা হয় ?—পাঁচ জায়গায় ঘুরে দশজনের সঙ্গে মিললে মিশলে তবেই না আস্তে আস্তে জগতটার সঙ্গে পরিচয় হয়। তা নইলে আশ্রমে বসে বইয়ের পোকা হ'য়ে থাকলেও কিচ্ছুটি জানতে পারবে না বাইরের জগতের।" কি যেন একটু চিন্তা করে আপন মনে নীরবে হাসলেন; পরে চক্ষু দু'টি বিস্ফারিত করে তাকালেন নিমাইয়ের প্রতি। পুনরায় মুচকি হাসি হাসতে হাসতে বলে চললেন,—"অভিনয় করবার মনোবৃত্তি ত্যাগ করে শুধু দেখে যাকে।—দেখবে সমাজে কত বিস্ময়কর জিনিষ; আরো দেখবে প্রায় প্রত্যেকেই এক একটা 'বাদী' বলে জাহির করবার হাস্যকর প্রয়াস—"

"বাদী মানে—", কথাটা ঠিক ভাবে বুঝতে না পেরে নিমাই সবিস্ময় ও জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে বৃদ্ধের প্রতি তাকিয়ে রইল।

"সাম্যবাদ সমাজতন্ত্রবাদ নাস্তিক্যবাদ, আস্তিক্যবাদ— কত আর নাম করবো—"

নিমাই নীরবে বসে বাঁ হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর ফাঁকে খোস্তার মুখের দিকটা রেখে ডান হাত দিয়ে ঘোরাতে লাগল; এই নীরবতার মাঝে বৃদ্ধের প্রতি এক একবার তাকাচ্ছে নিমাই। বৃদ্ধের দৃষ্টি অনতি দূরে মাঠের মধ্য দিয়ে একপাল গরু যাচ্ছে সেইদিকে নিবদ্ধ। গরুর পাল যখন একটা জঙ্গলের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল, বৃদ্ধ তখন ধীরে ধীরে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস মোচন করলেন। পরে আপন মনে ও ভাব-গদগদ স্বরে বললেন, —"মূঢ়ের নাস্তিক্যবাদ আর দুর্ব্বলের আস্তিকতা—!" তাঁর নিজস্ব শান্ত হাসিটি হেসে ঘাড়টা ঈষৎ কাত করে নিমাইয়ের প্রতি কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। পরে পূর্ব্বোক্ত ভাবে বলে চললেন,—"দু'জনেই নিজ নিজ প্রাধান্যের জন্য মাথা ফাটাফাটি করে মরে। যে তর্কযুদ্ধে জয়ী হ'ল, সে বিজয় মদগর্ব্বে সমতল অসমতল এক মনে করে ঊর্দ্ধ মুখে হাঁটতে লাগল; আর একজন পড়ে পড়ে ছাড়তে লাগল দীর্ঘনিশ্বাস। ভাবতে লাগল ওকে কি ভাবে জব্দ করা যায়। এই খানেই এসে গেল 'বাদ' থেকে ব্যক্তিগত আক্রোশ—" আবার কিছুক্ষণের জন্য তাঁর চিন্তার মধ্যে তলিয়ে গেলেন। "জানলে নিমাই—" হঠাৎ সজাগ হ'য়ে নিমাইকে লক্ষ্য করে বললেন; যেন পূর্ব্বোক্ত কথাগুলো নিমাইকে উদ্দেশ্য করেই বলেছিলেন। যদিও নিমাই কাণ পেতে কথাগুলো শুনে গিয়েছিল। "দু'জনে যে জিনিষ নিয়ে তর্ক করল, তাকে যদি জানত বা উপলব্ধি করতে পারত—তা' হ'লে আর যাই করুক 'তার' অস্তিত্ব নিয়ে তর্কক্ষেত্রে অবতীর্ণ হ'ত

না—" বলে একটু হাসলেন। হাসিটি যেন অন্তস্থল থেকে বেড়িয়ে এলো।

নিমাই আগের মতোই নীরবে বসে রইল।

"সেই জন্যেই তো বলছিলাম বাবা—" বৃদ্ধ স্নেহ-মিশ্রিত স্বরে ধীরে ধীরে বলে চললেন,—"তোমার উপায়ের পথ চেয়ে যখন কেউ নেই, তখন তোমার ভাবনা করবার তো কিছু আমি দেখতে পাচ্ছিনা।" বলে নিমাইয়ের প্রতি কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন নীরবে। পরে বললেন,—"কর্ম্মক্ষেত্রে নেমে দেখবে মানুষ কত অসাধ্য সাধনে ব্রতী হয়েছে।···নারী বড় না পুরুষ বড় এদ্বন্দ্বেরও শেষ মীমাংসা হয়নি আজও। নারীদের সভা করে জানাতে হোচ্ছে তাদের অভাব অভিযোগ; অথচ সভ্যতার ঢাক চারিদিকে বাজিয়ে বেড়াচ্ছে শুনতে পাচ্ছি।··· প্রকৃতির নিয়ম হচ্ছে—যে অসহায়, যে দুর্ব্বল তাকে সবলে রক্ষা করবে বুক দিয়ে; তার দাবী মেটাবে সকলের আগে—" বৃদ্ধের মুখের উপর ধীরে ধীরে একটা দুঃখের ছায়া নেমে এলো। কিছুক্ষণ নীরব থাকবার পর একটা দীর্ঘ-শ্বাস ফেলে বললেন,—"ওরে বাবা, যে যত অসহায়, দুর্ব্বল—তার নীরব দীর্ঘশ্বাস তত বেশী অগ্নিবর্ষী রে—। একথা মানুষ বোঝে না; আর বোঝে না বলেই মানুষ সারা জীবন অশান্তিতে কাটায়—" একটুখানি থেমে সহজ স্বরে বললেন,—"নারীকে চিনবে এক মাত্র কবি, বাবা নিমাই,—কবিই নারীকে চিনবে; আর কেউ নয়।····সাধা-রণ মানুষ নারীকে দেখবে মা-রূপে, তার বুকের রক্ত খেয়ে মানুষ

হোয়েছে বলে; স্ত্রীরূপে, জীবন যাত্রার পথে সাহচর্য্যের জন্যে; ভগিনীরূপে, আশীর্ব্বাদ নিয়ে জীবন সংগ্রামে জয়ী হ'বার জন্যে। আর কবি দেখবে নারীর মধ্যে সৃষ্টির রহস্য; এক নারীর মধ্যে অদ্বিতীয়।... সেই কথাই বলছিলাম বাবা, প্রত্যেক মানুষ যদি তার নিজের প্রথম দিনটির কথা স্মরণ করে;—সেই অর্দ্ধমৃত, বিবশা মায়ের পাশে রক্তকুণ্ডে ছোট একটী শিশু পড়ে হাত পা ছুড়ছে—এই ছবিটা চোখের সামনে ধরে রাখে, তবে যে সমস্ত মানুষ মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বা ভাগ্য নিয়ে নাড়াচাড়া করে—তারা সব কিছুর আগে নারীর—" কথাটা শেষ না করে হঠাৎ যেন চিন্তার সাগরে ডুবে গেলেন বৃদ্ধ। নতমুখে বহুক্ষণ ধরে ভ্রূর মাঝখানের চামড়াটা বাঁ হাত দিয়ে টানতে লাগলেন। পরে হঠাৎ ভাব-গদগদ হ'য়ে আপন মনে বলে উঠলেন,—"না, না, না। সে অসহণীয় বেদনা যার অনুভব করবার মতো অনুভূতি শক্তি আছে সে—" বৃদ্ধ কথাটা আর শেষ করতে পারলেন না। যেন জননীর প্রসব বেদনার মতো বেদনায় বৃদ্ধ অস্থির হ'য়ে পড়েছে। প্রায় পাঁচ সাত মিনিট নীরব হ'য়ে রইলেন বৃদ্ধ। পরে নিমাইয়ের হাত থেকে খোন্তাটা পড়ে গিয়ে একটা শব্দ হোতেই বৃদ্ধ চমকে উঠে নিমাইয়ের প্রতি তাকালেন।

'চিঠিতে লিখে দিই যে আগামী কালই আমি রওনা হচ্ছি—" বলে নিমাই জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে বৃদ্ধের প্রতি চেয়ে রইল।

"ভাল কথা—" অন্যমনস্ক ভাবে বৃদ্ধ বললেন

দু'জনেই উঠে পড়ল। নিমাই কিছু দূর গিয়েছে, বৃদ্ধ পুনরায় ডাকলেন,—"শোন, নিমাই—" বলে ত্বরিৎ পদে সামনের দিকে কিছুদূর এগিয়ে গেলেন। "তা' হ'লে তোমার সঙ্গে আমার আর দেখা হোচ্ছে না, আমি আজকেই বেড়িয়ে যাচ্ছি—।...অমৃতসরের ঠিকানায় আমাকে একখানা চিঠি দিয়ো ওখানে গিয়ে।"

নিমাই ঘাড় নেড়ে জানাল যে, হ্যাঁ, সে চিঠি দেবে। বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে নিমাইয়ের গতিপথের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন। নিমাই কাছে যেতেই কতকগুলো শালিক, ময়নাশালিক পাখী উড়ে গিয়ে সজনে গাছটার উপর বসে কিচির মিচির করতে লাগল। একটা কাঠঠোক্‌রা পাখী কিছুদূর উড়ে আবার পালখটা বন্ধ করে, কিছুদূর যায় আবার পালখটা বন্ধ করে এই রকম ভাবে উন্নতানত ভাবে উড়ে গিয়ে গ্রামের ভিতরে অদৃশ্য হ'য়ে গেল। নিমাই নদীর ধারে যেতেই কতকগুলো পানকৌড়ী, বালিহাঁস—আপন আপন শব্দ করতে করতে দূরে পোলটার কাছে গিয়ে জলে সাঁতার কাটাতে লাগল। বৃদ্ধ এ সমস্ত দেখলেন নীরবে। পরে একটু হাসলেন আপন মনে। "মায়া—" অস্ফুট স্বরে কথাটি বলে বাড়ী ভিতর চলে গেলেন।

গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে একটা বাঁশ বনের ওদিকে সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে। দেখলে মনে হ'বে কেও যেন বাঁশ বনটায় আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। নিমাই সেইদিকে অনিমেষ নেত্রে তাকিয়ে ছিল—নদীর ধারে ফাঁকা উঁচু জায়গার উপর বসে। গোধূলি রেখা গাঢ় করে দিয়ে রাখাল-ছেলেরা গরুর পাল নিয়ে গ্রামের ভিতর প্রবেশ করল।

মুসলমান পাড়ার মসজিদটা বাঁশ গাছগুলোর ফাঁক দিয়ে দেখা যায়। সূর্য্যাস্ত হ'তেই 'আজান' দেওয়ার শব্দ শুনতে পেলে নিমাই। নির্জ্জন, শব্দহীন মাঠের মাঝখান থেকে আজানের আকুলিত স্বর শুনলে নির্দ্দয়ের অন্তরও আপনা থেকে দ্রবীভূত হ'য়ে পড়ে। শব্দটা আকাশ বাতাসে মিশে এক অপূর্ব্ব আবহাওয়ার সৃষ্টি করে। ভুলে যেতে হয় স্বর্গ মর্ত্ত; যেন দেখতে পাওয়া যায় মৌলবী সাহেবের আকুল প্রার্থনা দেবতার কাণে গিয়ে 'তাঁর' আসন টলিয়ে দিলে; তিনি থাকতে পারলেন না আর স্থির হ'য়ে – নেমে এলেন ওই মসজিদের মৌলবী সাহেবের সামনে।

গ্রাম থেকে বাদুরগুলো উড়ে উড়ে আসছে নদীতে জল খাবার জন্য। কাক বাজ পাখীগুলো বাসায় ফিরবার পথে দু' একটা পোকা মাকড় পেলে ছেড়ে দিচ্ছেনা। তাল গাছের উপর চামচিকীগুলো সশব্দে কলহ সুরু করে দিয়েছে। প্রদোষ সন্ধ্যায় নিমাই বসে বসে ভাবতে লাগল,— আজকে এমন সময় এখানে; আগামী কাল এতক্ষণ এক অপরিচিত জায়গায় গিয়ে হাজির হ'ব। আগামী কালের এই সময়টার কথা আগে থেকেই চিন্তা ক'রে অজ্ঞাতসারে তার চক্ষু দু'টি সিক্ত হ'য়ে উঠল। এই গ্রাম, আশ্রম, গাছ-পালা, নদী-নালা, পশুপাখী তার একান্ত আপনার; আর ছেড়ে যেতে হ'বে তাদেরই।....টপ্ টপ্ করে দু' ফোঁটা অশ্রু তার কপোল বেয়ে ধীরে ধীরে গড়িয়ে পড়তে লাগল।... হঠাৎ কয়কটা শৃগাল সমস্বরে চীৎকার করে উঠতেই চমচক উঠল নিমাই। তার সামনে অনতি দূরে

হিন্দু পল্লী। একটী কুমারী কালী মন্দিরে সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বেলে দিয়ে বাড়ীর পথে ধীর পদবিক্ষেপে আসছে,—গাছ পালার ফাঁকে ফাঁকে দেখতে পাওয়া যায়। ঘরে ঘরে শঙ্খধ্বনি শুনে নিমাই উঠে পড়ল। পূর্ব্ব দিগন্তে এক তাল মেটে-সিন্দুরের মতো কৃষ্ণা প্রতিপদের চাঁদখানা নদী বক্ষে ভেসে ভেসে উঠ্‌ছে।—নিমাই বাড়ী দিকে পা বাড়াল।

—দুই—

নিমাই এই সহরে আসার পরে প্রায় দুই মাস অতীত হ'য়ে গিয়েছে। এই জিলা সহরটীর উত্তর প্রান্তে একটী প্রকাণ্ড পুকুর। পুকুরের চারি পাড় প্রায় কুড়ি ফুট উঁচু। পাড়ের অব্যবহিত পরেই নানা রকম ফল ফুলের গাছ; তার পরেই রাস্তা—রাস্তায় লাল শুরকী ঢালা। পুকুরের দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে সুবৃহত শান বাঁধানো ঘাট। পশ্চিম দিকের ঘাটে নিমাই বসে দেখছিল,—এক ভদ্রলোক মাচানের উপর বসে ছিপে একটা মাছ গেঁথেছে। বহুক্ষণ ধরে খেলিয়ে খেলিয়েও মাছটাকে তুলতে পারছেন না। মাঝে মাঝে মাছটা মাঝ পুকুরে চিতিয়ে উঠছে; তাতে দেখা যায় মাছটা বেশ একটু বড় এবং লাল টক্‌টক্‌ করছে।

"ওটা নিমাই বসে রয়েছে না—" কথা কয়টা নিমাইয়ের কানে এসে পৌঁছুল; তার মনেও হ'ল—সে যেন পিছন দিকে মুখ ফিরিয়েছে; কিন্তু কার্যাত মুখ ফেরানোর পরিবর্ত্তে সে পিঠটা পিছন দিকে একটু হেলিয়ে দিয়েছে; কিন্তু তার দৃষ্টি আছে সেই মাছটার দিকে।

"ও—মা হ্যাঁ—নিমুদা-ই ত-অ-অ—"

একটী মেয়ে—যেমন দৌড়বাজ হ'বার পূর্ব্বে একটা পা সামনের দিকে এগিয়ে দিয়ে প্রস্তুত হ'য়ে থাকে ঠিক সেই ভাবে নিমাইয়ের পিছন দিক থেকে তার মুখটা দেখে নিয়ে কথা কয়টী বলল।

নিমাই চমকে থেড়ে মেড়ে দাঁড়াল। পিছন ফিরেই দেখতে পেলে এক প্রৌঢ়া,—আধ ময়লা গায়ের রং, সামনের দাঁত দুটা ঈষৎ উঁচু, পড়নে দেশী তাঁতের কালা পাড়ু শাড়া—তার দিকে চেয়ে আছে;—মুখের হাঁসিটা ঠোঁট দিয়ে চেপে আছে কোনো রকমে।

"ওঃ, কাকীমা—" বলে হাসতে হাঁসতে নিমাই মহিলাটির দিকে এগিয়ে গেল।

"কি গো—শ্বশুরের আজকাল আর যাওয়া হয় না কেন—" নিমাই কোনা উত্তর দেবার আগেই মহিলাটি পুনরায় তাঁর প্রশ্নের সঙ্গে যোগ করলেন,—"হুঁ হুঁ বাবা—পর ঠাওরাও তা' আমি সব বুঝতে পারি—" বলে মহিলাটি মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন নিঃশব্দে।

"না,—কাকীমা, সত্যিই তা নয়—" কৈফিয়ত স্বরূপ নিমাই কলরব করে বললে।

উভয়েই গল্প করতে করতে অনতি দূরে মাঠটায় গিয়ে বসল। দেশের গল্প। পূর্বস্মৃতি টেনে এনে মহিলাটি গল্প করতে লাগলেন। বিয়ে হওয়ার পর নিমাইদের গ্রামে যখন যায় তখন নিমাইয়ের মায়ের সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব হ'য়েছিল। তারপর স্বামীর কর্ম্মব্যপদেশে যখন ছাড়াছাড়ি হয় তখন কি দুঃখ। ইত্যাদি—

মেয়েটী এই মহিলার একটী মাত্র সন্তান; যদিও পূর্ব্বে আরও হ'য়েছিল, কিন্তু ঈশ্বর অধিক সন্তানের বোঝা বহন করবার মতো শক্তি নেই বলেই হোক আর যাই হোক কেড়ে নিয়েছেন।···মেয়েটীর নাম বসুমতী। ওর বয়স যত, তাতে ও যদি পল্লী-বালা হ'ত, তবে মা ষষ্ঠীর দয়ায় ওর হাতে একটী কাঁকালে একটী দিয়ে এতদিন কোমড় ভেঙ্গে দিতেন। কিন্তু সহরের আবহাওয়ায় ওর বয়সী মেয়েরা বয়সকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে প্রাণ ভরে হেসে খেলে নেয়। সেটা আরও বেশী করে হয়—যদি পয়সাওয়ালা বাপ মায়ের আদুরে দুলালী হয়। মেয়েটীর পরনে মিহি সূতার রঙীন শাড়ী। আজানু-লম্বিত বেনীটি ফণিনীর মতো পিঠে ঝুলছে; বেনীর ডগায় লাল ফিতা বাঁধা। গায়ের রং উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ; সুডৌল মুখখানার উপর ছোট ললাট ও টানা ভ্রূ দুটি সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করেছে।

বাঁধা গরু ছাড়া পেলে যেমন প্রথমে খুব খানিকটা ছুটোছুটী করে নেয়,—সেই ভাবে বসুমতী মাঠটার এক প্রান্ত হ'তে আর

এক প্রান্তর পর্য্যন্ত ছুটোছুটী করতে লাগল।...মেয়েদের দৌড় ভারী সুন্দর। বসুমতী যখন দৌড়তে লাগল,—তা দেখলে ঠিক সেই রকম মনে হ'বে যেমন একটা ছুঁচো বাজিতে আগুন দিয়ে ছেড়ে দিলে চকিতে এঁকে বেঁকে বহুদূর চলে যায়।....যে হাঁটতে শিখেছে সোজা হ'য়ে, তার হাঁটা কেউ দেখেনা; কিন্তু যে-শিশু সবেমাত্র হাঁটতে শিখছে তার হাঁটা একদণ্ডের জন্যও লোকে দাঁড়িয়ে দেখে নেয়। তেমনি, দৌড়ান কাজটা পুরুষদের, মেয়েদের নয়; আর নয় বলেই হঠাৎ দৌড়তে দেখলে বেশ তৃপ্তি পাওয়া যায়। যে-মেয়েরা পুরুষদের মতো পা সোজা করে দৌড়তে পারে, তারা মেয়ে নয়; মেয়ে-পুরুষ মিলিয়ে এক অদ্ভুত জীব। তাদের প্রকৃতিগত সৌন্দর্য নষ্ট করার দায়ে দায়ী করা যায়।

নিমাই এক দৃষ্টে দেখছিল বসুমতীর দৌড়। সে ভুলে গিয়েছিল যে তারি পাশে ওর মা বসে রয়েছে; যদিও বসুমতীর মা নিমাইকে উদ্দেশ করেই গল্প করে চলেছিলেন।

"দ্যাখো না বাবা মেয়ের রকম,—একটা হ'য়ে কিছু বলতেও পারিনা; আর এই রকম দজ্জালী করে বেড়াবে—"

নিমাই চমকে উঠে লজ্জায় লাল হ'য়ে উঠল। কেননা তার খেয়াল ছিল না যে, সে তার পার্শ্ববর্ত্তিনীকে উপেক্ষা করে বসুমতীর প্রতি তাকিয়ে আছে। সে আনতমস্তকে নাক মুখ কুঁচকে বাঁ হাত দিয়ে ললাটের চামড়া ধরে টানতে লাগল।

"ওরে—ও বসু, কি হ'চ্ছে—হুঁচোট খেয়ে পড়ে গেলে দাঁত-

মুখ ছেঁচে যাবে যে—" চাপা অথচ তিরস্কারের স্বরে বসুর মা বললেন মেয়েকে উদ্দেশ করে।

বসু মায়ের কথায় কর্ণপাত করা প্রয়োজন বোধ করল না। ও এখন যে জগতে রয়েছে, সেখানে শুধু ও আছে, আর আছে ওর হাঁসি-খেলা।

অবশেষে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে ধপাস্ করে বসে পড়ল তার মায়ের সামনে। নিমাই মুখ তুলে একবার তাকালে বসুর প্রতি; কিন্তু পরক্ষণেই নামিয়ে নিলে তার দৃষ্টি। বসুর মা মেয়ের প্রতি নীরবে তাকিয়ে আছে। তার হাঁপানি তখনও থামেনি। সে একবার নিমাই ও মায়ের প্রতি তাকিয়ে নিমাইয়ের হাঁটুটা ডান হাত দিয়ে স্পর্শ করে সেটা তার নাকে ঠেকালে; পরে নাকটা সিঁটকে বললে,—"উঁঃ, নিমুদা—তোমার গায়ে এখনো আশ্রম আশ্রম গন্ধ বেরুচ্ছে—"

"দ্যাখো—একবার মেয়ের কথা বলবার ছিরিখানা—" হাসি-বিস্ময় মিশ্রিত স্বরে বসুর মা বললেন।

মায়ের কথায় কর্ণপাত না করে বললে,—"নিমুদা তোমার চৈতনটা কৈ—?"

'ওর চৈতন আবার তুই কবে দেখলি!"

"বাঃ, আশ্রমে যারা থাকে তারা তো চৈতন রাখে, গলায় তুলসীর মালা পরে, কুঁড়োজালি ভজে—" বলে হাঁটু গেড়ে বসে হাসতে হাসতে নিমাইয়ের চুলগুলো ঘাঁটতে লাগল।

সন্ধ্যা আসন্ন দেখে বসুর মা নিমাইকে উদ্দেশ করে বললে,—“আমরা ঠাকুরবাড়ী যাচ্ছিলাম,—চল না নিমাই আমাদের সঙ্গে, যদি কোনো কাজ না থাকে—”

“আমাকে এক্ষুণি একবার লাইব্রেরীতে যেতে হ'বে কাকী মা—” বিনীত ভাবে নিমাই উত্তর দিলে।

“বেশ। তবে কালকে যাওয়া চাই-ই—”

“নিশ্চয়ই যাবো আমি—” নিমাই প্রতিশ্রুতি দিলে। ইতিমধ্যে বসু কোচম্যানটাকে ডেকে গাড়ীটা এদিকে আনলে।

মাতা-কন্যায় গাড়ীতে উঠতেই মিনিট খানেকের মধ্যেই ঘড় ঘড় শব্দে গড়াটা মোড় ফিরে পুকুর পাড়ের ওদিকে অদৃশ্য হ'য়ে গেল। গাড়ীটা অদৃশ্য হ'য়ে যেতেই নিমাই অন্যমনস্ক ভাবে সেই দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর অজ্ঞাতসারে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে পড়ল।

—তিন—

বাজার থেকে বেড়িয়ে যে বড় রাস্তাটা পশ্চিম দিকে চলে গিয়েছে, তারই মাঝখান থেকে একটা গলি রাস্তা দক্ষিণ দিকে গিয়েছে সোজা একটা সরল রেখার মতো। গলির উভয় পার্শ্বে

নবনির্ম্মিত নূতন ধরণের কোঠা বাড়ী। বাড়ীর বারান্দায় ছাদে নানা রঙের শাড়ী শুকোচ্ছে; কলকোলাহলহীন গলি রাস্তাটা দিয়ে হাঁটবার সময় প্রতি পদক্ষেপের একটা প্রতিধ্বনি হয় চিক্ চিক্ চিক্। ··· সদ্য নির্ম্মিত বাড়ীর রং চূণ প্রভৃতির গন্ধ বাতাসে ভোরপুর। গলি রাস্তাটার পাথরগুলো জেগে আছে, গেলে মনে হ'বে রাস্তাটার সর্ব্বাঙ্গে ব্রণোদ্গম হয়েছে যেন! ····রাস্তাটা সোজা এসে একটা বাড়ীর সামনে শেষ হয়েছে। এরই মাথা ভেঙ্গে পূর্ব্বদিকে বেড়িয়ে গিয়েছে অপেক্ষাকৃত সরু একটা গলি। গলির দক্ষিণ ধারে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পুরাতন ধরনের বাড়ী। বাড়ীর রং বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে; শেওলা, ছাতাধরা দেওয়ালগুলো দেখলে ঠিক সেই রকম মনে হবে— যেমন একজনের গায়ে ছুলী হ'লে দেখায়। চূণ বালি খসে গিয়েছে মাঝে মাঝে। গলি প্রায় সোজা দু'শ গজ পূর্ব্বদিকে গিয়ে মাথা ভাঙ্গা হ'য়ে দক্ষিণ দিকে ঘুরে গিয়েছে। এই গলির পশ্চিম পার্শ্বে বসতিহীন বাড়ীর একটি বৈঠকখানা ঘর। ঘরে রাস্তার দিকের বারান্দাটা প্রায় এক বুক উঁচু হ'বে। বারান্দাটা উত্তর-দক্ষিণে লম্বা প্রায় দশ হাত, চওড়া তিন হাতের কম নয়। ঘরের উচ্চতা বারো ফুটের বেশী নয়। বারান্দায় দুটো মোটা মোটা থাম। উপরে থামের কার্ণিশে পায়রায় বাসা করেছে; থামের নীচে পারাবত বিষ্ঠা ও ডিমের খোলা ইত্যাদিতে ভ'রে আছে অপরিষ্কার। বারান্দার দক্ষিণ কোণে সঙ্কীর্ণ সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে হয়। ঘরের দু'ধারে দুটি জানালা। ঘরে প্রবেশ করে উত্তর দিকে তাকালে একটা তক্ত-

পোষ ও তার উপর অ-গুছালো বিছানা দেখতে পাওয়া যাবে। সামনের দিকে মশারির একটা কোণা ঝুলছে। খাট ও ঘরের পশ্চিম দিকের জানালার মধ্যে যে জায়গাটুকু আছে—সেখানে একটী টেবিল পাতা। তার সামনে একটী আরম্-লেশ চেয়ার। টেবিলের উপর বই খাতাপত্র খবরের কাগজ, একটা লাল নীল পেন্সিল কলম প্রভৃতি জিনিস শিশুদের অ-গুছালো খেলা ঘরের মতো ঢাল উপর হ'য়ে আছে। ঘরের দক্ষিণ প্রান্তে একদিকে একটা ষ্টোভ সস্প্যান ডেক্চী এ্যালুমিনিয়মের হাড়ি তার ঢাকনি প্রভৃতি তৈজসপত্র ইতঃস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হ'য়ে আছে। অপর কোণে একটা সুরাই। সুরাই-এর মুখটা একটা খাতা দিয়ে ঢাকা। তার পাশে জার্ম্মান-সিল্ভারের একটা গেলাস গরাগড়ি যাচ্ছে।—ঘরটা কাগজ কুচো ও ফলের খোসায় অপরিষ্কার। ঘরের মাঝখানে খেজুর পাতার ঝারণ্ গাছটা পড়ে আছে।—সমস্ত-গুলি মিলিয়ে এই কথাটাই বলে যে,—যে এই ঘর ও জিনিষ পত্রের যত্ন নেয় সে এখানে নাই। ঘরের পশ্চিমদিকে একটা খোলা মাঠ। মাঠের উত্তর প্রান্তে একটা বাড়ীর ধ্বংসস্তূপ; তার উপর বাকস গাছ জন্মে জঙ্গালাকীর্ণ হ'য়ে আছে। পশ্চিম প্রান্তে একটা বাগান। বাগানটা বন-বৃক্ষতে পরিপূর্ণ। বাগানটা এক কালে ইঁটের দেওয়াল দিয়ে ঘেরা ছিল বোধ হয়। কেননা মাঠটার দিকে দেওয়ালের চিহ্ন এখনও মাটীর সাথে মিশে যায়নি।

এই ঘরটিই নিমাইয়ের বাসা

নিমাইয়ের চাকরটার ছেলের অসুখ করাতে সে ছুটী নিয়ে বাড়ী গিয়েছে। অনন্যোপায়ে সে-স্বহস্তে পাক করতে গিয়ে হাত পুড়িয়ে ব'সে আছে। পুড়ে গিয়েছে ভাতের ফেন গালতে গিয়ে। হাতে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে বিকেল বেলায় খাটের উপর বসে বসে বাঁ হাত দিয়ে মুড়ি খাচ্ছিল। সে পশ্চিম দিকের জানালা দিয়ে অন্য-মনস্ক ভাবে দেখছিল মাঠটার দক্ষিণদিকে বাড়ীর ছাদের উপর বড় বড় মেয়েরা স্কিপিং করছে তাদের নয়; বাগানের পাশে একটা মাথা ন্যাড়া তাল গাছটাকে। বৈশাখ মাসে ঝড় বাদলে বাজ পড়ে গাছটার মাথাটা ন্যাড়া হ'য়ে গিয়েছে। তার চার পাশে ঝুলছে অর্দ্ধশুষ্ক পাতাগুলো। মাথাটায় শকুন, বাজ পাখীর বিষ্ঠায় সাদা হ'য়ে আছে;—দেখলে মনে হয় যেন গাছটা কোনো পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলেছে। বাদলার দিন। সকাল বেলা থেকেই টিপি টিপি করে সাড়া দিন বৃষ্টি পড়ে শেষ বেলায় আকাশটা সবেমাত্র ফর্সা হয়েছে। দিনান্তের ম্লান রশ্মি বাগানের গাছের ফাঁক দিয়ে এসে পড়েছে নিমাইয়ের ঘরের ভিতর। দগ্ধ-হস্ত নিমাইয়ের মানসিক অবস্থা, অপরিষ্কৃত, ব্যবস্থাহীন ঘরে বাদল-তান্তারুণ-রাগের আবির্ভাব হ'য়ে একটা শোকাবহ আব-হাওয়ার সৃষ্টি করেছে। বাইরে—বাগানের ভিজে গাছ পালার ভিতর দিয়ে অস্তাচলগামী অরুণদেবের প্রতি তাকালে মনে হয় যেন শোকার্ত্তের সাশ্রুল চাউনী!

খটা-খট্ খটা-খট্ খটা-খট্....ঘর্-ঘর্-ঘুর্।

একটা ঘোড়ার গাড়ী আসার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে,—যদিও নিমাই সেদিকে কাণ দেয়নি। গাড়ীটার শব্দ আর শোনা গেল না। গাড়ীটা দাঁড়িয়েছে বোধ হয়।

নিমাইয়ের মুড়ি খাওয়া শেষ হ'য়ে গিয়েছিল। জল খাবার জন্য উঠি উঠি করছে, চাপা হাসির শব্দ তার কানে যেতেই পিছন ফিরে তাকাল।

"একি! আপনি, কাকীমা—!"

দ্বারগোড়ায় বসুর মা ও বসু মুখে কাপড় দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

"সইয়ের অসুখ করেছে—দেখতে এসেছিলাম; পাড়াতে যখন এলামই, তখন ভাবলাম দেখে যাই বাবু কি করছে—" বলতে বলতে বসুর মা এগিয়ে এল নিমাইয়ের দিকে।

বসু নিমাইয়ের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে ঘরের মধ্যে প্রায় প্রত্যেক জিনিষটাই এক একবার নাড়তে লাগল। তাক থেকে ঘিয়ের কৌটোটা পেড়ে খুলে শুঁকল। সুরাই থেকে জল গড়িয়ে একটু জল খেলে। একটু থুথু ফেললে বাইরে ওদিকের জানালাটা দিয়ে। টেবিলটার কাছে এসে অগুছাল জিনিষপত্র আরও অগুছাল করে দিলে।—চঞ্চলা চপলা বলতে হয়ত এই বসুকেই বলতে হয়। চূড়ান্ত চঞ্চলা।

বসুর মা নিমাইয়ের সঙ্গে গল্প করছিল।—ঘর দোর অপরিষ্কার কেন; ভুখোন কোথায় গিয়েছে।

নিমাই জানাল—তার ছেলের অসুখ করেছে, সেই জন্য ছুটী নিয়ে বাড়ী গিয়েছে।

চেয়ারটার উপর একটা হাঁটু তুলে দিয়ে বসু নিমাইয়ের প্রতি এক দৃষ্টে তাকিয়েছিল।

"ওকি! নিমুদা,—তুমি শিকড়ে পাখী নিয়ে পাখী ধরতে যাও নাও কি?" বলে হুমড়ি খেয়ে নিমাইয়ের দগ্ধ হস্তটা টেনে তুলল।

বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠ্‌ল নিমাইয়ের। ব্যাচারা আপ্রাণ চেষ্টা করছিল দুর্ঘটনাটাকে গোপন করবার জন্য। কিন্তু বসুর শ্যেন দৃষ্টি থেকে কোনো জিনিষ এড়ায় না। প্রকাশ হয়ে পড়াতে সে একবার অসহায় চাউনী চাইলে বসুর প্রতি; সেটা বুলিয়ে নিলে বসুর মায়ের মুখেও।

"কি হোয়েছে?" সাগ্রহে বসুর মা প্রশ্ন করলে।

"পুড়ে গিয়েছে—" নাসিকা ও মুখ কুঞ্চিত করে নিমাই বললে।

"ওমা! কি করে পুড়ল? কৈ দেখি—" বলে হাতটা টেনে নিয়ে ব্যাণ্ডাজ খুলতে লাগল।

দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর মূল স্থানটা লাল হ'য়ে আছে। কি করে পুড়ে গিয়েছে—নিমাই বললে।

বসু দেখল মাত্র। দেখে সে আবার চলে গেল ঘরের ওদিকে। ষ্টোভটার কাছে গিয়ে বসল। হাঁটুতে থুতনিটা রেখে ষ্টোভটা জ্বাললে বিনা প্রয়োজনে।

আহারাদির কথা জিজ্ঞাসা করতে নিমাই জানালে গত কাল রাত্রি থেকে ভাত খায়নি; দোকান থেকে খাবার আনিয়ে খেয়েছে মাত্র।

"আমরা যদি না আসতাম—খবর তুমি কিছুতেই দিতে না আমাদের, বাবা—" অনুযোগের স্বরে বসুর মা বললে।

তা সত্য। নিমাই অনাহারে দিন কাটালেও, তার দুঃখের কথা কাউকে বলে না, এটা তার স্বভাব। যদিও এ-স্বভাবটা বসুর মা জানত না।

শোঁ শোঁ শোঁ—ষ্টোভটা পুরো দমে জ্বলে উঠেছে।

"তোমার কি গরম করতে হ'বে নিমুদা বলো—" সস্‌প্যানটায় খানিকটা জল দিয়ে ষ্টোভের উপর চাপাতে চাপাতে বলল বসু।—যেন গরম জল তার অত্যন্ত প্রয়োজন!

"ও কি হোচ্ছে বসু। দেখো দেখি মিছি মিছি ষ্টোভটা জ্বাললে—" বিরক্তিপূর্ণ স্বরে বসুর মা বললে। "একটা লোক যে তিনটে বেলা খায়নি কিছু সেদিকে তোর হুঁস নেই—"

"যে যে-কাজ পারে না, সে সে-কাজ করতে যায় কেন—" নির্ব্বিকার ভাবে বসু জবাব দিলে। সে শুনেছিল কান পেতে যে ভাতের ফেন গালতে গিয়ে নিমাইয়ের হাত পুড়ে গিয়েছে।

"তুই এসে কোন করে দিয়ে যাস্—" বসুর মা বললে।

"দায়ে কেঁদে গেছে আমার—" বলে ষ্টোভটা নিভিয়ে দিয়ে উঠে পড়ল।

"ও ঘা তো দু' এক দিনে শুকোবে না বাবা—" বলে নিমাইয়ের মুখের দিকে চাইলে বসুর মা: "তুমি এখানে পড়ে কষ্ট পাবে, সে আমি সইতে পারবো না। তোমায় যেতে হ'বে আমার সঙ্গে—" অনুরোধ করে বললেন।

কোনো ওজর খাটবে না দেখে নিমাই নীরবে সম্মতি দিতে বাধ্য হ'ল।

বসুর মা স্বহস্তে সমস্ত জিনিষ গুছিয়ে বাগিয়ে দিলেন। অত্যাবশ্যকীয় জিনিষগুলি ট্রাঙ্কে ভর্ত্তি করলেন নিমাইয়ের কথানুসারে।

"কচুয়ানটাকে ডাকত বসু—"

বসু ঘরে নেই। ব্যাপারটা আগে থেকেই বুঝতে পেরে সে কোচম্যানটাকে ডাকতেই গিয়েছিল। সে কোচম্যানটাকে পাঠিয়ে দিয়ে গাড়ীতে বসে রইল।

অনতিবিলম্বে ট্রাঙ্ক মাথায় কোচম্যানটার পিছু পিছু বসুর মা ও নিমাই এসে গাড়ীতে উঠতেই গাড়ী চল্ল তার গন্তব্য স্থানে।

—চার—

সপ্তাহ দুইয়ের মধ্যেই নিমাইয়ের হাতের ঘা ভাল হ'য়ে গিয়েছে। কিন্তু ভুখোনের ছেলের অসুখ এখনও সারেনি বলে

সে চিঠি দিয়েছে যে, এখন শীঘ্র আসতে পারবে না। সেইজন্য নিমাইয়ের কাকীমা যুক্তিসঙ্গত কোনো কারণ দেখতে পাননা বাসায় নিমাইয়ের পুনর্গমনের।-- আর চাকুরীর মেয়াদও যখন ফুরিয়ে আসছে, তখন নূতন করে লোক নিযুক্ত করে বাসায় যাওয়ার চাইতে ক'টা দিন এখানে থেকে যাওয়াই সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল, একথাটা বুঝাতে সমর্থ হয়েছিলেন নিমাইয়ের কাকীমা।

সেদিন সকালে উপরের বারান্দায় একটা মোড়ায় বসে নিমাই বই পড়ছিল। তার সামনেই রান্না ঘর। রান্না ঘরের বারান্দায় একটা তোলা-উনানের উপর এলুমিনিয়ামের হাঁড়িতে ভাত ফুটছে; তার পাশে বসুর মা বাটনা বাটছে। কতকগুলো ধোয়া বাসন ঝি সবে মাত্র উপুর করে রেখে গেল। তরকারীর চুপরীটা তখনও সরান হয়নি। বঁটিটা পাশেই কাত করা, একটা বড় চাকা থালায় নানা রকম তরকারী কূটা রয়েছে। চায়ের কেট্‌লি, ছাঁকনী, কাপ-ডিস, চায়ের দাগ-ধরা ন্যাকড়াটা একদিকে ইতঃস্তত: পড়ে আছে, ঝি এখনও নিয়ে যায়নি।

রান্না ঘরের এদিকটায় গৃহকর্ত্রী গোপাল রায় একটা পিঁড়ির উপর বসে সর্ব্বাঙ্গে তেল ডোলছেন, পরনে একটা পাঁচ-হাতি সাড়ী। গোপাল নামটা তাঁকেই সাজে বটে! ছেলে বেলায় তিনি যে সত্যিই গোপাল ছিলেন, আজ—এই বিয়াল্লিস বৎসর বয়সেও— কেউ তা অস্বীকার করতে পারবে না। নাদুস নুদুস চেহারা। গোল-গাল মুখ। দেহের কোথাও একটা হাড় জেগে নেই।

সর্ব্বাঙ্গের মাংস থল্ থল্ করছে। বুকের মাঝখানটা কিন্তু ঢুকো; বক্ষের দু পাশের মাংস ঝুলে-প্রায় ওঁর পেটের 'পর পড়েছে। ভুঁরি নেই; পেটে তিন চারটে বেশ মোটা গোটা মাংসের থাক আছে। বুকে পেটে কাঁচা-পাকা চুলে ভর্ত্তি। দু' কাণে এক এক গুচ্ছ করে চুল। মাথা কিন্তু টেকো। ঊর্দ্ধ ললাটের 'পর ঘোড়ার ঝুঁটির মতো এক গোছা চুল। অত্যধিক ফর্সা রঙয়ের উপর তেল পড়ে চক্ চক্ করছে। চোখের চাউনীটা ভিজে বেড়ালের মতো;— ভীরুতার পরিচয় দেয়। অবশ্য এ থেকেই তিনি একটা সু-নাম অর্জ্জন করেছেন যে—'কারুর সাতে পাঁচে থাকেন না তিনি।'

বন্ধু নীচে থেকে খবরের কাগজটা এনে নিমাইয়ের হাতে দিলে। নিমাই বইটা রেখে খবরের কাগজ খুলে পড়তে লাগল।

"কি হে তোমাদের খবরের কাগজে আজকাল কি লিখচ্যা—" কথাগুলো প্রথম দিকটা ধীরে ধীরে বলে শেষের কথাটা এক চোপে আধ-কাটা-গোছ করে শেষ করলেন গোপাল বাবু।

এই গোপাল বাবুর শ্রেণীর লোকগুলো এক অদ্ভুত জীব! জীবনে কোনো দিন খবরের কাগজ ছোঁয়নি। একটা কোলাম শেষ হ'লে তার অপর অর্দ্ধাংশটা খুঁজবে তার অন্য পাতায়! অথচ পাশের কোলামেই সেটা আছে!—কনটিনিউড অন্ নেক্স্ট্ কোলাম—লিখে দিলেও না। রেল কোম্পানীর রুলটানা খাতা অঙ্ক দিয়ে ভরানোর যন্ত্র মাত্র এরা। সৃষ্টি-কর্ত্তার সৎ-উদ্দেশ্য ও

দেহরক্ষার জন্য দক্ষিণ হস্ত চালনা ছাড়া বাইরের জগতে আর যে কিছু আছে, এ চিন্তা এদের মগজে ঠাঁই-ই পায় না।

নিমাই তাঁর কথায় কাণ দেয়নি। সে খবরের কাগজটা বগলে আর অন্য হাতে বইটা নিয়ে নীচে নেমে গেল তার ঘরে।

গৃহিনী সুধা দেবী—বসুর মা—স্বামীর পিটে তেল দিয়ে দেবার জন্য এলেন।

"নিমাইয়ের সঙ্গে তোমার মেয়ের বিয়ে দাও না—" গোপাল বাবু বললেন। "ছেলে তো ভালো, দেখতে শুনতে সবদিক দিয়েই—"

"নিমাইয়ের সঙ্গে বসুর বিয়ে!" সবিস্ময়ে সুধা দেবী স্বামীর প্রতি তাকালেন।

"কেন, তোমার মেয়েরও তো বিয়ের বয়স হয়েছে—" বলে গোপাল বাবু স্ত্রীর প্রতি তাকিয়ে রইলেন।

"ওর কেউ কোথাও নেই; স্থায়ী চাকরী পর্য্যন্ত নেই—" দুঃখের স্বরে বললেন সুধা দেবী: "ও আমার হাঁড়ি ঠেলে রান্না করতে পারবে না; দুধের বাচ্ছা মেয়ে আমার। বসুর আমি বিয়ে দেবো পাকা মোটা মাইনে গভর্নমেণ্টের চাকুরের সঙ্গে। যে ওর পিছনে রাধুনী-ঝি রাখতে পারবে—তাতে আমার সর্বস্ব খোয়াতে হয় সেও বিয়াচ্ছা—" সুধা দেবী মনে মনে উৎফুল্লিত হ'য়ে উঠলেন মেয়ের সু-উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে। তার ছাপ চোখে মুখে উঠল ফুটে। যেন তিনি চোখের সামানে দেখছেন:

মেয়ে ইজি-চেয়ারে ব'সে বই পড়ছে; পাশে পাঁই পাঁই করে ঘুরছে সাইড্-ফ্যান। ঝি-চাকর-রাঁধুনী তাঁকে নিয়ে সদাই ব্যস্ত। সোহাগী জামাতার কন্যার প্রতি আদর আলাপ। গোপাল বাবু নিকটে থেকেও শুনতে পেলেন না স্ত্রীর স্বগতোক্তি : "দশ হাজার বার হাজার যা লাগে—ওই তো আমার একটী মাত্র সম্বল—"

প্রায় ঘণ্টা খানেক ধরে খবরের কাগজ পড়ল নিমাই। পড়া শেষ করে পূর্ব্বের অসমাপ্ত বইখানা খুললে।

কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ একটা হৈ-চৈ-এর শব্দ তার কাণে যেতেই বইটা বন্ধ করে কাণ খাড়া করল নিমাই।

"কে কোথায় আছো শীগ্‌গীরি এসো গো—আমার সর্ব্বনাশ হোলো—"

কয়েকটা নারী কণ্ঠের সমবেত কোলাহল।

নিমাই দৌড়ে ঘর থেকে বেড়িয়ে এলো পথে। পথে কিচ্ছু নেই। তখন সে বুঝতে পারাল বাড়ীর ভিতরে—খিড়কীর দিকে; ছুটল সে সেইদিকে। বাড়ীতে ঢুকেই দেখল গোপাল বাবু পাগলের মতো অর্দ্ধোলঙ্গ হ'য়ে নিমাইয়ের খোঁজে আসছে। "ও নিমাই—বসু আমার ডুবে মরে গেল, শীগ্‌গির এসো—" আকুল ভাবে বললে।

নিমাই মালকোঁচা আঁটতে আঁটতেই ছুটল। গিয়ে দেখল—দূরে বসুর চুল আর কাপড়ের একটা কোণা জলের উপর ভাসছে। ঘাটে অন্যান্য মেয়েরা আর্ত্ত স্বরে চীৎকারে রত; সুধা দেবী

চাপড়াচ্ছে বুক। নিমাই মুহূর্ত্তে ভীড় ঠেলে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। যে মানুষ জলে ডুবছে, তাকে তোলা খুব সহজ কাজ নয় এটা চিন্তা করে খুব সাবধানে যেতে হয়—নিমাই এ সব কথা ভুলে গিয়েছিল। সে বস্থর কাছে গিয়ে একটা চক্কর দিয়ে নিলে প্রথম। তারপর ঘাটের দিকে মুখ ক'রে দিলে ডুব। ডুব দিয়ে বস্থর পা দুটো জড়িয়ে ধরে তাকে জলের উপর তুলে ধরল। তারপর ডুবে ডুবেই একদমে হাজির হ'ল একেবারে ঘাটে।

"ও গো ডাক্তার ডাকতে গেলে গো—যাঃ মেয়ে আমার মরে গেছে বোধ হয়—" আকুল ভাবে স্থধা দেবী কাঁদতে লাগলেন।

নিমাই বস্থকে বুকে করেই একেবারে বাড়ীতে এনে ফেললে।

ঘাটে গোপাল বাবু যখন স্নান করছিলেন, বস্থও সেই সময় গিয়েছিল স্নান করতে। ঝি যখন বাবুর পিঠ ডলে দিচ্ছিল সেই সময় বস্থ তার ঘড়া নিয়ে তার উপর বুক রেখে আরম্ভ করলে সাঁতার কাটতে। সাঁতার কিন্তু সে জানে না। যখন ডুবন-জলে গিয়েছে তখন হঠাৎ ঘড়াটা ফস্কে যায়; তারপর চেষ্টা করেও ধরতে না পেরে ডুবে গিয়েছিল।

ডাক্তার এসে প্রাথমিক চিকিৎসা করলেন। খানিকটা জলও উঠে গেল সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু সম্পূর্ণ জ্ঞান তখনও হয়নি। নিমাই যে তখনও ভিজে কাপড়ে আছে সে হুঁস তাঁর ছিল না; বসে বসে বস্থর মাথায় হাওয়া করছিল।

"মা—" কান্নার স্থুরে বস্থ ডাক্‌লে।

মেয়ের জ্ঞান হ'য়েছে দেখে সুধা দেবী হাউ মাউ করে কেঁদে বলে উঠল,—"নিমাই না থাকলে কি সর্ব্বনাশ হতো আমার গো—। পই পই করে বলেছি, যাস্‌নি বসু, যাসনি—সাঁতার কাটতে; হ'য়ে আমার কথা রাখবে—"

বসু আপনা থেকেই ওঠে বসল।

সুধা দেবী তিরস্কার মিশ্রিত স্বরে মেয়েকে আদর করতে লাগলেন। আঁচল দিয়ে মুখ মুছিয়ে দিয়ে চুলগুলো লাগলেন চিড়তে।

নিমাইয়ের কাজ শেষ হয়েছে। কিন্তু তখনও সে পূর্ব্বের মতো ব'সে হতভম্ব হ'য়ে মাতা-কন্যার কান্না-আদর দেখছিল।—সুধা দেবী একবারও লক্ষ্য করলেন না যে নিমাই তখনও ভিজে কাপড়ে রয়েছে।

"এক কাণ্ড বাধিয়ে দিয়ে সকলের নাওয়া খাওয়া মাথায় উঠিয়ে দিয়েছিলি—" বলে মেয়ের মুখটা বুকে চেপে ধরলেন সুধা দেবী। তিনি বললেন ঝি-কে উদ্দেশ করে—বিজু, পুরুত ঠাকুরের কাছে যা; কালকেই জল-কুমারীর পূজো দেবার ব্যবস্থা করবো।"

নিমাই একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে উঠে পড়ল। মেয়ে-নিয়ে-ব্যস্ত সুধা দেবীর তার প্রতি ঔদাসীন্যটা বুকে লাগল।

—পাঁচ—

নিমাইয়ের চাকরী মাত্র আর একটা সপ্তাহ আছে। দিন যত ঘনিয়ে আসছে তার বুক তত যাচ্ছে শুকিয়ে। চাকরীর জন্য নয়। এখান থেকে চলে যেতে হ'বে, সেই জন্য। কেননা চাকরী গেলে কোন্ অজুহাতে সে আর এখানে থাকবে? যদিও সুধা দেবী বা গোপাল বাবু সে সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন করতেন না।—কিন্তু নিমাই মনে মনে ঠিক করে রাখল চাকরী যেদিন যাবে তার পরদিন সে চলে যাবে পুনরায় বাসা ঠিক করতে। তবু সে এ সহর ছাড়বে না।···কেন? বন্ধুর জন্য? তা যদি কেউ তাকে জিজ্ঞাসা করত, সে-কথার সে জবাব দিতে পারত না। কারণ সে লক্ষ্য করেছে তার প্রতি বন্ধুর উপেক্ষা। সুধা দেবী তাকে স্নেহ করলেও—এ সব বিষয়ে তাঁর সিদ্ধান্ত সুচিন্তিত। কিন্তু এটাও ঠিক যে, সে বন্ধুকে ভালবাসে। প্রাণ দিয়ে।

অবশেষে শেষের সপ্তাহও শেষ হয়ে গেল। অফিস থেকে বাড়ী ফেরবার পথে সে তার পূর্ব্বের বাসাটা দেখতে গিয়েছিল।···খালি আছে বাসাটা। দরয়ানকে বলে এক রকম ঠিক করে ফেল্ল। দরয়ান প্রতিশ্রুতি দিল রাঁধবার লোক জোগার করে দেবার। মনে মনে সে বেশ একটু খুসী হ'ল। মনকে সে বোঝাতে লাগল: কি হ'বে চাকরী করে। কার জন্য চাকরী করব। তার চেয়ে এই খানে থাকাই ভাল।

"চেষ্টা চরিত্র করে তোমাদের আপিসে দাও না নিমাইয়ের একটা চাকরী করে—" নিমাইয়ের দুঃখে দুঃখী হ'য়ে সুধা দেবী গোপনে স্বামীকে উপরোধ ধরল।

"আর কি সে-দিন আছে—সাহেবদের ধরলেই চাকরী—" গোপাল বাবু জবাব দিলেন।

পরদিন খাওয়া দাওয়া করে নিমাই তার ঘরে বসে বই পড়ছে, পিওন এসে একখানা লেফাপা দিয়ে গেল।

খুলে পড়েই তার মুখ গেল শুকিয়ে। প্রায় দেড় মাস আগে সে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে কোলকাতার একটা সাহেব-অফিসে চাকরীর দরখাস্ত করেছিল—সেখান থেকে একেবারে অ্যাপয়েন্টমেণ্ট লেটার এসেছে। এখানকার বে-সরকারী অফিসে যা মাইনে পেত তার চেয়ে ঢের বেশী মাইনে। বেশ সে একটু বিচলিত হ'য়ে ঘরে পায়চারী করতে সুরু করে দিলে। কিংকর্ত্তব্য? পাওয়া চাকরীটা হাত ছাড়া করে, চোখ কাণ বুজে এখানে থাকবে; না চাকরীটা নিয়ে এখানকার বন্ধন ছিন্ন করবে? চিঠিখানা বুক পকেটে রেখে পূর্ব্বের মতোই পায়চারী করতে লাগল সারা ঘরটা। সে ভাবল, এ যেন তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কে ষড়যন্ত্র করে তাকে এখান থেকে সড়িয়ে নিয়ে যাবার জন্য চাকরীটা জুটিয়ে দিয়েছে! নেবে না এ চাকরী; নিমাই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হল শেষ পর্য্যন্ত।""বুক পকেট থেকে চিঠিখানা বার করে ট্রাঙ্কের এক কোণে লুকিয়ে রাখল। ঘর থেকে

বেড়িয়ে যাবার সময় তার লক্ষ্য হল, গায়ের জামাটা অত্যন্ত ময়লা। জামাটা পাল্টে সে বেড়িয়ে পড়ল।

নিমাই বেড়িয়ে যাবার পর সুধা দেবী ঘরে ঢুকে বিছানার ময়লা চাদর, বালিশের ওয়ার নূতন করে বদলে দিলেন। ময়লা কাপড় জামা স্নাগনে যা পেলেন তাই নিয়ে এলেন, ধোপাকে দেবার জন্য। উপরে এসে জামার পকেটগুলো দেখে দেখে দিতে লাগলেন। একটা জামা থেকে বেড়িয়ে এল একখানা খাম। সুধা দেবীর হাত থেকে খামখানা ফস্কে পড়ে যেতেই সেটা মাটিতে পড়বার আগে তার ভিতরকার চিঠিখানা সরাৎ করে আগে মাটিতে পড়ে গেল। সামনে বসু দাঁড়িয়ে ছিল। ছাপানো লেটার-হেড-যুক্ত সুন্দর কাগজ টাইপ করা চিঠি দেখে সে আগ্রহভরে কুড়িয়ে নিয়ে পড়তে লাগল।

"কে দিয়েছে ও-চিঠি, কোনো আপিসের বুঝি—"

বসু তার থার্ড ক্লাস পর্য্যন্ত পড়া বিদ্যে দিয়ে কোনো রকমে সমর্থ হ'ল সেটার বাংলা অর্থ করতে।

"নিমুদা বোধ হয় চাকরীর দরখাস্ত করেছিল, তাই তারা চিঠি দিয়েছে—আপনার দরখাস্ত মঞ্জুর হ'য়েছে। আপনি আগামী পাঁচুই তারিখে আপিসে হাজির হ'বেন। আপাতত আশি টাকা মাইনে—"

"সত্যি!" সুধা দেবী বিশ্বাস করতে পারলেন না। "তা' হলে নিমাই আগে এসে আমায় বলতো—"

"আহা নয় তো কি—! দেখ না তুমি পড়ে; যদি তা' না পার, কাউকে দিয়ে পড়িয়ে দেখ, আমার কথা সত্যি কি মিথ্যে—"

"তা' যদি সত্যি হয়—" একটুখানি থেমে অনুযোগের স্বর বদলে সহজ স্বরে বললেন সুধা দেবীঃ "বাছাধনকে যা' দু'কথা শোনাবো। চাকরীর চিঠি এসেছে অথচ আমায় জানায়নি।"

নীচেয় নিমাইয়ের চটির শব্দ শুনতে পেয়ে বসু ছুটে সিঁড়ির কাছে এলো; এসে রেলিং-এ ভর দিয়ে ঝুঁকে বললে, "নিমাই সন্ন্যাস, সন্দেশ খাবার টাকা দাও—" (নিমাইয়ের পদবী সান্ন্যাল বলে বসু তাকে মাঝে মাঝে নিমাই সন্ন্যাস বলে ডাকত)

নিমাই ব্যাপারটা কিছু বুঝতে না পেরে বসুর দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল নীরবে।

"নিমাই—" সুধা দেবী ডাকলেন : "উপরে এসো তো একবার।"

নিমাই উপরে যেতেই সুধা দেবী বললেন, "রাগ্ করেছি; খু-উ-ব—"

"অপরাধটা না জানতে পারলে—

নিমাইয়ের কথা শেষ না হ'তেই, বসু চিঠিটা খুলে পড়তে সুরু করে দিলে

"ও-চিঠি কোথায় পেলে তুমি—!" আশ্চর্য্য হ'য়ে নিমাই বসুর দিকে এগিয়ে গেল খানিকটা।

"হুঁ হুঁ বাবা, চাকরীর চিঠি এসেছে, অথচ আমায় জানাওনি।" সুধা দেবীর কণ্ঠে অনুযোগের স্বর।

সুধা দেবীর কথায় কর্ণপাত না করে নিমাই সাগ্রহে জানতে

চাইলে,—"ট্রাঙ্ক থেকে ও চিঠি বার করলে কে—?" নিমাইয়ের স্বরে অসহায়ের আকুলতা।

"ট্রাঙ্ক থেকে! না, না; তোমার জামার পকেটে ছিল। ধোপাকে একটু আগে জামা-কাপড় দিতে গিয়ে তোমার সাদা হাত-কাটা জামার পকেট থেকে বেরুল—" সুধা দেবী বললেন।

নিমাই জীবনে এই প্রথম অপ্রত্যাশিত এবং বিস্ময়কর আঘাত পেলে। তার বাক্যস্ফুট হল না কিছুক্ষণের জন্য। সে স্মরণ করে দেখল যে, চিঠিখানা সে নিশ্চয়ই ট্রাঙ্কে রেখেছিল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দু'হাতের আঙ্গুলগুলির অগ্রে অগ্রে স্পর্শ করতে করতে অসহায় ভাবে সুধা দেবী ও বসুর প্রতি একবার তাকিয়ে ধীরে ধীরে দৃষ্টিটা মাটিতে নিবদ্ধ করে শান্ত স্বরে বললে,—"একটুখানি আগে চিঠিটা এসেছে মাত্তর—"

নীচে তার ঘরে এসে নিমাই দেখলে ট্রাঙ্ক যেমন তালা বন্ধ করে গিয়েছিল তেমনিই আছে। পকেট থেকে চাবি বা'র করে খুলল সেটা। তারপর সন্দেহ নিরসনের জন্য যেখানে চিঠিখানা রেখেছিল বা'র করল সেখান থেকে। তার আশ্চর্য্যের আর সীমা রইল না! ও-খানার বদলে সে রেখেছে অন্য একটা, যেটা অপেক্ষাকৃত বড় খাম!

"ভাগ্য তোমার সু-প্রসন্ন, তাই ভগবান একটা যেতেই সঙ্গে সঙ্গে আর একটা জুটিয়ে দিয়েছেন—" বলতে বলতে সুধা দেবী ঘরে ঢুকলেন।

সুধা দেবী ঘরে প্রবেশ করতেই নিমাই একটু অপ্রস্তুত হ'য়ে পড়ল; কেননা উপর থেকে এসেই সে ট্রাঙ্ক খুলছে দেখলে সুধা দেবীর মনে অন্য ধারণা জন্মাতে পারে। সেটা বন্ধ করেই তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল। চেয়ার থেকে তোয়ালেটা নিয়ে মুখটা মুছে একটু হাঁসবার চেস্টা করল। সে-হাঁসি দেখাল দাঁত খিঁচানোর মতো।

"যাই, বিজুকে ধোপা বাড়ী যেতে বলি; পরশুর মধ্যে যাতে তোমার কাপড় জামাগুলো দেয়। আজ পয়লা; চার তারিখের মধ্যে তোমাকে কোলকাতায় পৌঁছুতে হ'বে তো—" মাতৃসুলভ স্বরে সুধা দেবী বললেন।

নিমাই যেন চীৎকার করে বলতে চাইলে, না,—আমি ও চাকরী নেব না। কিন্তু সে পারল না; মাত্র করুণ ভাবে সুধা দেবীর প্রতি এক চোখ চাইলে।

ও চাকরী আমি নেব না,—বললে সুধা দেবী যদি কারণ জানতে চায় তা' হ'লে ঝুরি ঝুরি মিথ্যা কথা বলে আসল কারণটাকে চাপা দিতে হ'বে, যাতে সে একেবারে অনভ্যস্ত।

"একটা ভালো দেখে বোর্ডিং-এ থেকো। যা' তা' হোটেলে খেয়ো না; হোটেলে পচা ভাত তরকারি খাওয়ায়—" সুধা দেবী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই রকম ধরণের অনেক পরামর্শ দিলেন। চা খেয়ে যেন বাড়ী থেকে বেঁড়োয়, অবশেষে এই কথা বলে সুধা দেবী ঘর থেকে বেড়িয়ে গেলেন।

নিমাই বসে বসে ভাবতে লাগল এ ষড়যন্ত্র কে করলে; তার

কি প্রয়োজন ছিল ? ঘাড় ধরে ধনঞ্জয় বিদায়ের মতো তাকে যখন এখান থেকে বা'র করে দিচ্ছেই তখন নতমুখে বেড়িয়ে যাওয়া ছাড়া থাকবার প্রয়াস পাওয়া নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচায়ক—শেষকালে সে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হল।

"বসু—জানো, আজ আমি যাব—" নিমাই বললে; বসু ঘরে এসেছিল বই নেবার জন্য স্কুল যাবার সময় হয়েছে।

বসু নিমাইয়ের দিকে একবার তাকিয়ে আপন মনে, বই গোছাতে লাগল।

"নাই বা গেলে আজ ইস্কুল—" নিমাইয়ের গলা কাঁপতে লাগল: "তিনটের ট্রেণে আমি রওনা হ'য়ে যাব ; তোমার সঙ্গে আর দেখা হ'বে না তা' হ'লে—" নিমাই বসুর খুব কাছে এসে কথাগুলো শেষ করলে।

"উঁ-হুঁ, ইস্কুল কামাই আমি করব না—" মাথা হেঁট করেই বসু বললে।

ভ্যাঁ—ক্, ভ্যাঁক্, ভ্যাঁক্, ভ্যাঁ—ক্।

"যাই ; মোটর এসে গিয়েছে—" বসু নিমাইয়ের প্রতি চকিতে এক চোখ চেয়ে নিয়ে ঝটিতি ঘর থেকে বেড়িয়ে গেল।

রাস্তার দিকের জানালায় গরাদ ধরে নিমাই দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল; বসু গাড়ীতে উঠলে। সে দাঁড়িয়ে রইল—যতক্ষণ না গাড়ীটা দূরে একটা মোড় ঘুরতে অদৃশ্য হ'য়ে গেল।

ফেটিনে ট্রাঙ্ক বিছানা চাপান হ'য়ে গিয়েছে। সুধা দেবীকে নিমাই প্রণাম করে দাঁড়াতেই তিনি হাত দিয়ে তার চিবুক স্পর্শ করে মুখে ঠেকালেন। তাঁর চক্ষু অবশ্য সিক্ত। আঁচল দিয়ে মুছতে মুছতে রাস্তা পর্য্যন্ত এলেন। নিমাইয়ের বুকটায় যেন কুকুরে বেড়ালে আঁচড়াতে লাগল। তার দৃষ্টি চারদিক থেকে আছাড় খেয়ে খেয়ে ফিরতে লাগল: বন্ধুকে আর একবার দেখবার জন্য। ব্যর্থ সে চাহনী!

দশটার সময় বন্ধুর স্কুলের গাড়ী যে মোড় ঘুরে অদৃশ্য হ'য়ে গিয়েছিল, সেই মোড়ে তার ফেটিন গাড়ী অদৃশ্য হ'য়ে যাবার পূর্ব্বে নিমাই হাত দুটো তুলে সুধা দেবীকে আর একবার প্রণাম জানাল— সুধা দেবী তখনও রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

—ছয়—

নিমাই কোলকাতায় এসেছে প্রায় তিন মাস গত হ'য়ে গিয়েছে।

সেদিন রাজার চকে এক ব্যবসায়ী বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল সে। বন্ধুবরের সঙ্গে ঘন ঘন দেখা করে না ব'লে অনেক অনুযোগ তাকে শুনতে হয়। কিন্তু বন্ধুবরের কাছে অন্য অজুহাত দেখান ছাড়া সত্য কারণটা সে কোনো দিন বলেনি।

সত্য কারণটা হ'চ্ছে—এই ষ্ট্রাণ্ড রোডটার উপর যে বীভৎস অত্যাচার হয়, সেটা সে চোখ মেলে চেয়ে দেখতে পারে না।

লোকজন-ট্রাম-বাস-বিদেশী-মাল-বোঝাই-লরী-ঘোড়া-মহিষ গরুর-গাড়ী-ঠেলা মায় উড়েদের হাত-টানা ছোট ছোট গাড়ীগুলো এক সঙ্গে মিলে যখন ভীড় ক'রে রাস্তাটার বুক পেঁতলে মারিয়ে যায়, সে-দৃশ্য সত্যই করুণ। ধরিত্রী বলেই এই নিষ্ঠুর অত্যাচার ধৈর্য্য-ধরে সহ্য করে! এ সমস্ত দেখলে একটা কথা মনে হয়,—যেন সমস্ত কোলকাতা সহরটা বঙ্গরাণীর একটা বিরাট প্রাসাদ, যেখান থেকে অন্নসত্র হয়—আর তারই দ্বারে পৃথিবীর সমস্ত দেশের লোক ভিখারীর বেশে ভিক্ষাপাত্র হাতে ক'রে হুড় হুড় কূল কূল করে ঢুকছে—ভিক্ষা নেবে বলে!

নিমাইয়ের বন্ধুটি দোকানের ভিতর কাজে ব্যস্ত থাকাতে সে এক পাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। তার সামনে পথের পাশে একটা মাল-বোঝাই গোরুর গাড়ী। গরু দুটোর কাঁধে জোয়ালটা একেবারে চেপে বসে গিয়েছে। কিন্তু গরু দুটি দাঁড়িয়ে আছে একেবারে নিস্পন্দ হয়ে; কেবল তাদের চোখ দুটো মিট্ মিট্ করছে। দেখলে এই কথাটাই মনে হবে যে,—এ জগতে যে-ই পদার্পণ করেছে তাকে যে জোয়াল বহন করতে হবেই, আর সেটায় নির্ব্বিবাদে কাঁধ দেওয়াই যে বুদ্ধিমানের কাজ ও সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল,—তা' স্বয়ং-সিদ্ধ-স্রষ্টার-শ্রেষ্ঠ-জীব দ্বিপদ জন্তুরা না বুঝলেও ওই চতুষ্পাদ জন্তু বলদ দুটো বেশ ভালো ভাবেই বুঝতে

পেরেছে—সেই জন্যই নির্বিকার ভাবে দাঁড়িয়ে আছে কাঁধে জোয়াল নিয়ে···

হঠাৎ নিমাই দেখতে পেল, নরেন নামে তার আর একটি বিশিষ্ট বন্ধু কিছু দূর দিয়ে চলেছে।

নরেন চলেছে আপন মনে। অহেতুক বাঁ হাত দিয়ে কপালটা খুঁটছে,—মাথাটা ঈষৎ নত। ডান হাতের আঙ্গুলগুলোর পর্ব্ব বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা জলদ স্পর্শ করছে, যেন কিছু একটা হিসাব করতে ব্যস্ত।...মাথার চুলে তেল পড়েনি কতদিন, তা ও ই জানে—মনে হচ্ছে যেন একটা কাকের বাসা। জামা কাপড় অ-ভদ্রজনোচিত মলিন। পায়ের কেড্‌স্ জোড়া বিশ্রি ময়লা; তাতে আবার পায়ের গোড়ালি দুটো ছিঁড়ে গিয়েছে বলে চটির মতো করে পরেছে।

নরেনের অত্যধিক অন্যমনস্কতার জন্য তার জামার হাতটা একটা রিক্‌সার হাতলে লেগে ছিঁড়ে গেল। নরেন থমকে দাঁড়িয়ে এমন একটা প্রোলিটেরিয়েট-মার্কা চাহনী দিয়ে একবার রিক্‌সাওয়ালা ও জামার ছেঁড়া স্থানটির প্রতি তাকাল—তা সত্যই অবর্ণনীয়। যেন, তার উপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে সে অভিযোগ করে করে আলা হ'য়ে গিয়েছে, তাই এখন সে করেছে, নীরবে সহ্য করবার প্রতিজ্ঞা!

কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে তাকে ডাকতে যাচ্ছিল নিমাই। এমন সময় এদিকে একটা ছটো-খাটো প্রলয়কাণ্ড ঘটে গেল!

দুটো ষাঁড়ে লড়াই করতে করতে এগু-পিছু করছিল। হঠাৎ একটা মুটের গায়ের ওপর পড়তেই এক সঙ্গে দু' তিনটে মুটে হুড় মুড় করে পড়ে গেল ফুট-পাথে।

একজনের মাথায় কেবল নানান্ ঠাকুর দেবতার পিক্চার ছিল, সবগুলোই গেল ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে। সে মুটে নয়। গ্রামাঞ্চলে কোনো একটা মেলায় বেচবে বলে কিনে নিয়ে যাচ্ছিল ব্যাচারা। সে প্রায় পাগলের মতো হ'য়ে ভাঙ্গা কাঁচের স্তূপগুলো দু' হাত দিয়ে সড়াতে লাগল, তাতে তার হাত ক্ষত বিক্ষত হয়ে ঝর্ ঝর্ করে রক্ত পড়ছে, সে দিকে তার খেয়াল নেই। কান্নার সুরে বলছে "আমার সব্বনাশ হোলো গো—গয়ণা বাঁধা দিয়ে দশ টাকার পট কিনেছিলাম গো —"

ওদিকে অন্য মুটেটা তার একটা পা হাত দিয়ে তুলে ধরে মাটিতে গড়াগড়ি দিতে দিতে বলছে, "ইয়া — রাম —ইয়া রাম —"

একটা লোকের কাপড়ের গাঁট বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল ঐ মুটেটা। মালিক পাশে দাঁড়িয়ে আছে—ধূতি-পাঞ্জাবী সিল্কের চাদর ঘড়ি চশমাওয়ালা এক বাবু। দাঁত মুখ খিঁচিয়ে মুটেটাকে বলছে,—"এই, আমার ট্রেণ ফেল হ'য়ে যাবে যে উল্লুক কাঁহা কো—"

মুটেটার একটা পায়ের হাঁটু থেঁতলে গিয়েছে সেদিকে ভদ্রলোকের খেয়াল নেই; সে তার গাঁট সামলাতেই ব্যস্ত।

মুটেটার অবস্থা দেখে তাড়াতাড়ি নিমাই বললে,—"ধীরেন এ্যাম্বুলেন্সের জন্য ফোন্ কর, শীগ্গীর ফোন কর …

মুটেটাকে মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি করে দিয়ে নিমাই দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে পা চালিয়ে দিলে মাঠের দিকে, ভ্রমণের জন্য। চিত্তরঞ্জন এভিনিউতে যখন এসেছে তখন তার চোখে পড়ল কিছু দূর দিয়ে নরেন চাঁদনী চকের দিকে যাচ্ছে। একটু তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে সে ডাকল, "নরেন—"

নরেন থমকে দাঁড়িয়ে পিছু ফিরে নিমাইকে দেখে বেশ একটু সঙ্কুচিত হ'য়ে পড়ল।

"আজকাল চোখ বুজে পথ হাঁটিস নাকি?" হাঁসিটা চেপে নিমাই প্রশ্ন করল।

"কি রকম—"

"তা' নইলে কি রিক্সার হাতলে লেগে জামাটা ছেঁড়ে?"

"তুই কি করে দেখলি?"

"হঠাৎ—"

নরেন নীরবে হাসতে হাসতে জামার ছেঁড়া স্থানটা জোড়া দেবার মতো করতে লাগল।

"ওদিকে কোথায় যাচ্ছিলি?" নিমাই জানতে চাইলে।

"জগন্নাথ ঘাটে এক মাড়োয়ারীর মশলার আড়তে একটা লোকের দরকার, সেইটের খোঁজে গিয়েছিলাম—"

"কি হ'ল?"

"সেই আড়তেই থাকতে হ'বে আর খাওয়া বাদে কুড়ি টাকা মাইনে—" বলে নিমাইয়ের মুখের দিকে চেয়ে রইল। তার চাহনী

এই প্রশ্নই করছিল যে, একটা এম. এ. পাশ যুবক এতটা হীনতা স্বীকার করে ওই সামান্য অর্থে চাকরী গ্রহণ করতে পারে কি না ?

নিমাই কিছুক্ষণ মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল। পরে প্রসঙ্গান্তরে গেল, "আমার সঙ্গে দেখা করিস না আর কেন ?"

নরেন কি জবাব দিলে তা' শুনতে পেল না নিমাই। কারণ ঠিক ওই সময়েই তাদের সামনে দিয়ে তিনটে লড়ীতে প্রায় শ' আড়াই ছোটো ছোটো ছেলে বোঝাই করে নিয়ে পাশ কাটিয়ে গেল, 'ভোট ফর সেন সাহেব, ভোট ফর সেন সাহেব—' বলে চীৎকার করতে করতে।

কর্পোরেশনের প্রতিনিধি নির্বাচন হচ্ছে।····এই এক চোট্টামী ব্যবসা! দিন দুপুরে শত-সহস্র লোকের চোখে ধূলো দিয়ে ডাকাতি করার মতো। মনস্তত্ত্বের দিক দিয়ে বিচার করে দেখতে গেলে এদের চোট্টামী ধরা পড়ে।· আর একটা কথা হোচ্ছে—যে যত বড় প্রবঞ্চক এবং স্বার্থান্বেষী সে তত বেশী ঢোল পিটিয়ে নিজের নাম জাহির করবার চেষ্টা করে। প্রতিনিধিত্ব করতে হ'লে যে-মহত্বের প্রয়োজন, তা' এই শঠগুলোর নেই।

জি. ই. সি-র বাড়ীর চাতালটায় দাঁড়িয়ে নিমাই আর নরেন গল্প করছিল। ঠিক ওই খানেই একটা হিষ্ট-পুষ্ট কালো কুচ কুচে অন্ধ 'আল্লা দেগা, আল্লা দেগা' বলে ভিক্ষা করে। তার সামনে এক মুসলমান ছোক্‌রা ভিখারিণীটির সঙ্গে প্রেমালাপ করছিল।

ছোকরার চেহারাটা তালপাতার সেপাইয়ের মতো! পরনে একটা সবুজ-লালের ডোরা কাটা লুঙ্গী; গায়ে লালচে রঙের সিল্কের গেঞ্জি—তার গায়ের কয়লার মতো কালো রঙে-এর সঙ্গে দেখাচ্ছে বেশ! সে আবার তিন দিক চেঁচে চুল ছেঁটেছে; মাথার ওপরের চুল থেকে তেল গড়িয়ে পড়ছে তা' বেশ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে! সিগরেটটা ছাই ঝাড়বার জন্য যখন মুখ থেকে বা'র করছে, তখন স্পষ্ট দেখা যায় পানের পিকে সেটা ভিজে গিয়েছে অর্দ্ধেকটা।··· ছোক্‌রা এদিক ওদিক চেয়ে কিছু একটা বলে যখন হাসছে, তখন মনে হয় যেন ওর গলার ভেতর থেকে ঘুঁঙ্গুর বাজার শব্দ আসছে!

নিমাই দেখছিল, অন্ধ মেয়েটির হাসি। অন্ধরা জানে না কার কাছে কোন কথায় কি রকম ভাবে কতখানি দাঁত বা'র করে হাঁসতে হবে! তারা হাসে, সত্যিকারের হাঁসি। হাঁসির প্রকৃত রূপটা অন্ধদের মুখ থেকেই ভালো রকম দেখতে পাওয়া যায়।

"আর যে পারি না নিমাই···জীবনটায় ধিক্ ধিক্ লেগে গিয়েছে—" বন্ধুর কাছে নরেন দুঃখ জানাল হতাশার স্বরে।

নিমাইয়ের বুকে যেন কে এক ঘা মুগুর মারলে!···কেন না সে মোটা মাইনের চাকরী করে। আর তাকে চোখ মেলে দেখতে হ'চ্ছে বন্ধুর এই দুর্দ্দশা। সে আর এক মুহূর্ত্তও স্থির থাকতে না পেরে তাকে টেনে নিয়ে গেল এস্‌প্লানেড একটা রেঁস্তরাঁতে; সেখানে দু'জনে পেট ভরে জলযোগ সেরে, কার্জ্জন পার্কে গিয়ে বসল।

নিমাইয়ের চোখ দুটোকে পীড়া দিচ্ছিল তার বন্ধুর চেহারাটা।

··· কর্ম্মহীনের গোপনে গোপনে রক্ত শুকিয়ে দেহের সার পদার্থ জল হয়ে নির্গত হ'য়ে যায়। আর তাঁরই ছাপ পড়ে সর্ব্বাঙ্গে! তখন প্রকাশ্যে মুখ দেখাতেও মরে যেতে হয় মরমে।··· নিমাই বন্ধুর প্রতি অপাঙ্গে একবার করে তাকায় আর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে ভাবতে থাকে,—জীবনের প্রথম ভাগে পরীক্ষার দুর্গম পথ প্রাণপণে অতিক্রম করতে করতে মানুষ আশা করে পরবর্ত্তী জীবনে কুসুমস্তীর্ণ পথের; যে পথে সে একটী সহচরীকে নিয়ে বুকভরা আনন্দে হেঁসে খেলে হাঁটতে থাকবে।····পথের দু'পাশ থেকে ফুল ছিঁড়ে দু'হাতে ইচ্ছা মতো ছড়াতে ছড়াতে প্রাণ খুলে গান গেয়ে—দিন কাটাবে।····সে আশা করে প্রতি দিন একটা একটা করে পাপ্‌ড়ী মেলে সমাজে পূর্ণ বিকশিত হ'বার; বিকশিত হ'বার পর সে চায়, পৃথিবীর যত কিছু সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লোমকূপের প্রতি রন্ধ্র দিয়ে উপভোগ করতে।··· কিন্তু তা' না পেয়ে যদি পায় কণ্টাকীর্ণ পথ, যদি তার আশার-কোরক প্রস্ফুটিত হ'বার সুযোগ না পেয়ে অভাবের আওতায় যায় দিন দিন শীর্ণ, ম্লান হ'য়ে,—তবে তখন যুগপৎ ঊর্দ্ধমুখে ঈশ্বরকে গালি আর ধরণীর বক্ষে পদাঘাত করতে ইচ্ছা যায়! ·· নিমাই ভাবলো,—মানুষ চায় তার রক্ত-কণিকা থেকে একটা জীব সৃষ্টি হ'বে, তাই সে দেখবে হাসিমুখে।····এই আশাতেই তার বুক ভরে হ'য়ে থাকে কানায় কানায়।··· এরই মধ্যে তো জীবনের স্বার্থকতা।··· এই তো সমস্ত কাহিনীটির সারাংশ।··· এ ছাড়া আর যা',—নিমাই আরও ভাবল,—যারা সাধারণ সমাজ-জীবনকে দার্শনিকের দৃষ্টি কোণ দিয়ে

দেখে, তাদের ভরে রাখতে হয় পাগলা গারদে !...মানবের সেই-ই পরম বন্ধু; যে বুকের রক্ত কালি করে—প্রত্যেক মানুষটি যাতে ফুলে-ফলে পূর্ণ বিকশিত হতে পায়।

"যাই ভাই নিমু, টিউসানইতে যাবার সময় হয়েছে ; ওই একটা মাত্র সম্বল—" বন্ধুর কাছ থেকে বিদায় প্রার্থনা করলে নরেন।

নিমাই অনিমেষ নেত্রে তাকিয়ে রইল বন্ধুর গতি পথের দিকে।

—সাত—

অপ্রত্যাশিত ভাবে একটা ভালো চাকরী নরেনের ভাগ্যে জুটে গিয়েছিল। তার পরে প্রায় আট মাস গত হ'য়ে গিয়েছে ;

বেলেঘাটা অঞ্চলে বড় রাস্তা থেকে একটা সরু গলি বেড়িয়ে গিয়েছে দক্ষিণ দিকে। গলির দু'ধারে ছোট বড় খান কয়েক বাড়ী কাটিয়ে গেলে বাঁ পাশের বাড়ীর সীমানা শেষ হ'য়ে গিয়ে একটা নাতিদীর্ঘ পার্ক পড়ে। পার্কের পূর্ব্ব পার্শ্বে কতকগুলো খাপ্‌রার বাড়ী। পশ্চিম দিকে একটা দ্বিতল লম্বা ধরণের বাড়ীর নির্ম্মাণ কার্য্য সবেমাত্র সুরু হ'য়েছে। গলিটা যেখানে শেষ হ'য়েছে—অর্থাৎ একদিকে পার্ক অন্য দিকে নূতন বাড়ীর কাঠাম—ঠিক তার মাথায় একখানা একতালা বাড়ী। বাড়ীর রঙটা লাল।

ঘুড়ী

বাড়ীটার খাঁজ কাটা দাগগুলো দেখলে মনে হয় যেন, গাঁথুনির প্রত্যেক ইঁটখানা জেগে আছে। কার্নিশের রঙ হল্‌দে। দরজায় জানলায় সবুজ রঙ মাখান। প্রবেশ পথের দু'পাশে দুটি ছোট ছোট ঘর।...ডান দিকের ঘরের মাঝেখানে একটা গোল টেবিল, কারু-কার্য্য খচিত ঢাক্‌না দিয়ে সেটা ঢাকা। তার চার পাশে অরামদায়ক বেত-নির্ম্মিত চেয়ার। উত্তর দিকে একটা ছোট সোফা; টেবিলের উপর কয়েকটা বিয়ারের বোতল—বেক্স আশাহি আল্‌সাফ্। একটা হোয়াইট হর্সের বোতল। তার মধ্যে সোডা ওয়াটারের বোতলও স্থান করে নিয়েছে। টেবিলের 'পর একটা বড় চীনে-মাটির ডিশে বাদাম-চানা ভাজা। গ্লোড ফ্লেক্, ক্যাপ্‌স্টেন। এ্যাস্ ট্রে তো আছেই।

অপর দিকের ঘরের মেঝেয় একখানা গালিচা পাতা। তারই উপর—পূব ও পশ্চিমদিকে দুটি করে চারটী সোফা। দক্ষিণ দিকে দেওয়াল গোড়ায় একটা টেবিলের 'পর একটা বক্স গ্রামোফন; তার উভয় পার্শ্বে টিপয়ের 'পর রেকর্ড-কেশ।

এক সঙ্গে কয়েকজন ফতো-বাবু সাজে-সজ্জিত-বাবু হুড়-মুড় করে প্রবেশ করলেন, পাশের ঘরটিতে। একটা স্যুট্ পরিহিত বাবু সোফাটায় ধপাস্ করে বসে পড়ে মাতাল সুলভ ভঙ্গীতে ডাকল,—"বাঃ-ই—"

"কৈ হে, মাইস্তার ঘোষ—"

"নরেন বাবু—"

"ওরে— নরেন—"

"কৈ রে কেলো—তোর বাবু কৈরে ?" হাত কাটা জামা--প্যাণ্ট-পড়া এক ছোক্‌রা ঘরে আসতেই তাকে উদ্দেশ করে কে যেন বললে।

"ঢাল ঢাল ; আর দেরী করিসনি—"

' ও যা উজবুক-মার্কা তাতে সব মাটী করে ফেলবে দেখচি ; মিস্টার রে, বরং তুমি ঠিক কর—"

"আরে একটু আধটু অসুবিধে তো হ'বেই ; একি পেরিস কেফ্ পেয়েচ ?····বাস্তবিক সেখানকারে বয়দের সার্ভ দেখলে অবাক হ'য়ে যেতে হয়—"

"আরে লে : তবু তো তুই কস্‌মোপলিটান্ গিরলে যাসনি ; গেলে চক্ষু চরক গাছ হ'য়ে যেত—"

"চেলাও—বাবা, পেগ্ পেগ্—" সোফার বাবুটি মদ্য পান না করেই মাতলামি করতে লাগলেন।

ঘরে আসলেন এক ঢিলে পাজামা ও কলার-তোলা-গেঞ্জি পরিহিত বাবু ; মাথার চুল ব্যাক্ ব্রাশ করা এবং সহেবী ছাঁটে ছাঁটা।

"ওরে নরেন—আয় আয় ; এসে পাশে বস, প্রাণটা জুরুক আমার।···তুই না হ'লে আর বন্ধু—" সোফার বাবুটি উৎফুল্লিত হ'য়ে আহ্বান করলেন নরেনকে।

হাঁসের ডিমের ভেতর থেকে ঘোড়ার বাচ্চা বেরুলে বোধ হয় লোকে ততটা আশ্চর্য্য হ'বে না, যতটা হ'বে তৈলহীন এক মাথা চুল, ছিন্ন মলিন বসন, কেড্‌সের চটির ভিতর থেকে আজকের এই

সাদা ধপ্ ধপে পা-জামা-কালার-তোলা গেঞ্জি ভেলভেটের-চটি পরিহিত নরেনকে দেখলে! সে দেখেই আশ্চর্য্য হ'য়ে অস্ফুট স্বরে বলবে, এই পরিবর্ত্তন ? এত অল্প সময়ের মধ্যে! ···নরেন যেন আর সে নরেন নেই; তার হাব ভাব চাল-চলন কথাবার্ত্তা, আচার-ব্যবহার, ভড়ং সব পাল্টে অন্য ছাঁচে ঢালা আলাদা একটা মানুষ! 'আর যে পারি না ভাই নিমাই; জীবনটা নিয়ে যেন ধিক্ ধিক্ হ'য়ে গিয়েছি—' এই কথাগুলি সেদিনেও—কাণে হয় তো এখনও বাজছে নিমাইয়ের—বলেছে, সে আজ খাচ্ছে গ্লাস ধরে মাদক দ্রব্য!

"মিষ্টার ঘোষ—" এক বাবু বুক চাপড়ে বললেন,—"আমি বলছি, আপনার ম্যারেজ-লাইফ হ্যাপী হ'বে—"

কিছুক্ষণের মধ্যে ঘর ভরপুর হ'য়ে উঠলো বিয়ার, হুইস্কির গন্ধ ও সিগারেটের ধোঁয়ায়।···হুইস্কির সঙ্গে সোডা মিশিয়ে এক গ্লাস দিতে গেলেন নরেনকে এক বাবু।

"না, না, রায় বাবু—আমি হুইস্কি খাব না, মুখে গন্ধ বেরুবে। বিয়ার খাই, তাতে বিশেষ যায় আসে না; কিন্তু হুইস্কির গন্ধ আমার মুখ থেকে পেলে নিমাই মনে কিছু করতে পারে। সে এক্ষুণি এসে পড়বে—" সভয়ে জানালার ভেতর দিয়ে বাইরের দিকে তাকাতে তাকাতে বললে নরেন।

"আরে তবে সে কিসের বন্ধু; যদি সে চোখ কাণ বুজে সহ্য না করে, বন্ধু যা' করবে তাই—" এক বাবু উপদেশ দিলেন।

ইতিমধ্যে অপর পাশের ঘরে গ্রামফোনে রেকর্ড দিয়েছে এক বাবু গিয়ে।... এ ঘরের পর্ব্ব শেষ করে সবাই ওঘরে গেল।

"হো হো, কেয়া বাত কেয়া বাত—" বলে এক বাবু ঘাড় গুঁজে হাত দুটো উপরে তুলে তালি বাজাতে বাজাতে নাচতে লাগলেন।... অন্যান্য বাবুরা সোফায় বসে ঢলাঢলি করছে। কেউ হাততালি দিয়ে মাথা দোলাতে দোলাতে শিস্ দিচ্ছে, কেউ বা দিচ্ছে পায়ের টোক্কা। নরেনও মুখের পাশে একটা সিগারেট চেপে ধরে হাত তালি দিয়ে কনসার্টের তালে তালে নাচছে।

"আয়, আয় নিমাই—" নিমাই এসে দেখা দিতেই নরেন ছুটে গিয়ে তার হাত দুটো ধরে ঘরে নিয়ে এলো: "এই যে, এই ভদ্রলোকের ছোট বোন—" একটী সুদর্শন যুবককে নরেন দেখালে নিমাইকে, তার ভাবী স্ত্রীটি কি রকম হ'বে তা' এই তার ভাইকে দেখে অনুমান করে নাও - এই হচ্ছে নরেনের বলার উদ্দেশ্য। "ওরে কেলো, তোর সান্ন্যাল বাবু এসেছে, চা-খাবার রেডি কর—" নরেন চীৎকার করে তার চাকরকে হুকুম করলে।

সকলের অগোচরে নিমাই ঈষৎ নাসিকা কুঞ্চিত করে একটা সোফার একধারে বসে পড়ল নীরবে। এই অনভ্যস্ত আবহাওয়ার মধ্যে এসে সে বেস একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল।

"হেঁঃ হেঁঃ দাদা, 'আমাদের এই আমিষের মধ্যে আপনার মতো বৈষ্ণবের—" কথাটা শেষ করতে পারলে না ভদ্দর লোক, তাঁর মদের মাত্রাটা একটু বেশী হয়ে গিয়েছিল, মদের

মাতলামির সঙ্গে ন্যাকামি মিলিয়ে বললে,—"মানে, মনে টনে কিছু করবেন না, এই আর কি ?"

নিমাই পূর্ব্বেও যেমন কিছু বলেনি এখনও নীরবে—মাত্র ক্ষণিকের জন্য চোখটা তুলে আড়-ভাবে ভদ্দর লোককে দেখে নিয়ে— ঘাড় গুঁজে বসে'রইল।

"মিস্টার সন্ন্যালের নামের সঙ্গে রুচিটার বেশ সামঞ্জস্য আছে— না কি বলিস নরেন ?" এক বাবু শ্লেষের স্বরে বললে।

কিন্তু নরেন নিমাইকে জানে। তাই তার মদ্যপায়ী বন্ধুদের সঙ্গে নিমাই-এর বন্ধুত্বটা খাপ খাওয়াবার আপ্রাণ চেষ্টা তাকে করে তুলেছিল হাসির বস্তু। এরূপ ক্ষেত্রে সাধারণতঃ যা' হয় নরেনেরও তাই হল, অর্থাৎ সে আরম্ভ করলে বাচালামি।

আসর ভেঙ্গে গেল।

"গুড্ নাইট—"

"বায়, বায়—"

"তবে আসি দাদা—"

সকলে চলে গেলে নরেনের অবস্থাটা হ'ল সঙ্গীন। সে একবার করে অপাঙ্গে নিমাইয়ের দিকে তাকায় আর ভেতরে ভেতরে ছোট হয়ে যায়। সে নিজেকে বড় অবলম্বনহীন বলে মনে করতে লাগল।

"তা' হ'লে নরেন বাবুর বিয়েটা হ'চ্ছে কবে ?" ঘরের অস্বস্তিকর নীরবতা ভাঙ্গল নিমাই তার বিদ্রুপ মেশান প্রশ্নে।

নরেন চমকে উঠে হড় বড় করে বলতে লাগল,—"এই বুঝলি কিনা, বিয়েটা যখন হ'চ্ছেই আর সবাই যখন ধরলে তাই দিলাম একটা পার্টি। বেশী খরচ হয়নি টাকা চল্লিশেক,—" এমন ভাবে বললে, যেন নিমাই কৈফিয়ৎ তলব করেছিল।

"বেশ করেছ। তা বিয়েটা হ'চ্ছে কবে?" নিমাই বন্ধুকে উৎসাহিত করে পূর্ব্ব কথার পুনরুক্তি করলে।

"এই, এই—প্রায় মাস দেড়েক আছে আর—" হাতে হাত ঘসতে ঘসতে বললে নরেন।

"ভালো!" বলে নিমাই সহাস্যে হাত দুটো উপরে তুলে আঙ্গুল মটকাতে মটকাতে আড়ামোড়া ভাঙ্গতে লাগল।

আরও কিছুক্ষণ নীরবে কাটবার পর নিমাই উঠে দাঁড়াল। "আচ্ছা, চল্লাম তা' হ'লে আজ—" বলে নিমাই বেড়িয়ে গেল।

নরেনের ভেতরে এমন একটা দ্বন্দ্ব চলছিল যার জন্য সে ভুলে গেল নিমাইয়ের সঙ্গে কিছু দূর যেতে।

—আট—

ঠিক তিন সপ্তাহ পরে।

শনিবার। সন্ধ্যা হতে তখনও প্রায় ঘণ্টা খানেক দেরী আছে। নরেন বাইরের ঘরে একটা আরাম চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে

অস্বস্তিকর ভাবে মাথাটা এ-পাশ ও-পাশ নাড়াচ্ছে। হাত দুটো কোনোটা একবার কপালে রাখছে, কোনোটা চেয়ারের হাতলে অবশ ভাবে দিচ্ছে রেখে। আবার হয় তো দুটো হাতই ছুড়ে দিচ্ছে চেয়ারের উপরে—মাথার দিকে। পা দু'টো ঘষছে মাঝে মাঝে মেঝেতে। ঘন ঘন দীর্ঘ নিঃশ্বাস তো পড়ছেই।

"ওরে কেলো—হারামজাদা, আয় না এদিকে—" চীৎকার করে নরেন ডাকল তার চাকরকে।

কালীচরণ, ওয়ফে কেলো, সভয়ে এসে দাঁড়াল বাবুর সামনে।

"দিয়েছিলি ঠিক তো ?···তা' হ'লে এখনও এলো না কেনো ? শনিবার, ছুটী হ'য়েছে তার দেড়টার সময়—" বিরক্তিপূর্ণ ভাবে বললে নরেন।

"মেসের চাকরকে আমি গিয়ে বল্লাম যে, সান্নেল বাবু এলেই যেন দেয় চিঠিটা—" চাকর ভয়ে ভয়ে বললে।

"যা, যা, বেড়ো—আমার সামনে থেকে—" আবার নরেন পূর্ব্বের মতো নড়তে চড়তে লাগল।

নরেন হাত দিয়ে চোখ চেপে বসেছিল। ইতি মধ্যে নিমাই নিঃশব্দে এসে ঘরের চৌকাঠের উপর চুপ করে দাঁড়িয়েছে।

"কি হয়েছে—" নিমাই জিজ্ঞাসা করল শান্ত ভাবে নরেনের কাছে গিয়ে।

নরেন ত্বরিতে উঠে দাঁড়িয়ে নিমাইকে ধরল ঝাপটে। ধরে

কান্নার স্বরে বলতে লাগল,—"ওরে নিমাই, ভাই, বলা নেই কয়া নেই বড় বাবু সাহেবের ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে জবাব দিলে আমায়। আমার চাকরীটা গিয়েছে রে ভাই—"

নিমাই বিস্ময়ে ও দুঃখে হতবাক্ হ'য়ে গেল। পরে ধীরে ধীরে নরেনের বাহু পাস কাটিয়ে একটা চেয়ারে বসে পড়ল।····হাঁটুর 'পর কনুই দুটো রেখে দু'হাতের আঙ্গুলে আঙ্গুল সংযোগ করে তার 'পর থুত্‌নি রেখে নির্নিমেষ নেত্রে নিমাই তাকিয়ে রইল জানালার ভিতর দিয়ে বাইরের পার্কটার দিকে।

পার্কটায় ছেলে মেয়েগুলো খেলা করছে; নিমাই তাদের দিকে চেয়ে ভাবতে লাগল,—ওই হাসি খেলায় মগ্ন ছেলে মেয়েগুলো—যাদের আজ ব্যবসার মূলধন অশ্রু আর অভিমান—জানে না 'কাল' তাদের জন্য কত নিরাশা-ব্যর্থতা-জনিত আঘাত সঞ্চয় করে রেখেছে! 'কালের' কপাট খুলতে খুলতে যখন ওরা সামনের দিকে এগিয়ে যাবে, তখন কত নির্ম্মম আঘাতই না ওদের করতে হ'বে সহ্য!···· হেসে খেলে চলতে চলতে হঠাত যখন দুঃখের সাগরে নিমজ্জিত হবে, তখন তা' থেকে উদ্ধারের জন্য ওই রক্তমাংসের শরীরের ভেতর যে জিনিষটা আছে, সেটা কি অবর্ণনীয় আকুলি বিকুলিই না করবে!··· লোক চক্ষুর অন্তরালে যে 'কাল' বসে আছে তার মুখে হাসির ইন্ধন যোগাবে মানুষের ওই আকুলতা!····নিমাই নরেনের দিকে একবার তাকিয়ে আবার তার দৃষ্টিটা ধীরে ধীরে চালিয়ে দিলে আকাশের দিকে; দিয়ে সে ভাবল,—সর্ব্বনাশী 'কাল'-ই মানুষের কপাল নিয়ে

ছিনিমিনি খেলে; আর মানুষ সাড়াট্য জীবন জ্বলে পুড়ে মরে তপ্ত খোলায়-ছাড়া কৈ মাছের মতো!

"কি হ'বে নিমাই?" হতাশ ভাবে নরেন বললে।

"ভাবিসনি; চেষ্টা করতে থাক আবার হ'য়ে যাবে—" নিমাই সান্ত্বনার স্বরে বললে।

"তা' ত ভাবব না; কিন্তু লজ্জায় মুখ দেখাব কি করে?··· এদিকে যে সব ঠিক ঠাক—" বিরক্তির সুর গলায় টেনে এনে নরেন বললে: চেয়ে রইল সে নিমাইয়ের মুখের দিকে প্রশ্নের প্রত্যাশায়।

অসহিষ্ণু ও অব্যবস্থিতচিত্ত লোকের স্বভাবে যতগুলো দোষ থাকে, তার মধ্যে একটা হ'চ্ছে তাদের ভেতরে যা'ই থাক উপরের ঠাটটা বজায় রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে। এ ক্ষেত্রে নরেনেরও হ'য়েছে তাই; সে মিথ্যার রঙে রাঙিয়ে নিজেকে লোক চোখে দেখিয়েছে বড় করে। সেই মিথ্যার ঠাট ভেঙে চুড়মার হ'য়ে গেলে ওর স্বরূপটি যাবে প্রকাশ হ'য়ে। সেইজন্যই নরেন লজ্জার ভয়ে সন্ত্রস্ত।

কিছুক্ষণ ধরে নরেনের আসন্ন বিবাহের কথা চল্ল। কি ভাবে টাকাকড়ি খরচ করে সে আজ অর্থের টানাটানিতে পড়ে গিয়েছে, তাও বললে সে। সব কথা শুনে নিমাই পরামর্শ দিলে,—কন্যার বাবাকে সত্য ঘটনা জানিয়ে সাফ জবাব দেওয়া। কেননা যেখানে নরেনের বিবাহের সম্বন্ধ হ'য়েছিল, তাদের অবস্থার সঙ্গে নরেনের উপস্থিত অবস্থার খাপ খাবে না। নিমাই আরও বললে যে, তার

পরামর্শ মতো কাজ করলে সে অনেক অবাঞ্ছিত ঘটনা থেকে রেহাই পাবে।

"কিন্তু গয়ণাগুলো গড়িয়েছি ?....সেগুলো কি হ'বে ?" এমন ছেলেমানুষের মতো নরেন বললে, যেন গয়ণাগুলো ময়রার দোকানের পচাই মাল, বেশী দিন থাকলে পচে যাবে, সেইজন্য তাড়াতাড়ি একটা বিয়ে করে সেগুলো কনের গায়ে চড়িয়ে দেওয়া আশু প্রয়োজন!

"জলে ফেলে দে—" বলে নিমাই মুখ টিপে টিপে হাসতে লাগল।

"না না নিমু, তুই ঠাট্টা করিস্‌নি। আমার অবস্থাটা বোঝ; বুঝে যা হয় একটা ব্যবস্থা কর—" নিমাইয়ের হাত ধরে অসহিষ্ণু ভাবে বললে নরেন। সে মুখ ফুটে বলতে না পারলেও নিমাইয়ের বুঝতে বাকী রইল না যে, আপাতত: তার বিয়ে করাটা প্রয়োজন হ'য়ে পড়েছে খুব বেশী।

"দেখব চেষ্টা করে—" বলে নিমাই উঠে পড়ে সহাস্যে একটা আড়ামোড়া ভাঙ্গল,—"চললাম আজ—" নিমাই যেতে উদ্যত হ'তেই নরেনও তার সঙ্গ নিয়ে ঘর থেকে বেড়িয়ে গেল।

—নয়—

নরেনের চাকরীটা গিয়েছিল বোধ হয় গরীবের একটী মেয়ে উদ্ধারের জন্যই।

নিমাইয়ের অধীনস্থ আটাশ টাকা বেতনের এক কেরাণী সহকর্ম্মী জানতে পেরে নিমাইয়ের হাত ধরে বসে যে, তাকে ভগ্নিদায় থেকে উদ্ধার করিয়ে দিতে হ'বে তার বন্ধু নরেনকে দিয়ে। নরেনেরও সেই সময় বিয়ের-ভূত ঘাড়ে না চাপলে শুধু ফুলের মালা দিয়ে বিয়েটা করতে রাজী হ'ত কিনা সন্দেহ। যাই হোক্, নরেন বন্ধুর উপরোধ রেখে তার সহকর্ম্মীকে ভগ্নিদায় থেকে উদ্ধার করে।

মেয়েটির নাম অমলা। নামের সঙ্গে তার গায়ের রঙের সামাঞ্জস্য নেই; কিন্তু মনের সঙ্গে আছে। কৃশ তনু। যদিও তার গায়ের রংটা ময়লা, তবু নয়নকে মুগ্ধ না করলেও আরাম দেয় চোখ খুলে দেখলে পর।····দারিদ্র্যের ছাপ এখনও তার সর্ব্বাঙ্গে লেগে আছে, তা' দেখলে আওতায়-বর্দ্ধিত বন-লতাকেই মনে করিয়ে দেয়।·· নম্র-স্বভাব ও বুদ্ধিমতী। স্বামীর তুষ্টি বিধানে সদাই সজাগ। কি জানি, পাছে কোনো অপরাধ বা ত্রুটি হয়—এই ভয়ে।

বাইরের ঘরে নরেন ইজি-চেয়ারে বসেছিল। অমলা ধীরে ধীরে

গিয়ে চেয়ারের হাতলে বসল : "কৈ, নিমাই বাবু তো এখনও এলেন না ?" স্বামীকে প্রশ্ন করলে অমালা।

"আমি আপিস থেকে বেরুবার সময়ই ফোন করেছি ; সে বলেছে যে আপিস থেকে বেড়িয়েই মেসে না গিয়ে একেবারে আমাদের এখানে আসবে—" নরেন অমালার একটা হাত লুফতে লুফতে বললে : "সে আবার যে কাজ-পেয়ালা ; নিজের কাজ শেষ করে বড় বাবুকে সাহায্য করে। বড় বাবু বেচারা বুড়ো মানুষ ; যতটুকু তাঁর কষ্টের লাঘব করতে পারে—এই তার উদ্দেশ্য। সেই সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ দু'জনে বেরুবে ; বড় বাবু নিজের গাড়ীতে নিমাইকে নিয়ে তার মেসের সামনে নামিয়ে দিয়ে তবে তিনি বাড়ী যাবেন – সেই বেলগাছিয়ায়।....খুব ভালোবাসে নিমাইকে, শুধু ওর গুণের জন্য। আর একটা কারণ—" নরেন গলার স্বর পালটিয়ে সহাস্যে বললে,—"ওখানে ওর চাকরী হয়েছে শুধু 'নিমাই' নামটার জন্যই নাকি। চাকরীটার জন্য যখন দরখাস্ত পড়েছিল, তখন এই নামটা দেখেই নিমাইকে ডেকে পাঠিয়েছিল।.... বুড়ো বৈষ্ণব ভক্ত কিনা—"

স্বামী স্ত্রীতে গল্প করছে, এমন সময় নিমাই এসে হাজির হ'ল। আসতে দেরী হওয়ার জন্যে নিমাই প্রথমে কৈফিয়ৎ দিলে।

অমলা ঘর থেকে বেড়িয়ে গিয়ে কালীচরণের মারফৎ চা খাবার সমস্ত পাঠিয়ে দিয়ে অবশেষে নিজে এসে হাজির হ'ল। চা পান সমাপন্তে গল্প চলতে লাগল।

"নিমু, অমলার তা' হ'লে পয় আছে কি বলিস্?" সহাস্য বদনে নরেন কথা কয়টি বলে নিমাইয়ের প্রতি তাকিয়ে রইল জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে।

নিমাই এ-প্রশ্নের কোনো জবাব না দিয়ে চাপা হাসি মুখে রেখে অমলার প্রতি তাকাতেই অমলা লজ্জায় ধীরে ধীরে মাথা নত করল।

"যেচে ডাকতে হ'ল শেষ কালে—" নরেন আত্মশ্লাঘায় কোনো দিনই পরাঙ্মুখ নয়!......"আমার মতো কানিং ফেল্যা পাবে কোথায়—" বলে নরেন অমলার দিকে তাকাল; সে-দৃষ্টিটা নিমাইয়ের মুখের উপর দিয়েও বুলিয়ে নিলে।

নরেনের বন্ধুত্বের সঙ্গে যে-জিনিষটা নিমাইকে বড়াবড়ই মরমান্তিক যন্ত্রণা দিয়ে এসেছে, সেটা হ'চ্ছে তার এই আত্মশ্লাঘা মনোবৃত্তিটা। সে ওই কথা বলার পর নিমাই তার প্রতি এক চোখ তাকিয়ে নিলে; পরে ধীরে ধীরে চোখ নামিয়ে নিয়ে ঘাড়টা ফেরাল বাইরের দিকে। নরেন সে-চোখের ভাষা বুঝতে পারল না। যদি পারত, তবে দেখতে পেত যে নিমাই ভেতরের সব খবরই জানে। বহু খোসামুদী উমেদারী করে, বিভাগীয় বড় কর্ত্তাকে ঘুষ কবুল করে তবে তার হৃত চাকরীটা পুনর্জ্জন করতে সমর্থ হয়েছে। নিমাই শুধু চোখে দেখে আর কাণে শুনে যায়। কেন না এই নরেন-শ্রেণীর আত্মশ্লাঘা ও অহং সর্ব্বস্ব মনোভাব সম্পন্ন লোকে সমাজ পরিপূর্ণ।

নিমাইয়ের সাক্ষাতে নরেন যে-সমস্ত বাহাদুরী জাহির করতে লাগল, তার প্রধান উদ্দেশ্য হ'চ্ছে, পরোক্ষ ভাবে অমলার কাছ থেকে বাহবা নেওয়া। যার প্রয়োজন নিতান্তই নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু যার যে স্বভাব তার মোহ শীঘ্র সে ত্যাগ করতে পারে না। অবশেষে নরেন অমলাকে এই বলে আশ্বাস দিলে : "তুমিই আমার লক্ষ্মী ; আমি প্রতিজ্ঞা করলাম—তোমাকে আমি কোনো দিনই অসুখী করব না ; প্রাণ গেলে ও না—"

স্বামীর এই অহেতুক উচ্ছ্বাসে, বিশেষ করে নিমাইয়ে উপস্থিতিতে, অমলার ভেতরে গৌরবে বুকটা হয়ত দরাজ হয়ে উঠেছিল ; কিন্তু বাহ্যত সে মধুকর-ভারে-ভারাক্রান্ত-মাধবী-লতার মতো লজ্জায় নুয়ে পড়ল।

নিমাই বিস্ফারিত নেত্রে একবার নরেনকে এমন ভাবে দেখে নিলে—যেন নরেনের এই প্রতিজ্ঞাটা সে মনে রাখবার জন্য দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হল।

"আমি যাই—" বলে সবিনয় দৃষ্টিতে নিমাইয়ের প্রতি একবার তাকিয়ে অমলা ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেড়িয়ে গেল।

নরেন চেয়ারটায় হেলান দিয়ে চুরুট টানতে লাগল। সে ঘন ঘন চুরুটে টান দিচ্ছে, আর ধোঁয়াগুলো ছুড়ছে ওপর দিকে। নিমাই বসে বসে বিনা প্রয়োজনেই টেলিফোন গাইডটার পাতা উল্‌টাতে লাগল।···গাইডটা বহুদিনকার ; ওটা নরেন সংগ্রহ করে রেখেছিল, পূর্ব্বে যখন সে ছিল একটা বেকার ; ও থেকে ঠিকানা

দেখে দেখে বড় বড় লোকের দ্বারে দ্বারে সকাল সন্ধ্যায় ঘুরতো, একটা চাকরীর জন্যে।

"অপনাকে একটা কথা জিগ্যেস করতে পারি কি?" বাইরে জানালার গরাদ ধরে এক ভদ্রলোক নরেনকে উদ্দেশ করে বললেন।

নরেনের নির্দ্দেশ মতো ভদ্রলোকটি ঘরে এসে বসলেন।... আধুনিক বাঙ্গালী সমাজের প্রাপ্ত বয়স্ক যুবক; অভাবের তাড়নায় পিঠের শিরদাঁড়াটা বেঁকে গিয়েছে সামনের দিকে; মাথায় টাক পড়তে সবেমাত্র সুরু হয়েছে; চোখের চার পাশে কালি পড়ে ভেতরে গিয়েছে ঢুকে; গাল দুটো টোল পড়া; দাড়ি গোঁফ খুব অল্প—তবে মাকুন্দ নয়। পরনে সাবানে-কাচা ধূতি পঞ্জাবী; পাঞ্জাবীর হাত দুটো অশোভন ভাবে খাটো, কাপড় জামা কেচে নীল দেবার সময় নীলগুলো ভালো করে গলেনি, তাই পাঞ্জাবী ও ধূতিটার স্থানে স্থানে ফুট্‌কি ফুট্‌কি ছোপ পড়ে আছে।

"বলছিলাম কি, অপনার বাড়ীর পূব-পাশের বাড়ীটায় টু-লেট লেখা রয়েছে, আমি এসেছিলাম ওই খোঁজে; কিন্তু কেউ নেই—" ভদ্রলোক কথাটা শেষ করবার আগে একটু ইতস্ততঃ করতে লাগলেন; যেন তিনি যে-কথাটা জানতে চান নরেনের কাছ থেকে, সে-সংবাদটা নরেন রাখবে, এটা একটা স্পর্দ্ধা ও অভদ্রজনোচিত প্রশ্ন। ভদ্রলোকটিকে আরো সঙ্কুচিত করে তুলেছিল—ঘরের আসবাব পত্র ও নরেনের বড়লোকী-চালে চেয়ারে হেলান দিয়ে

চুরুট টানাটা।·····“তা’ই আপনাকে বলছিলাম—” বাধিত স্বরে কথাটা শেষ করলেন: “বাড়ীটার ভাড়া কত জানেন? মানে, চাকর বাকরের কাছে শুনে থাকতে পারেন আর কি—”

একজনের অহেতুক হীনতা বোধই অপরকে বাড়িয়ে তোলে। নরেন ভদ্রলোকের এই হীনতাবোধের সুযোগ নিয়ে অবজ্ঞাভরে একবার আঁপাদমস্তক দেখে নিলে তাঁকে। পরে উত্তর দিলে: “আপনি নিতে পারবেন? ও-বাড়ীর ভাড়া চল্লিশ টাকা—” বলে তাকিয়ে রইল ভদ্রলোকের প্রতি।

নরেনের বাঁ হাতের কনুইটা তার উরুর ’পর, ওই হাতেরই তর্জ্জনী ও মধ্যমার মাঝখানে চুরুটটা ধরা আর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ’পর গালের ভারটা রেখে ঘন ঘন মুখের এক পাশ দিয়ে চুরুটটা টানছে; ধোঁয়াটা নির্গত করে দিচ্ছে আবার পাশ দিয়ে। ধোঁয়া লাগাতে মাঝে মাঝে চোখ দুটো অর্দ্ধ নিমিলিত করছে।

নিমাই নীরবে বসে দেখছিল লোকের প্রতি তার বন্ধুর ব্যবহার; মনে মনে সে নিজেকে ধিক্কারও দিচ্ছিল। কেন—তা’ যদি কেউ তাকে সে সময়ে দেখত, ধরতে পারত না। কারণ সহিষ্ণু লোকের একটা লক্ষণ হ’চ্ছে, তাদের মুখের ভাব সকল অবস্থাতেই সমান।

ভদ্রলোকটির সঙ্গে নরেন বাড়ীটির ভাড়া ও অন্যান্য বিষয়ে কিছুক্ষণ আলাপ করল। “কি করেন আপনি?” অবশেষে প্রশ্ন করলে নরেন।

“একটা কেমিক্যাল কোম্পানীর সেলস্‌ম্যানই করি—”

"সেলস্‌ম্যানই—!" বলে নরেন উপেক্ষা ভরে ভ্রূ-দুটো উপরে তুলল: "খুব ঝুরি ঝুরি মিথ্যে কথা বলতে হয় তো—?" কি জানি কিসে স্পর্দ্ধিত নরেন অম্লান বদনে প্রশ্ন করল!

ভদ্রলোক একটু অপ্রস্তুত হ'য়ে গেল; কিন্তু তিনি উত্তর দিলেন—"হ্যাঁ, তা হয় বই কি—" বলে চোখ দুটো নরেনের মুখের উপর তুলেই নামিয়ে নিয়ে হাতে হাত ঘষতে লাগল।

"কি আর করবেন; গণিকাদের উপদংশ ব্যাধির অসহ্য যন্ত্রনা চেপে রেখেও মুখে হাসি টেনে আনতে হয়—" কথাগুলো নরেন বললে ভদ্রলোকের মুখের উপর!···যে সমস্ত লোক ধরাকে মৃত-পাত্র বলে মনে করে তারা কারণ অকারণে লোকের মনে ব্যথা দিয়ে কথা বলতেই ভালোবাসে—তার ফলাফল যাই হোক!

"চললাম নরেন—"বলে আর পিছুদিকে না চেয়ে নিমাই ঘর থেকে বেড়িয়ে গেল।

এটা একটা সাধারণ অভিজ্ঞতা মানুষ নিজে যা' করে বা বলে সে সব সময়ই মনে করে যে সে ঠিকই করছে বা বলছে। সহস্র জনে শত সহস্র বার বলে দিলেও সে শোধরাবে না। কারণ, মানুষের প্রকৃতিগত প্রবল প্রবৃত্তি হ'চ্ছে সব ক্ষেত্রেই স্বীয় প্রাধন্য জাহির করা।···দেখলে পরে দেখা যায়,—কতকগুলো লোক যখন এক জায়গায় বসে আড্ডা জমায়, তখন একজন সারগর্ভ বক্তৃতা দিলেও অপর জনে কখনই কাণ পেতে শোনে না; সে মনে মনে পাঁয়তারা ভাঁজতে থাকে তার পাণ্ডিত্য জাহির করবার জন্য। যে-

ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম দেখা যায়, সেখানে বুঝতে হ'বে হয় বক্তার উপর শ্রোতার ভয় ভক্তি বা ওই রকম কোনা কিছু একটা জিনিষ তার গলা টিপে ধরে আছে; নয় তো সে দেখে শুনে যে পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করেছিল তার পুঁজি গিয়েছে ফুরিয়ে—ভাব আর ভাষায় প্রকাশ করতে পারছে না।···কিন্তু সে মনে প্রাণে নিজের পরাজয় স্বীকার করে, বক্তার প্রাধন্য স্বীকার কখনই করে না।—এটা যদি শিক্ষিত সমাজে হয়, তবে শ্রোতারা বক্তাকে অপমান করবার জন্য স্থান ত্যাগ করে; আর যদি বস্তির বিড়ি-ওয়ালাদের সমাজ হয়, তবে যে বাক্ যুদ্ধে হেরে যায় সে হয় যুগপৎ নিষ্ঠিবন ত্যাগ সহকারে বু-বু শব্দ করতে থাকে, কিম্বা ভো ভো শব্দ করতে করতে উন্মত্তের মতো নাচতে সুরু করে দেয়·······

এ অভিজ্ঞতা নিমাইয়ের ছিল বলে সে কোনো দিন—শুধু নরেনকে কেন—কাউকেই পরামর্শ দিয়ে তার স্বভাব শোধবার চেষ্টা করেনি। চেষ্টা করাটা সে প্রয়োজন বোধ করেনি এই জন্য যে, প্রত্যেক মানুষের নিজের কাজ বা কথার জন্য তার নিজেরই ভেতর থেকে কৈফিয়ত তলব না এলে—তার চরিত্র সংশোধন কোনো দিনই হয় না।

নিমাই চলে যাবার পর কালীচরণ এসে নরেনকে জানাল যে, ভিতরে তার মা, অর্থাৎ অমলা ডাকছে; নরেন তৎক্ষণাৎ ভদ্রলোককে বিদায় দিয়ে বড়ীর ভিতর চলে গেল।

—দশ—

বড় বাবুর পরামর্শ অনুসারে সাহেব নিমাইকে বালিগঞ্জের এক পারটি কাছে পাঠিয়েছিল।

খুব বড় রকম একটা ডিপার্টমেণ্টাল ষ্টোরস্। ভিতরে ঢুকেই তিনদিকে পূর্ব্ব উত্তর পশ্চিমে—বড় বড় আধুনিক ধরনের আলমারী, উত্তর দিকের এক কোণের উভয় পার্শ্বের আলমারীর অবসরে যে স্থানটুকু আছে সেখানে একটা পর্দ্দা টানানো; সেটি ঠেলে ভেতরে যেতে হয়। ভেতরে ম্যানেজারের বসবার ঘর।

নিমাই ভেতরে ম্যানেজারের সঙ্গে বহুক্ষণ ধরে তার ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয়ে আলাপ করছিল এমন সময় সে পরিচিত গলার আওয়াজ পেতেই কাণ ঠার করে শুনতে লাগল।

সে হচ্ছে নরেন, বাইরে ছোট বাবুর সঙ্গে এক তরফা অনর্গল বকে যাচ্ছে, কি বিষয় নিয়ে, নিমাই ঠিক ভাবে অনুমান করতে পারল না।

"ওই মশাই এক আনাড়ী সেলস্‌ম্যানের পাল্লায় পড়ে আমাদের জান হায়রান হোয়ে গেল; বলছি ওঁদের মাল আমরা চালাতে পারবো না তবু শুনবে না—" নিমাইয়ের কাণ খাড়া করে থাকার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে কথাগুলি বললেন ম্যানেজর বাবু।

নিমাই ম্যানেজার বাবুর প্রতি অন্যমস্ক ভাবে চেয়ে রইল।

পরে নিম্ন ওষ্ঠের এক পাশ দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে কি যেন চিন্তা করতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে অস্ফুট স্বরে সে উচ্চারণ করল,—'হোতে বাধ্য—'

"কার চাকরী থাকবে না থাকবে সে সব দেখতে গেলে কি আমাদের চলে? রোজ একবার করে এসে বলবে 'অন্ততঃ এক পেটী মালেরও আর্ডর দিন'—বলুন তো মশাই, যে-মাল চালাতে পারবো না, তা' আমি ঘরে পচবার জন্য পুরে রাখবো?" বলে ম্যানেজার নিমাইয়ের মুখের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

"ওই-ভদ্রলোকটি আপনাদের কাছে কদ্দিন ধরে আসছে?" নিমাই জানতে চাইলে।

"তা' আজ প্রায় সপ্তাখানেক ধরে।···একেবারে আনাড়ী, সেলস্ম্যন-ই লাইনের কিচ্ছু জানে না—" অবজ্ঞা ভরে ম্যানেজার বললেন।

"হুঁ—" বলে গালে হাত দিয়ে কিছুক্ষণ ধরে চুপ করে বসে রইল নিমাই।

নিমাইয়ের কাজ শেষ হ'তেই বেড়িয়ে এলো। তার কিছু আগেই নরেন চলে গিয়েছে। অনতি দূরে একটা গাছ তলায় দাঁড়িয়ে ট্রামের জন্য অপেক্ষা করছে, এমন সময় তার কাঁধ কে স্পর্শ করলে। নিমাই ধীরে ধীরে ঘাড়টা ফিরিয়ে দেখলে নরেন তার কাঁধে হাত দিয়ে পিছনে দাঁড়িয়ে মৃদু মৃদু হাসছে।

"এমন সময় তুই যে এখানে ?" নরেন প্রশ্ন করে নিমাইয়ের সামনে এসে দাঁড়াল।

"তোরও তো এ সময়ে এখানে থাকবার কথা নয়—" নিমাই গম্ভীর ভাবে প্রশ্নটা করে নতমুখে দাঁড়িয়ে রইল।

নরেন বেশ একটু থতমত খেয়ে গেল। কারণ প্রশ্ন করবার পূর্ব্বে সে চিন্তা করে দেখেনি যে, যে-প্রশ্নটা সে নিমাইকে করেছে, সে-প্রশ্নটা তার প্রতিও প্রযোজ্য, নিজের জালে সে নিজেই জড়িয়ে পড়ল!

"এই, এই—"অর্ডার বুকগুলো ঘাঁটতে ঘাঁটতে বাধিত স্বরে উত্তর দেবার চেষ্টা করতে লাগল নরেন।

নিমাই তার অর্ডার বুকগুলোর প্রতি চেয়ে আছে—এটা লক্ষ্য করেই নরেনের মুখে কে যেন কালি ঢেলে দিলে। প্রথমে সে নিমাইকে দেখে বইগুলো লুকোবার চেষ্টা করেছিল; কিন্তু ধাপ্পার পাঁয়তারা ভাঁজতে ভাঁজতে সে-কথাটা গিয়েছিল একেবারেই ভুলে। সেই ভুলের সুযোগ নিয়ে বইগুলো যেন আপনা আপনি মাথা চাড়া দিয়ে উঠল, তাকে তার বন্ধুর সামনে হেয় করবার জন্যে।

"সেই স্কটিশ সাহেবটা বম্বের আপিস থেকে এসেছে আবার এখানে—" বলে নরেন নিমাইয়ের প্রতি এক চোখ চেয়ে নিলে। পরে দেঁতো হাঁসি হেঁসে বললে, "সাহেব বললেন, 'তুমি মিষ্টার ঘোষ, ক্যানিং ফেল্ল্যা আছো, প্রভিশন ডিপার্টমেণ্টে তোমাকে ট্রান্সফার করলাম, মারকেট ক্রিয়েট করবার জন্যে,—আমিও ছাড়বার পাত্র

নই; মোটা রকমের এ্যালাউন্স কবুল করিয়ে তবে ছেড়েছি—" বলে অপাঙ্গে নিমাইয়ের মুখের প্রতি তাকতে লাগল; কিন্তু নিমাইয়ের মুখ গম্ভীরতম।

নরেন জানে না যে, নিমাই দৈবক্রমে ভিতরের সত্যটা জেনে ফেলেছে।

মিথ্যাবাদীদের স্বরূপ যারা জানে, তারা তাদের চোখের চাহনী দিয়ে চেপে ধরে মজা দেখে। দেখে, সে লোকটা কেমন অনর্গল মিথ্যা বকে যায়। কাপড়ের এক কোণে আগুন লাগলে, তখন ঘুরপাক খেলে যেমন আগুন উত্তরোত্তর বেড়ে যায়, তেমনি মিথ্যা দিয়ে মিথ্যা ঢাকতে গেলে, বক্তাকে করে তোলে হাস্যাস্পদের ও ঘৃনার বস্তু।—নরেনের অবস্থাও করে তুলল নিমাই সেই রকম।

এস্‌প্লানেড্ গামী ট্রাম এসে পড়াতেই উভয়েই চেপে বসল পাশাপাশি; নিমাই কিন্তু পূর্ব্বের মতোই গম্ভীর।

নিমাই বসে বসে ভাবতে লাগল,—এই সে দিনে যে-লোক যে-কাজের জন্য একজনকে ঘৃণার চক্ষে দেখেছে, কার অলজ্ঘনীয় নির্দ্দেশক্রমে তাকেই আবার সেই কাজে নামতে হ'ল? গণিকা উপদংশ ব্যধির অসহনীয় জ্বালা চেপে রেখে যে জন্য মুখে হাসি টেনে আনে,—নিমাইয়ের প্রশ্ন করতে ইচ্ছা গেল,—নরেন কি তা' ছাড়া অন্য কিছুর জন্য কেরাণীর পদ থেকে এই ক্যানভাসারিতে নেমেছে?

এই ভাব মনে জাগতেই নিমাইয়ের মাথায় কতকগুলো দার্শনিক চিন্তা খেলে যেতে লাগল: মানুষের পরস্পরের প্রতি প্রীতি বিদ্বেষের

আশ্চর্য্যকর ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করলে,—অবশ্য এ জিনিষ তারাই লক্ষ্য করে, যারা এই মনুষ্য-জীবন সম্পর্কে খুব বেশী অনুসন্ধিৎসু—দেখা যায়, এক মানুষ অপরের সঙ্গে কি ভাবে অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত!····আজ একজন যেজন্য অপর জনকে ঘৃণা করল, ঠিক সেই জন্য তাকেও ঘৃণিত হ'তে হবে অদূর ভবিষ্যতে! কিন্তু সেটা তার দেখবার অবসর নেই, কেন না সে ঘটনা স্রোতের ওপর ভাসমান তৃণখণ্ডের মতো ভেসে চলেছে—ভাসাই তার স্বভাব, ধর্ম্ম। কারণ, সাধারণতঃ মানুষ মৃত; দেহে নয়, মনে। তার এই মৃত-মনই করে রেখেছে তাকে অসহায়।···সে চলেছে উদ্দাম গতিতে। সম্মুখে-পশ্চাতে, দক্ষিণে-বামে, ঊর্দ্ধে প্রতি পদক্ষেপে আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে। আঘাতকে সে আঘাত বলেই জানে, তাই, সে মূহুর্ত্তের জন্যও দাঁড়িয়ে পিছন ফিরে দেখে না তার কারণ।···· এই মৃত-মনই মানুষকে করে রেখেছে জীবন্মৃত, করুণার বস্তু!···· তাই, কালস্রোতে ভাসমান মানুষ 'কালের' কশাঘাতে সর্ব্বাঙ্গে কালশিটে পড়ে গেলেও জানতে পারে না তার কারণ।···তার মন যদি সজীব হ'ত,—তবে দেখতে পেত এক মানুষ অপর আর অকজনের সঙ্গে কি ভাবে অভিন্ন! তার পরে দেখত মানুষের সঙ্গে জীবের সম্পর্ক। এর পরে সে চেষ্টা করত আরও ভিতরে যাবার; সেখানে হাজির হ'লে দেখত জীব মাত্রেই জাগতিক সব কিছুর সঙ্গে অভিন্নভাবে জড়িত। আর তখনই সে দেখতে পেত সারা ব্রহ্মাণ্ডের মাঝে পৃথিবীর স্থান কতটুকু এবং তার মাঝে মানুষের!

মানুষ যদি জানত, নিমাই ভাবল,—সে এক উপেক্ষণীয়া-গ্রহের মাঝে অণুতম অণু, তবে সে সর্ব্বদাই সকাতরে সকলের কাছে বলত,—একটুখানি স্থান; মাথা ঢাকবার মতো একটুখানি স্থান দাও আমায়!····মানুষের মন সজীব না হ'লে,—সে আরও ভাবল, তাকে হ'তে হ'বে 'কালের' হাতের ক্রীড়া পুত্তলিকা। তার ইচ্ছায় সে হাত নাড়বে পা ছুড়বে। মাঝে মাঝে জীব দ্বারা চিবুক স্পর্শ করে সুধীজনকে ব্যাঙ্গ করবে; হাঁসবে কাঁদবে!

ট্রাম মাঠের ধারে এসে পড়তেই নিমাই ও নরেন দু' জনেই আর্ম্মি এ্যাণ্ড নেভি ষ্টোর্সের সামনে নেমে পড়ল।

"তুই কোথায় যাবি?" নরেন জিজ্ঞাসা করল নিমাইকে।

"আর্ম্মি নেভি ষ্টোর্সে—" নিমাই নরেনের দিকে না চেয়েই উত্তর দিলে।

—এগার—

প্রায় তিন বৎসর গত হতে চলেছে—নিমাইয়ের গোপাল রায়ের পরিবারের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হ'বার পর। প্রথম দু' একখানা চিঠি যাওয়া আসা করেছিল।····একদিন সে উত্তেজিত হ'য়ে রওনাও হ'য়ে গিয়েছিল সকলের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য। কিন্তু ট্রেণে বসে

তার যখন মনের মধ্যে উদিত হ'ল যে, সে কি উদ্দেশ্যে বিনা আহ্বানে যাচ্ছে ? সুধা দেবী যে তাকে পূর্ব্বের মতোই দেখবে তারই বা ঠিক কি ? কিম্বা যাওয়ার কারণটাই যদি জিজ্ঞাসা করে— তখন সে কি উত্তর দেবে ? এই রকম না না চিন্তা ট্রেণে বসে বসে করাতে সে মধ্য পথে ট্রেণ থেকে নেমে পরবর্ত্তী ট্রেণে পুনরায় ফিরে আসে কোলকাতায়। সে পরে রীতিমত নিজের কাছে নিজে লজ্জিত হয়েছিল এই হঠকারিতার জন্য।···কিন্তু বসুমতীর চিন্তা তাকে প্রায় সময়ই আচ্ছন্ন করে রাখত। পরে সে কোনোক্রমে জানতে পারে যে, গোপাল বাবু বদলী হওয়াতে মফঃস্বলের সে সহরটী ত্যাগ করে অন্যত্র চলে গিয়েছেন তাঁরা সবাই।

সেদিন বিকেল বেলায় নিমাই মনোহর পুকুরে বিশেষ একটা কাজে গিয়েছিল। কাজটা সেরে সে বেড়াতে বেড়াতে এসে হাজির হল সাদার্ন এভিনিউ-এ। একটু ক্লান্ত হ'য়ে পড়ায় সে পথের ধারে একটা বেঞ্চে বসে পড়ল।····তাকে তখন জিজ্ঞাসা করলে সে বলতে পারত'না, কেন জানি এলোমেলো চিন্তায় তাকে অভিভূত করে রেখে মনটা হয়েছিল একটু খারাপ। অন্যমনস্ক ভাবে সে বসে আছে; আর তার চোখের ওপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছে নানা রকম দৃশ্য। ট্রামগুলো যখন সাদার্ন এভিনিউ-এর মোড়ে আসছে, এবং পরে থেমে আবার ছেড়ে যাচ্ছে তখন শব্দ হচ্ছে একটা—গোঁ-গোঁ-গোঁ···

অত্যাধুনিক সাজে সজ্জিত তরুণীর দল মার্জ্জার-বিনিন্দিত পাদক্ষেপে লেক ভ্রমণে চলেছেন। নানান্ বেশী তরুণরা ঠোঁটের এক পাশে সিগারেট চেপে ধরে মঞ্চে অভিনয় করার মতো চলেছে হেঁটে। এ সমস্ত নিমাইয়ের চোখের ওপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছে বটে, কিন্তু সে আর তার এলোমেলো চিন্তা ছাড়া অন্য কোনো কিছুর প্রতি দৃষ্টি ও কর্ণপাত করবার মতো ক্ষমতা তার নেই।

নিমাই লক্ষ্য করেনি তার পাশে কিছুদূরে,—পশ্চিম দিক থেকে পুবদিক-গামী একটি যুবক, পরনে কোঁচান দেশী তাঁতের ধুতি, সামার কুল গেঞ্জির ওপর আদ্দির বড়ুয়া প্যাটার্ণের পাঞ্জাবী চোখে পাওয়ার-লেশ সেলুলয়েড ফ্রেমের চশমা, ঘড়ির চিক চিকে কালো কারগাছটা গলা হয়ে বুকে ঝুলছে, ঠেঁটের পাশে সিগারেট চাপা, ডান হাতে একগাছি সুন্দর ছরি—আসছে। তার মাত্র কয়েক পা পিছনে আসছে দু'টি তরুণী; তাদের সাজ-সজ্জা, প্রসাধন প্রভৃতি পারি-পার্শিকের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানে সমর্থ হয়েছে। তারা ক্রমশঃ নিমাইয়ের সম্মুখ দিয়ে ধীর পদবিক্ষেপে চলে গেল। সে তাদের একবার চোখ মেলে দেখলেও। নিমাইয়ের দৃষ্টিটা যন্ত্রবৎ তাদের পশ্চাতে গেল ঘুরে। তারা তখন প্রায় দশ বার গজ দূরে চলে গিয়েছে :

"বসু, বসু, ও বসু—" বলতে বলতে ত্বরিতে উঠে দাঁড়িয়ে এমন ভাবে তাদের দিকে এগিয়ে গেল নিমাই যেন সে বহুকাল ধরে স্থিরনিশ্চিত হ'য়ে বসে ছিল এইখানে যে, বসু এই পথ দিয়ে এক দিন না এক দিন যাবেই।

ইতি মধ্যে তারা তিন জনেই থমকে দাঁড়িয়েছে। নিমাই কাছে গিয়ে তাদের গাম্ভীর্য্য দেখে ভুলে গেল সে কি বলবে।

"এই—" তখনও নিমাই ঠিক করতে পারেনি যে সে কি জিজ্ঞাসা করবে, পরে বাধিত স্বরে এবং হাতে হাত ঘষতে ঘষতে শেষ করল কথাটা,—"এই—চিন্‌তে পার বসু আমাকে ?" তার মুখে এক অদ্ভুত ধরণের হাসি।

যাকে উদ্দেশ করে নিমাই বললে, সে প্রকৃতই গোপাল রায়ের মেয়ে বসুমতী।

বসুমতী নিমাইকে আপাদ মস্তক একবার দেখে নিয়ে তার বুকের 'পর দৃষ্টিটা রেখে গম্ভীর অথচ বিদ্রূপ মিশ্রিত স্বরে বলল,—"হ্যাঁ, তা' পারি ; কিন্তু আপনার ভদ্রতা জ্ঞানের মাত্রাটা একটু বেশী দেখছি যে—" বলে আর একবার নিমাইকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে গমনোদ্যত হয়ে বললে,—"আমার সঙ্গে যদি কোনো দরকার থাকে তো বাসায় যাবেন—" বলে তার সঙ্গীর হাতে একটা টান দিয়ে হাঁটতে সুরু করল।

নিমাইয়েরই ভুল হ'য়েছিল ; সে জানে না যে, এখন 'বসু' থেকে সে 'বসুমতী দেবী' হয়েছে।

অপমানে-লজ্জায়, দুঃখে-ঘৃণায় নিমাই প্রস্তর মুর্ত্তির মতো দাঁড়িয়ে রইল। তার মনে হ'ল যেন পৃথিবীর গতি বন্ধ হ'য়ে গিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ; কিম্বা হয় তো তার প্রাণটা তার দেহের মধ্যে নেই।...আকাশ-বাতাস, ঘর-বাড়ী, গাছ-পালা কাণ পেতে শুনে

এবং চোখ মেলে দেখে রাখল, এই অকপট ব্যবহারের প্রতি অপমান।

ওদিকে বসুমতী তার সঙ্গী যুবকটীর কাছে যেতেই তিনি নাক মুখ ঘৃণায় সিঁট্‌কে জিজ্ঞাসা করলেন,—"ও রাস্‌টিক্‌ ইডিয়টটা কে?"

বসুমতী এ-প্রশ্নের কোনো উত্তর দিলে না; নীরবে হাঁটতে লাগল।

নিমাই নতমুখে ততক্ষণ পর্য্যন্ত পূর্ব্বের মতো দাঁড়িয়ে রইল, যতক্ষণ না তার কানে এসে পৌঁছুল : কে যেন তার' কাণের কাছে মুখ এনে বলে গেল—

"কি দাদা, পথের মাঝেই প্রেমিকাকে ধরে টানাটানি করতে হয়—"

"আহা! দাদা আমার ব্যর্থ প্রেমিক—"

নিমাই চোখ তুলে দেখল তার চার পাশে তরুণ তরুণীরা মুখে রুমাল চাপা দিয়ে হাসছে আর বিদ্রূপ-বাণ ছাড়ছে।…সে অন্যত্র যাবার জন্য পা তুলতে গেল, কিন্তু তার মনে হল যেন তার পা দুটো মাটীতে কে পুঁতে দিয়েছে।…তার অবস্থা আরও শোচনীয় হ'ত; হয় তো বা সে সেইখানে মূর্চ্ছাই যেত, যদি ঠিক সেই সময়ে তার সামনে একটা ট্যাক্সি এসে না পরত। সে হাতটা তুলে—'এই রোক্‌খ' কথা দুটি বললে; কিন্তু তার মুখ থেকে পুরোপুরি উচ্চারিত হল না।।

ট্যাক্সি দাঁড়াতেই কোনো রকমে সে উপরে গিয়ে বসে হুকুম দিলে,—"সিধা চালাও, খুব জোরসে—"

ট্যাক্সি ছাড়তেই পিছন দিক থেকে কয়েকজনের সমবেত স্বরে একটা শব্দ এল,—'ধুউ—ও....'

মানুষের এরকম হয়। কোনো সময় লোকের মনের কোণে কেউ যদি ঠাঁই করে নেয়, আর তাকে দেখবার ইচ্ছাটা তার অবচেতন মনের মধ্যে চাপা থাকে, তবে তার স্বভাবকে ঠকিয়েও অভদ্রজনোচিত ভাবে লাফিয়ে বেড়িয়ে আসে—হঠাৎ সে, যার সাক্ষাৎ লাভের জন্য সে আকুল, যদি তার দৃষ্টি পথে পতিত হয়।... সেই সঙ্গে এ কথাটাও ঠিক যে, যে-কাজ যার স্বভাবের বাইরে, সে-কাজ যদি সে হঠাৎ উত্তেজনা বশতঃ করে ফেলে, তবে তার পরবর্ত্তী অবস্থা সত্যই বড় করুণ ও যন্ত্রণাদায়ক হয়। তখন তার লোমকূপের প্রতি ছিদ্র দিয়ে কে যেন সূঁচ বিঁধতে থাকে—আর তারই যন্ত্রণায় সে হয় অস্থির।

ট্যাক্সি কিছু দূর যায় আর সোফার জিজ্ঞাসা করে কোন দিকে। নিমাই সংক্ষেপে উত্তর দেয়—'সিধা'—

কপালের ঘাম মুছবার জন্য রুমাল বা'র করতে গিয়ে নিমাই দেখে জামা-কাপড় ঘামে এমন ভাবে ভিজে যে, নেংরালে তা' থেকে জল নির্গত হয়! কপালের ঘাম মুছে সে ভাবতে লাগল,—এই ঘটনা ঘটবার এক মূহূর্ত্ত আগে সে ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেনি যে, তার জন্য এত বড় একটা দুর্ঘটনা অপেক্ষা করে ছিল। কিন্তু, নিমাই জানে না বোধ হয়,—মানুষের জীবনে কোনো ঘটনাই আগে থেকে জানিয়ে দিয়ে ঘটে না; আর ঘটে না বলেই দুর্ঘটনা-জনিত-

আঘাতে মানুষের বুক ভেঙ্গে একেবারে চুড়মার করে দেয়।···মানুষ— সে এই ঘটনা থেকে শিক্ষা পেলে, যে মুহূর্ত্তে সে সুস্থ্য ও নিরাপদে আছে, ঠিক তার পর মুহূর্ত্তে যে কোনো মর্ম্মান্তিক দুর্ঘটনার জন্য যদি সে প্রস্তুত হয়ে থাকে তবে সে রেহাই পেতে পারে অনেক কিছুর হাত থেকে।

জীবনটা, নিমাই ভেবে চলল, যেন প্রাচীন কালের সাত মহল প্রাসাদের ভিতর দিয়ে আনাগোনা করা।...সিং-দরজার ছোট কপাট, চোর কুঠরী প্রভৃতি দেখে শুনে অতি সাবধানে যাতায়াত না করলে পায়ে টক্কর, মাথায় ঠোকা, পাশে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে হায়রান হতে হয়।

নিমাই চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে; ইতিমধ্যে আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড চৌরঙ্গী চিত্তরঞ্জন এভিনিউ শ্যামবাজর পেরিয়ে ট্যাক্সি ছুটে চলেছে।····দমদমের কাছে একটা মোড়ের মাথায় এসে সোফার যখন জিজ্ঞাসা করলে—"বাবু কোন দিকে—" নিমাই তখনও বলে, সিধা। কিন্তু সিধা পথ সেখানে নেই।

সোফারের তখন সন্দেহ হয়েছে যে, নিমাইয়ের মাথার ঠিক নেই বোধ হয়ঃ "কেয়া বাবু, আপ্‌কা মোকান কাঁহা, কুছ বোলতে নেই; সিধা সিধা করতা হ্যায়—" সোফার নিমাইয়ের দিকে ফিরে বললে।

সোফারের তীক্ষ্ণ স্বরে নিমাইয়ের চেতনা হল। সে চোখ রোগরে চারদিক চেয়ে আশ্চর্য্য হয়ে বলল,—"আরে, ই কাঁহা লে কর্ আয়া—"

সোফার একথা শুনেই গাড়ী থেকে নেমে পড়েছে; পরে নিমাইয়ের পাশে এসে পা-দানীতে একটা পা তুলে দিয়ে বলল, "আপ্‌কো দিমাককা কুছ গড়বড় হুয়া মালুম—"

নিমাই ব্যাপারটা বুঝতে পেরে আর বাদানুবাদ করলে না। কিন্তু মানিব্যাগ খুলে দেখে তাতে মাত্র দুটি টাকা পড়ে আছে। কিন্তু ভাড়া উঠেছে মিটারে তার চেয়ে ঢের বেশী।....এর পরেই সে তার অবস্থাটা সোফারকে বুঝিয়ে বলে আমর্হাষ্ট ষ্ট্রীটস্থ বাসার ঠিকানায় গাড়ী চালাতে হুকুম করলে।

—বার—

পরদিন। অফিসে তখনও নিমাই কাজে হাত দেয়নি; তবে দিই দিই করছে।

অফিস যখন বসে তখন সাহেব একবার এ মাথা থেকে ও মাথা পর্য্যন্ত ঘুরে সকলকে দেখে যায়।

সাহেব নিমাইয়ের সামনে এসে দাঁড়াল, নিমাই 'গুড্‌-মর্নিং' বলে নিজের কাজে মন দিলে, কিন্তু সাহেব তখনও তার মুখের দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

"সানিয়েল—"

নিমাই সাহেবের মুখের দিকে চোখ তুলে তাকাল।

"তোমার শরীর ভালো আছে ?" নিমাইয়ের সুস্থ্যতা সম্বন্ধে সন্দিহান হ'য়ে সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন। কারণ প্রায় তিন বৎসরের মধ্যে একটা দিনও নিমাইকে সে-রকম ভাবে দেখেনি, যে-রকমটি আজ দেখছে।

নিমাই লক্ষ্য করেনি যে, চিন্তা ও গত রাত্রি অনিদ্রায় কাটানর ফলে তার সর্ব্বাঙ্গে কে যেন কালি ঢেলে দিয়েছে। সেই জন্যই তাকে অস্বাভাবিক রুগ্ন দেখাচ্ছে।

নিমাই ব্যাপারটা বুঝতে পেরে ধন্যবাদের সহিত সাহেবকে জানাল যে, শরীর তার ভালই আছে; কিন্তু কোনো কারণে মন খুব খারাপ হওয়াতে চেহারাটা মলিন দেখাচ্ছে বলেই তার বিশ্বাস।

সাহেব নিমাইকে বাসায় গিয়ে বিশ্রাম নেবার জন্য অনুরোধ করাতে, অনিচ্ছা সত্বেও ড্রুয়ার বন্ধ করে বাসার উদ্দেশ্যে অফিস থেকে রওনা হ'য়ে পড়ল।

বাসায় এসে সে পড়ল মহা বিপদে। দিবা-নিদ্রাকে সে যমের মতো ভয় করে। বই পড়ে সময় কাটাবার মতোও তার মনের অবস্থা নয়। সে ভাবল,—কাজ নিয়ে থাকলে সময়টা বেশ কাটত। অস্বস্তিকর ভাবে ঘর-বারান্দা, বারান্দা-ঘর করে সাড়ে চারটে পর্য্যন্ত কাটাল। জলযোগ সারছে এমন সময় চাকর এসে বললে,—"সান্যাল বাবু আপনাকে কে ডাকছে—"

"ভেতরে ডেকে নিয়ে এস—" মুখ না তুলেই নিমাই বলল।

নরেনের চাকর কালীচরণ এসে দাঁড়াতেই নিমাই সবিস্ময়ে বললে,—"কি রে! কালীচরণ যে—"

"আজ্ঞে, মা চিঠি দিয়েছে আপনাকে একটা—" সে নিমাইয়ের হাতে অমলা প্রদত্ত চিঠিখানা দিয়ে বল্লে, "আপনাকে যেতে হ'বে, এক্ষুনি—" বলে সে চলে যেতে উদ্যত হল।

নিমাই ইতিমধ্যেই চিঠিখানা পড়ে ফেলে বললে—"দাঁড়া, এক সঙ্গেই যাব—" পরে সে গেঞ্জির উপর শার্টটা চড়িয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মাথায় চিরুনিটা বুলিয়ে নিলে একবার, পরে জামার বোতাম দিতে দিতে ঘর থেকে বেড়িয়ে গেল। এবং পথে নেমে সামনে দিয়ে একটা ফেটিন গাড়ী চলে যেতে দেখে তাকে ঈসারা করে ডাকল নিমাই এবং নাম্বার বলে দিয়ে চেপে বসল উপড়ে।

এদিকে অমলা একবার বাড়ীর ভিতর যায় আবার বাইরে এসে জানালার গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে দেখে নিমাই আসছে কিনা।··· মনে মনে শঙ্কিত হয়, নিমাই বাবু যদি বাসায় না থাকে! নরেনের অসুখ করেছে বলে অমলা নিমাইকে ডেকে পাঠিয়েছে, কি অসুখ করেছে, তা' নরেন অমলাকে বলে নি। তিন দিন হ'ল তার সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছে নরেন। কেন, তাও সে জানে না। অমলা শুধু চিন্তা করে দেখে তার কোনো ত্রুটি থেকে এই অবস্থার সৃষ্টি হ'ল কিনা। তার কিন্তু স্মরণ হয় না, কোনো রকম ত্রুটি সে করেছে বলে, অন্ততঃ জ্ঞাতসারে।···অমলা নিজের অবস্থা জানে।

সে জানে, গরীবের রক্তে তার জন্ম, দুঃখীর অন্নে যে প্রতিপালিত। তাই অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন ঘরে এসে সে সদা শঙ্কিত হ'য়ে থাকে, পাছে স্বামীর তুষ্টি বিধানে কোনো রকম ত্রুটি হয়। সে দাবী তো করেই না কোনো কিছুর, মনের কোণে কোনো আশাও রাখে না। সে আয়তি হ'য় বেঁচে থাকতে চায়; সে স্বামীর ঘর পেয়েছে এই তার যথেষ্ট বলে মনে করে সে।

গলিতে ফেটিন গাড়ীখানা ঢুকতেই অমলার মনে হল, নিমাই বাবুই আসছে, কিন্তু সামনের দিকটা আড়াল বলে সে ঠিক চিনতে পারলে না। ঘর থেকে বেড়িয়ে এসে দরজাটা খুলল সে। খুলে একটু ফাঁক করে দেখতে লাগল। হ্যাঁ, নিমাই বাবুই বটে!

গাড়ী খানা কাছাকাছি আসতেই সে দরজাটা খুলে দাঁড়িয়ে রইল। ফেটিনের ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে আমলার সামনে এসে নিমাই দাঁড়াতেই অমলা অত্যন্ত আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা করল,— "একি! আপনার অসুখ করেছিল নাকি? শরীর যে বড্ড খারাপ দেখাচ্ছে!"

"তার জন্য ভাববেন না; সাময়িক—" নিমাই সংক্ষেপে জবাব দিয়ে প্রশ্ন করল, "ব্যাপার কি—"

ব্যাপারটা কি, কি ভাবে নিমাইকে জানাবে তার আহ্বানের উদ্দেশ্য, তখনও ঠিক করতে পারেনি: "অনেক দিন হ'ল আসেনিন কেন?"

"এমনিই—" নিমাই এ ছাড়া আর কিছু বলতে পারে না।

না আসার কারণ, তার প্রতি নরেনের কপটাচার। বন্ধু বলে পরিচয় দেবে, অথচ ব্যবহারিক জীবনে সর্ব্বদাই কপটাচার; এ আবার কি রকম বন্ধুত্ব সে বুঝতে পারে না। বাল্য জীবনের ঘনিষ্ঠতার টানটা থাকলেও এই পরিণত বয়সে খাদ-মেশান বন্ধুত্ব বরদাস্ত করাটাকে সে 'বন্ধুত্ব' জিনিষটার প্রতি অমর্য্যাদা দেখান বলে মনে করে; সেজন্য সে যাতায়াত বন্ধ করে দিয়েছিল।

"আপনার বন্ধুর অসুখ করেছে; দেহে নয়, মনে বলেই আমার ধারণা—" বলে অমলা নতমুখে আঁচলটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল।

"কেন, কি হ'য়েছে ?"

অশ্রুভারাক্রান্ত চোখ মেলে অমলা নিমাইয়ের প্রতি তাকাল একবার; পরে ধীরে ধীরে দৃষ্টিটা নামিয়ে নিতে নিতে তার স্বভাব সিদ্ধ শান্তস্বরে বললে,—"বিশ্বাস করুন, আমি কোনো অপরাধ করিনি—" সে যে রকম বিনীত ভাবে বললে তাতে নিমাইয়ের ভিতরে ভিতরে একটা দোলা খেয়ে গেল।

অমলার এতটা বিনীত হবার কারণ,—সে জানে, নিমাইয়ের কথায় নরেন তাকে বিয়ে করেছে। এখন তার ব্যবহারে যদি নরেন অসন্তুষ্ট হয়, তবে একদিক দিয়ে নিমাইকে ছোট বা অপমান করা হবে। কেন না তার দাদা নিমাইয়ের অধীনস্থ কর্ম্মচারী।

"আজ দু' তিন দিন কথা বলে নি—" বলে হুহু করে কেঁদে ফেল্লে অমলা।

"কাঁদছেন কেন? কাঁদবেন না, দেখছি আমি—" নিমাই অন্তরে আঘাত পেয়ে ব্যস্ত ভাবে বললে।

বিগলিত ধারে অশ্রু অমলার কপোল বেয়ে ঝরছে; সে আর একবার নিমাইয়ের মুখের দিকে তাকাল। পরে চোখ মুছতে লাগল আঁচল দিয়ে। এতে নিমাইকে করে তুলল আরও অস্থির।

"চলুন—" বললে নিমাই।

অমলার পিছু পিছু নিমাই বাড়ীর ভিতর এলো; পরে সে নিঃশব্দে নরেনের ঘরে ঢুকল। দেখলে, নরেন বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে আছে।

"নরেন বাবুর কি হ'য়েছে—" শান্ত অথচ শ্লেষভরে নিমাই প্রশ্ন করলে।

হঠাৎ নিমাইয়ের অবির্ভাব জেনেই সে তরাক্ করে উঠে বসল। বসে বালিশটা টেনে নিয়ে তার উপর কনুয়ের ভর রেখে দুলতে সুরু করল নীরবে।

তার সর্ব্বাঙ্গে দুঃশ্চিন্তা জনিত কালীর ছাপ। আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় মানুষের যে-রকম ভাব হয়, তার অবস্থাও সেই রকম। পরে বাঁ হাত দিয়ে মাথার চুল মুঠিয়ে ধরে হতাশার দৃষ্টিতে নিমাইয়ের প্রতি তাকাল। উদাস, সশঙ্কিত ভাব তার চোখে মুখে—নিমাই এটা লক্ষ করল।

"সত্যানন্দ স্বামীজীকে চিনিস?" স-শ্রদ্ধ স্বরে স্বামীজীর নামটা উচ্চারণ করে নরেন প্রশ্ন করল নিমাইকে।

"না, কেন কি হয়েছে—"

"চিনিস্ না! বলিস কি রে! এত বড় একজন এ্যাষ্ট্রোলজিষ্ট!" অত বড় একজন লোককে নিমাই চেনে না, এতে নরেনের বিস্ময়ের আর সীমা রইল না।

"তা' ত হল, কিন্তু ব্যাপারটা কি?" নিমাই জানতে চাইলে।

ওদিকে ঘরের বাইরে অমলা আড়ি পেতে দাঁড়িয়ে ছিল; তার কোনো দোষ ত্রুটির কথা নিমাইকে তার স্বামী বলে কিনা শুনবার জন্য।

কিন্তু ব্যাপারটা তা নয় জেনে, সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল; কয়েকবার সে ঘরে ঢোকবার জন্য এগিয়ে গেল, কিন্তু পারলে না।

"আগামী এক সপ্তার মধ্যে মস্ত বড় একটা বিপদ আসছে, আমার, ভাই নিমু।....স্বামীজী কপাল দেখেই লোকের ভাগ্য বলে দেন; তাতে আবার তিনি আমার হাত দেখে ওই কথা বলেছেন, একেবারে সুনিশ্চিত—" বলে নরেন অসহায় ভাবে নিমাইয়ের প্রতি তাকাল।

"তা' একটা স্বস্তেন টস্তেন করবার যোগাড় করলি না কেন?" বলে মুখে রুমাল চাপা দিয়ে নিমাই মৃদু মৃদু হাসতে লাগল।

"আরে সেইজন্যেই তো গিছলাম কাল সকাল বেলায়; কিন্তু তিনি পরশু দিন রাত্রেই দেওঘর না কাশী চলে গিয়েছেন—" প্রথমটা নরেন উচ্ছ্বসিত ভাবে বলে শেষ করলে কথাটা অতি দুঃখিত স্বরে।

"কোথায় গিয়েছেন তিনি ঠিক ভাবে জেনে নিয়ে তাঁর পিছু পিছু দৌড়িলি না কেন ?"

"ঠাট্টা করছিস্ ?" বলে নরেন নিমাইয়ের প্রতি সন্দিগ্ধ ভাবে চেয়ে রইল।

"আহা ! ঠাট্টা আবার করলাম কোন্‌খানে—" একথাটা বিদ্রূপের ভাব ফুটে বেরুল বেশী।

"হ্যাঁ তোরাই ঠিক ; ঠিক তোরা ভগবান টগবান মানিস না, ঠিক তোরা—" একটু থেমে আবার বললে নরেন, "মনে মনে যারা তাঁকে বেশী ভক্তি করে, তাদেরই ঘাড় ধরে তিনি ঠেলে দেন বিপদের মুখে—"

ভগবানের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনার জন্য নিমাই কোনো প্রতিবাদ করলে না ; পূর্ব্বের মতো মুখে রুমাল চাপা দিয়ে হাসতে লাগল।

নরেন পুনরায় বিছানায় শুয়ে পড়তে, নিমাই উঠে পড়ল। বাইরে এসে সে দেখে অমলা দেওয়ালে হেলান দিয়ে মাথা নত করে দক্ষিণ পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটা মাটিতে ঘষছে।

"চল্লাম—" নিমাই অমলাকে উদ্দেশ করে বললে; এবং আর অপেক্ষা না করে সামনের দিকে হাঁটতে সুরু করে দিলে। অমলা তার পিছু পিছু বাইরের ঘর পর্য্যন্ত এলো। অমলা আসছে টের পেয়ে নিমাই পিছন ফিরে দাঁড়াল।

"যদি সত্যিই কিছু বিপদ আপদ ঘটে তবে খবর দেবেন ; ওর

জন্যে আপনি ভাববেন না। বিপদ আপদ আসে মানুষের জন্যই—” বলে নিমাই বাইরের দরজার চৌকাঠ ডিঙ্গিয়ে আবার একবার মুখ ফিরিয়ে বললে অমলাকে,—“সে সব যদি কিছু না হয়, তবে আমি দিন দশ বার পরে একবার আসব।”

নিমাই হাঁটতে শুরু করলে অমলা কপাট বন্ধ করবার আগে একটু ফাঁক করে চেয়ে রইল নিমাইয়ের গতিপথের দিকে। সে মোড় ঘুরে অদৃশ্য হয়ে যেতেই অমলা একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে কপাট বন্ধ করে দিলে; দিয়ে বাড়ীর ভিতরে এসে ঘরে ঢুকল। সে ঘরে ঢুকতেই নরেন তার দিকে একবার তাকিয়েই চোখ দু'টো নামিয়ে নিলে। অমলা নিঃশব্দে আরো নরেনের কাছে সরে গেল। কিছুক্ষণ নতমুখে দাঁড়িয়ে থাকবার পর অনুযোগের স্বরে বললে অমলা—“সুখ দুঃখের কথা শোনবার অধিকার বুঝি আমার নেই?” তার গলার স্বর কেঁপে উঠল।

“তাই আমি বলেছি নাকি?” নরেনের কথা কয়টা বিরক্তি-লেশহীন নয়।

“তবে যে দু' দিন কথা বললে না?”

“দেহ মন খারাপ থাকলে কারুর কথা বোলতে ইচ্ছে যয় না—” নরেনের কথায় উষ্মার ভাব।

“মিছিমিছি মন খারাপ কর কেন?” বিনীত ভাবে অমলা বললে। বলেই তার খেয়াল হ'ল সন্ধ্যা হ'য়ে এসেছে; প্রদীপ

জ্বালতে হ'বে। "ভর-সন্ধ্যে বেলায় শুয়ে থেকো না উঠে বস—" বলে অমলা ঘর থেকে বেড়িয়ে গেল।

—তের—

নির্দ্দিষ্ট দিনে নরেনের কোনো বিপদের সংবাদ নিমাই যখন পেল না, তখন সে একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে নিশ্চিন্ত হ'ল। সত্য কথা বলতে কি, সে মনে মনে একটু শঙ্কিত হ'য়েছিল। প্রায় দু' সপ্তাহ গত হ'য়ে যায় দেখে তার স্মরণ হ'ল যে সে অমলাকে কথা দিয়ে এসেছে একবার দেখা করবার।··· বিকেল বেলায় সে বেড়িয়ে পড়ল নরেনের বাসার উদ্দেশে।

নরেনের বাসায় এসে কড়া নাড়তেই কালীচরণ এসে কপাট খুলে দিলে। অমলা ভেতর থেকে উঁকি মেরে দেখেছিল কে এসেছে। নিমাইকে দেখেই সে সহাস্য বদনে এগিয়ে এলো। এসে জোড় হাত করে সে নমস্কার করলে নিমাইকে একটা। নিমাই প্রতি-নমস্কার করে বললে,—"যাক্, ফাঁড়া তা হ'লে উত্‌রে গিয়েছে ?"

অমলা ঘাড়ে নেড়ে জানাল—তা' ঠিক। এর পরে সে গত দু' সপ্তাহের ঘটনা নিমাইয়ের কাছে বর্ণনা করতে লাগল। দুঃখ করতে লাগল তার কোনো দোষ না থাকা সত্ত্বেও নরেন তাকে আর পূর্ব্বের

মতো দেখে না। নিমাই নত মুখে দাঁড়িয়ে সব শুনলে। পরে জানতে চাইলে নরেন কোথায়।

"কখন কোথায় যায় আমাকে বলে যায় না নিমাই বাবু—" অমলা বললে দুঃখ করে; তার প্রাণে বড় ব্যথা—শত চেষ্টা করেও স্বামীর মন রাখতে পারছে না। সে ভাবে হয়ত তার অদৃষ্ট পোড়া, চিরটা কাল জ্বলতে পুড়তে হ'বে দুঃখের দাহনে!

"তার জন্যে আপনি দুঃখ করবেন না—" নিমাই সহানুভূতি সূচক স্বরে বললেঃ "এক একটা লোক ওই রকম বদ খেয়ালে হয়—"

"দুঃখ?" বলে অমলা করুণ ভাবে নিঃশব্দে একটু হাসল। পরে বললে, "না, নিমাই বাবু, দুঃখ করি না; আজন্ম ও-জিনিষটা সয়ে সয়ে বুক পাষাণ হ'য়ে গিয়েছে। এখন শুধু এই ভয় হয়, নিজের দুঃখের কপাল নিয়ে অপরকে অসুখী করে না তুলি—" নাসিকা ও মুখ কুঞ্চিত করে বিনীত ভাবে অমলা দাঁড়িয়ে রইল।

কথা কয়টা নিমাইয়ের অন্তরে আঘাত করে তাকে বিচলিত করে তুলল।

"আপনি তো সব জানেনই আমাদের, বলতে কি আপনি দয়া না করলে দাদা আমার ভগ্নিদায় থেকে উদ্ধারই পেত না—" এই কথা প্রসঙ্গে অমলা বলে চলল তার দাদার ঘরের দুঃখের কাহিনী। "অতি কষ্টে মানুষ হয়েছি আমরা। বাবা শেষ দিন পর্য্যন্ত দুঃখ মেহনত করে খাইয়ে গিয়েছেন আমাদের। তাঁর মরবার সময়

দাদার বয়স তখন বড্ড জোর আঠার কি কুড়ি। বাবা অন্তিম কালে দাদাকে কাছে ডেকে বলেছিলেন, 'দেখিস বাবা, তোর হাতে আমার ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের দিয়ে গেলম; দেখিস, খেতে না পেয়ে যেন পথে পথে ঘুরে বেড়ায় না; তা' হ'লে আমি মরেও শান্তি পাব না।' দাদা আমার সেদিন থেকে যে দুঃখ কষ্ট করে খাইয়েছে পড়িয়েছে আমাদের, তা' ওই পূবে উঠে পশ্চিমে যিনি অস্ত যাচ্ছেন তিনি জানেন—" বলে অমলা তার চোখ ও হাত উপরে তুলল: "দেখেনই তো, গায়ে একটা বার আনা দামের পাঞ্জাবী, চোদ্দ আনা দামের মোটা ধূতি; আর এক জোড়া চটি—" বললে অমলা; তার চোখ দুটো অশ্রুসিক্ত হ'য়ে উঠল।

"দেখুন আমি আপনাকে একটা কথা বলছি—" অমলার দুঃখের কাহিনী বর্ণনায় নিমাই বিচলিত হ'য়ে বললে: "মানুষের মর্জ্জির কথা বলা যায় না; তাই, এই—" কি বলবে সে ঠিক করতে না পেরে চিন্তা করতে লাগল গলার স্বরটা টেনে: "তাই বলছিলাম, যদি কোনো বিবাদ বিচ্ছেদ হয় আপনাদের, তবে আপনি মনের কোণেও জায়গা দেবেন না যে, আমি তাতে আপনার কোনো ত্রুটি হ'য়েছে বলে মনে করব—"

অমলার বুকটা ভিতরে ভিতরে কেঁপে উঠল; তাতে তার মুখটাও সঙ্গে সঙ্গে হয়ে গেল পাংশু বর্ণ। সে শুধু অশ্রুসিক্ত চোখ দুটি তুলে নিমাইকে একবার দেখে নিলে।

"আপনি বরং আমাকে আপনার দাদার মতোই মনে করবেন—" স্নেহমিশ্রিত স্বরে নিমাই বললে।

"মনে মনে আমি তাই করিও—" বিনয়ের একটুও বাকী না রেখে বললে অমলা।

উভয়ে কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে রইল। তারা আপন আপন অন্তরে নিহীত বেদনাকে নিয়ে নারাচাড়া করতে করতে ভুলে গেল যে, এ ভাবে দাঁড়িয়ে থাকাটা তাদের শোভা পায় না। বাইরের রিক্‌সাওয়ালার ডাক শুনে নিমাই চমকে উঠল।

"আচ্ছা, তবে আমি আজ যাই—" বলে ত্বরিতে বাইরে চলে গেল নিমাই।

বহুক্ষণ ধরে তার চিন্তাকে আচ্ছন্ন করে রাখল অমলাদের দুঃখ। তারপর তার মনে নরেনের কল্পিত বিপদ ও তা' থেকে অসুখ অশান্তির কথা উদয় হতেই সে হাসল একটু মনে মনে। সে ভাবতে লাগল,—মানুষের দুঃখ এক বিন্দুও নেই, যদি সে তার বর্ত্তমানের মাথার 'পরে ভবিষ্যতের ভাবনার বোঝা চাপিয়ে মাটিতে নুইয়ে না দেয়। যে-দিনটা সে হেসে খেলে স্বচ্ছন্দে কাটাতে পারত, সে-দিনটা সে দশদিন আগের ভাবনা ভেবে করে তুলল অসহনীয় দুঃখময়।···সে যদি বুঝত, নিমাই স্থির নিশ্চিত হ'য়ে ভাবল, আমাদের জীবনটা ঠিক সেই রকম, যেমন—কেউ যদি হিমালয় থেকে সাগর পর্য্যন্ত একটা খাল কেটে, সেই খালের সুরুতে বসে অবিরত জল ঢালে, তবে সেই সাগরাভীমুখী জলের প্রথম

ধারাটির মতো। সে শত-সহস্র চেষ্টা করে মাথা খুঁড়ে রক্তারক্তি করে ফেললেও বিপথে যেতে পারবে না; ইচ্ছার বিরুদ্ধেও তাকে বেয়ে যেতে হ'বে সেই কাটা খালের ভিতর দিয়ে। শুধু বেয়ে যাওয়াটাই সব কথা নয়। প্রতি বাঁকের মুখে মাথায় আঘাত সহ্য করে মোড় ফিরতে হবে। এই আঁকা-বাঁকা-সহস্র-মোড়-ফোরা জলের ধারা শেষে গিয়ে মিলবে সীমাহীন সাগরে। এই হল জীবন; এ ছড়া আরে যা' সেসব মানুষের কল্পিত।

উত্তরোত্তর নিমাইয়ের চিন্তা ধারা বদলাতে লাগল, ভাবল সে,—সংসারে সেই সব চেয়ে সুখী ও শান্তিতে বাস করে, যে মিথ্যার মোহ জীবন থেকে ছেঁটে ফেলে দিয়ে কর্ত্তব্যের বোঝা মাথায় নিয়ে অতি সন্তর্পনে জীবনের লক্ষ্য পথে অগ্রসর হয়। ঘটনার ঘুর্ণিবাত্যার পথরোধ করবার স্পর্দ্ধা নিয়ে সামনে না দাঁড়িয়ে নিজে কোনো রকমে এক কোণে ঠাঁই করে নিয়ে নীরবে দেখাটাই সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল বলেই সে মনে করল। সে ভেবে চলল,—মানুষকে এই ঘুর্ণিবাত্যার মাঝে ফেলে ঘুরপাক খাওয়াচ্ছে তার আত্ম-প্রাধান্যের মোহ। এই মোহই তাকে নাকে দড়ি দিয়ে দিবারাত্র ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে; যার জন্য তার দেহের স্নায়ুজাল সুস্থ্য হ'বার এক মূহুর্ত্তও সময় পাচ্ছে না। আর, না' পাওয়ার ফলে সর্ব্বোচ্চ শান্তি তার কাছে থেকে যাচ্ছে অনাস্বাদিত। সর্ব্বাঙ্গীন সুস্থ্যতাই, অন্ততঃ তার ধারণা, মানুষের সব কথা। এই সুস্থ্যতাই সত্যানুভূতি লাভের পথে একমাত্র পাথেয়। আর এই সত্যানুভূতি লাভেই

মানুষের চরম শান্তি; পার্থিব সকল সুখ সম্পদের উপরে। এই অমূল্য সম্পদ সেই লাভ করতে পারে, যে দিনের প্রতিটি কাজ ও কথার হিসাব নিকাশ করে দিনান্তে এক নির্জ্জন স্থানে বসে; দেখে, তার প্রতি কথা ও কাজের প্রয়োজনীয়তা অপ্রয়োজনীয়তা। কারণ, নিমাই ভাবল, মানুষের প্রতিটি কাজ ও কথার প্রতিক্রিয়া আছে।··· তার প্রতি পদক্ষেপ জীবন কাহিনীর নূতন একটি অধ্যায়। এই সুস্থ্যতা অর্জ্জন করতে পারলে, সে আরও ভাবল, যে-জগতটার সঙ্গে পরিচয় হয়,—সেখানে, নির্ব্বিবাদে বসে দেখা যায় মানুষের অসহায় অবস্থা। যেমন, স্বচ্ছ দীঘির কালো জলের 'ওপর দিয়ে দেখলে তার-তলদেশ দেখা যায়। দেখা যায়, সেখানে কত গ্লানি জমে আছে; কত রকম পোকামাকড় বেড়াচ্ছে ঘুরে ফিরে। তেমনি এ অবস্থায় এসে অতীতের পানে ফিরে তাকালে দেখা যায় নিজের অপকীর্ত্তির জন্য অদৃশ্য লোকের হাতে লাঞ্ছনা।····এমন একটা কাজ, যাতে অসৎ বা মিথ্যার বিন্দুমাত্র ছোঁয়াচ ছিল, সেটা সফল হ'য়েছে; সফল হওয়া ত দূরের কথা—তার জন্য হ'তে হ'য়েছে প্রতি পদে পদে অপমানিত।···ঘোলা-জলপূর্ণ দীঘির, সে স্থির নিশ্চিত হ'ল, এক জালা জলের চাইতে গোষ্পদের নির্ম্মল জলের এক বিন্দু ভাল।

"বাবুজী—" রিক্সাওয়ালা ডাকল।

নিমাই চমকে উঠে একবার চারদিক চেয়ে নিলে; নিয়ে বললে, "হাঁ, হাঁ, আউর থোরা আগারী ওই লালবালা মোকান্—"

মেসের সামনে নিমাই নেমে ভাড়া চুকিয়ে দিলে; তার মন বেশ সুস্থ্য ছিল বলেই বোধ হয় রিক্‌সাওয়ালাকে করলে এক আনা পয়সা বকসিস্।

"মালিক আপ্‌কো দেগা, সরকার—" বলে রিক্‌সাওয়ালা পয়সা-গুলো একবার কপালে ঠেকিয়ে নিমাইকে একটা সেলাম জানিয়ে সে ধীর পদবিক্ষেপে টুং টুং শব্দ করতে করতে চলল।

রিক্‌সাওয়ালার শুভচ্ছেটা নিমাইয়ের কাণে বাজছিল, তাই সে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে তার গতি পথ লক্ষ্য করল; পরে সে ঢুকে গেল মেস বাড়ীতে।

—চোদ্দ—

নরেনের উত্তরোত্তর ভাগ্যোন্নতিতে অমলার প্রতি নিমাইয়ের শ্রদ্ধা গেল শত গুণে বেড়ে। কারণ বিয়ের ঠিক দু' সপ্তাহ পরেই তার হৃত চাকুরীর পুনঃ প্রাপ্তি। তারপর লটারীতে বেশ মোটা রকমের কিছু অর্থ প্রাপ্তি; শেষ কালে স্বায়ত্তশাসন বিভাগের কোনো এক প্রতিষ্ঠানের বিভাগীয় বড় কর্ত্তা হ'য়ে গেল।…কিন্তু এতে অমলার ভাঙ্গা কপাল আরও ভাঙ্গতে লাগল বেশী করে! বিভাগীয় বড় কর্ত্তার পদ প্রাপ্তির পর থেকে তার নব-ক্রীত স্কোডায় বন্ধু

বান্ধবীদের চড়িয়ে নিয়ে সে দিন রাত কাটিয়ে দেয়। দিনের ভাগে বাড়ীতে এক মুঠো খায়, তাও আবার কোনা দিন খায় না; কারণটা অমলা জিজ্ঞাসা করতে গেলে নরেন কথাই বলে না। কোনো কিছুর দরকার হ'লে কালীচরণের কাছে চায়, প্রত্যক্ষ ভাবে অমলাকে অপমান করবার জন্য; কারণ কি, তা' সেই ভালো করে জানে। প্রায় দিনই অমলা অনাহারী থাকে, মুখ তুলেও একবার তার দিকে তাকায় না নরেন। সে ভাবে ভঙ্গীতে এইটেই বোঝাতে চায় যে, অমলা এখন আর তার উপযুক্ত নয়। গার্ডেন পার্টি, টি-পার্টি প্রভৃতি অভিজাত আমোদ আহ্লাদের আসরে নিয়ে যাবার মতো অমলার শিক্ষা-দীক্ষা, রূপ-গুণ কিছুই নেই। সে এখন শুধু করুণার পাত্রী !

নরেন সেদিন ঘরে চেয়ারে বসে গলায় টাই বাঁধছে এমন সময় অমলা ঘরে ঢুকে লক্ষ্য করল যে সে এখনও পায়ে ষ্টকিন পরেনি। অমলা আলনা থেকে ষ্টকিন জোড়াটা নিয়ে আস্তে আস্তে নরেনের পা তলায় গিয়ে বসল; পরে নীরবে স্বামীর পা থেকে চটি খুলে ষ্টকিন জোড়া পরিয়ে দিলে। দিয়ে নতমুখে কিছুক্ষণ বসে থেকে লুকিয়ে নরেনের মুখটা একবার দেখে নিয়ে পরে বিনয়ের এক বিন্দুও বাকী না রেখে বললে,—"দেখ, জন্ম অবধি দুঃখ কষ্ট লাঞ্ছনা সয়ে আসছি, এখন তুমি যদি মুখ তুলে না চাও আমার পানে, তা' হ'লে কি করে প্রাণ ধরে বেঁচে থাকি তাই তুমি বল—"

নরেন অমলার কোনো কথার জবাব দেওয়া তো দূরের কথা,

এক মূহুর্ত্তও অপেক্ষা না করে স-শব্দে ঘর থেকে বেড়িয়ে গিয়েছিল। আর অমলা কিছুক্ষণ প্রস্তর মূর্ত্তির মতো বসে থেকে কপালে করাঘাত করে নীরবে একটু হেসেছিল মাত্র।

…আজকাল নরেন রাত্রে বাড়ী ফেরে বারটা একটায়; আহারাদি বাড়ীতে করেই না এবেলায়। আগে সে মাঝে মাঝে বিয়ারের বোতল বাড়ীতে এনে খেত; অমলা দেখেও কিছু বলত না, কেননা নরেন তাকে বোঝাতো যে, তাতে মদের ভাগ নাম মাত্র আছে; আছে কেবল আঙ্গুরের রস আর চিরেতার জল; খেলে স্বাস্থ্য ভালই হয়। কিন্তু আজ কাল সাদা ঘোড়ার লেবেল মার্কা হুইস্কির তীব্র গন্ধে টেঁকা যায় না—যখন নরেন ঘরের ভিতর বোতল খুলে সোডাজলের গেলাসে মেশায়। অমলা স্বামীর স্বাস্থ্য-হানির আশঙ্কায় বলতে যায়,—"ওগুলো খেয়ো না বেশী, শরীর খারাপ করবে—"

"পরামর্শ কেউ না চাইলে, যেচে দিতে গেলে অপমানিত হ'তে হয়, একথাটা জানতে না নিশ্চয়ই; আজ থেকে জেনে রেখে দাও—" নরেন অবজ্ঞা ভরে জবাব দেয়।

অমলা আর দ্বিরুক্তি না করে আঁচল বিছিয়ে মেঝেয় শুয়ে পরে। আজকাল তার স্থান মেঝেতেই।

নিমাই এ সবই শুনেছিল। যে-দুঃখে নীচতম পশুও অশ্রু বিসর্জ্জন করে, সেখানে নিমাইয়ের ব্যথা কতখানি তা' সহজেই অনুমেয়। লজ্জায় সে নরেনের বাড়ীর ছায়া মারায় না।

কালীচরণকে দিয়ে চিঠি পত্র দিলে তার জবাবে সে চিঠিই দেয়। অমলাও আর বেশী বিরক্ত করে না নিমাইকে। কারণ যে-যন্ত্রণা সে অদৃষ্ট দোষে পাচ্ছে, তার মড়াকান্না অপর একজনের কাছে কেঁদে তার মনে দুঃখের সঞ্চার করানো সে পাপ বলেই মনে করে।

নরেন অব্যবস্থিত চিত্তের মানুষ হ'লেও এটা নিমাই জানত যে, তার চরিত্রদোষ নেই। আবার মাঝে মাঝে এও ভাবত যে, লোভের তাড়নায় পদস্খলন হ'তেই বা কতক্ষণ? তার আর্থিক অবস্থা ভালো হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রবৃত্তির উগ্রতা তাকে পাগল করে তুলবে, এটাও বড় কথা নয়। কারণ, অমলা তার একটা চাহিদা মেটাতে সমর্থ হ'লেও আরও এমন আকাঙ্ক্ষা হয় তো আছে নরেনের, যার নিবৃত্তির জন্য তাকে বাইরে ছুটতে হয়।

তাই, সেদিন নিমাই খুব বেশী আশ্চর্য্য হয়নি যে দিন সে দেখল—নরেন তার স্কোডায় এক তরুণীকে নিয়ে লেকে ভ্রমণ করছে। তা' দেখেই সে চুপে চুপে সরে পড়েছিল, পাছে বন্ধু কোনো রকম অবাঞ্ছিত অবস্থার মধ্যে পতিত হয়। পরে সে অফিস থেকে ফোন কোরে তাকে অনুরোধ করেছিল—যেন সে দেখা করে একবার তার সঙ্গে। বন্ধুর অনুরোধ রক্ষা করবার জন্য নরেন যখন দেখা করল নিমাইয়ের সঙ্গে, তখন সে তাকে নির্জ্জনে নিয়ে গিয়ে নানা কথার পর জানিতে চাইলে যে, সেই তরুণীটি কে। নরেন তাতে রীতিমত বিচলিত হ'য়ে পড়েছিল।

কেননা সে স্বপ্নেও ভাবেনি যে নিমাই তার তরুণী-বান্ধবীটিকে দেখে ফেলেছে গোপনে গোপনে। সত্য কথা বলেনি নরেন। কোনো এক আত্মীয়ার মেয়ে বলে সে বুঝিয়ে দিয়েছিল নিমাইকে। দেবার সময় ভুলে গিয়েছিল যে, তার আত্মীয় স্বজন কে কোথায় আছে না আছে তা' জানতে বাকী নেই নিমাইয়ের। নিমাইও আর দ্বিতীয় প্রশ্ন করেনি, করাটাকে সে বন্ধুর প্রতি অযথা অত্যাচার বলেই মনে করেছিল। কোথাকারের জল কোথায় গিয়ে মড়ে তাই দেখবার জন্য বন্ধুর সঙ্গে একরকম সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে আপনার কাজের মধ্যে নিজেকে সে ডুবিয়ে রেখেছিল।

অমলার দোষ মোটেই ছিল না। কালীচরণ বাইরে কড়া নাড়ার শব্দ শুনে কপাটটা খুলতে গিয়েছিল তার পিছু পিছু অমলাও গিয়েছিল এই মনে করে যে, হয় ত নিমাই বাবু এসেছে। কিন্তু কপাটটা খুলতেই এক বৃদ্ধ ত্বরিতে ঢুকেই ধড়াস্ করে একেবারে অমলার পা-তলায় পড়েই অসহায় ভাবে আবেদন করল: "মা— আপনি রক্ষে করুন এই গরীব বুড়কে—"

এই অভাবনীয় ঘটনায় অমলা বাক্-শক্তিহীন হ'য়ে কাঠের পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে রইল। কি ব্যাপার কি হয়েছে, করতে হ'বে কি, কিছুই সে প্রশ্ন করতে পারলে না। সে দাঁড়িয়ে রইল হতভম্ব হ'য়ে।

পরে বৃদ্ধ ধীরে ধীরে উঠে বলেছিল যে, সে আর তার দু' ছেলে

নরেনের অধীনে ঠিকে কাজ করে। কাজটা যদিও ঠিকে, তবু প্রায় আট দশ বৎসর সেই বিভাগে তারা কাজ করছে। এখন তাদের কাজ বজায় রাখতে হ'লে, বড়বাবুকে অর্থাৎ নরেনকে মোটা রকম ঘুষ দিতে হ'বে। এই ঘুষ তারা নাকি বরাবর খাইয়ে এসেছে—এর আগেকার বড়বাবু যারা ছিল তাদের। কিন্তু বৃদ্ধ অস্বীকার করল না যে, আগের বাবুদের মাঝে মাঝে পুকুরের মাছ, ক্ষেতের নানা রকম তরকারী ছাড়া আর কোনো রকম ঘুষ কোনো দিনই তারা দেয়নি। এই সমস্ত বলে এবং সংসারের অবস্থা বর্ণনা করতে করতে বৃদ্ধ হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলেছিল।

"তা' আমি করব কি—" সমবেদনায় অমলার বুক ভরে উঠলেও, নিজের অবস্থাটা স্মরণ করে রুক্ষ স্বরে এই কথা কয়টি ছাড়া সে আর কিছু বলতে পারেনি।

"কিন্তু আপনি কি-না করতে পারেন মা লক্ষ্মী আমার; আপনি যদি বড়বাবুকে একবার—

"না, না, না—আপনি তাঁর কাছে যান; আমার করবার মতো শক্তি কিছু নেই। আমি কিছু করতে পারি না—" বৃদ্ধের কথা শেষ না হ'তেই অমলা কথাগুলি এক নিঃশ্বাসে বলে ঝটিতে বাড়ীর ভিতর চলে গিয়েছিল।

কালীচরণ বৃদ্ধকে বাইরে বাবুর জন্য অপেক্ষা করতে বলে কপাট বন্ধ করে দিয়েছিল।

অমলা বাড়ীর ভিতর এসে ঘরে খিল দিয়ে ভূলুণ্ঠিতা হ'য়ে

কাঁদতে সুরু করলেঃ 'একি! প্রভু, এ হতভাগীকে আবার পাপে জড়ালে কেন? কেন…কেন…! অমলার মতো ভাগ্যহীনা জগতে আর যে কেউ নেই; তা' তুমি জেনেও কেন আমাকে অপরাধী করলে? এ অপরাধের শাস্তি ভোগ থেকে আমি তো রেহাই পাব না প্রাণনাথ! দয়াময়…নারায়ণ তুমি,—তুমি তাকে সুবুদ্ধি দাও যাতে সে এই অবিচার অন্যায় না করে—"

এদিকে নরেন এসে পড়েছে। স্কোডা থেকে নেমেই সে লক্ষ্য করল যে, বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে আছে। সে বসবার ঘরে ঢুকেই সোফায় ধড়াস্ করে হাত পা ছড়িয়ে বসে পড়ল; কালীচরণ এসে পাখা খুলে দিলে। পরে বাবুর গা থেকে কোট খুলে নিয়ে আলনায় রাখলে। সে বাবুর পায়ের তলায় বসে জুতার ফিতে খুলতে সুরু করে দিলে

বৃদ্ধ বিনীত ভাবে হাতজোড় ক'রে ঘরে ঢুকতেই নরেন তাকে একবার অপাঙ্গে লক্ষ্য করে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলে। বৃদ্ধ অনুনয় বিনয় সহকারে আবেদন জানাল।

"না বাবা, কোনো কথা শুনতে চাই না আমি। আমি সব খবর পেয়েছি, আগের বাবুদের তোমরা মোটা মোটা খাইয়েছ।" একটু থেমে গলার স্বর পাল্‌টিয়ে বললে নরেনঃ "আর দেবেই বা না কেন? ও থেকে তোমারা রোজগার কর নেহাৎ তো আর কম নয়। তিন শ'টি টাকা নিয়ে কাল অফিসে যেও, আর তা' না হ'লে ওমুখে আর যেওনা—"

বৃদ্ধ আরও কয়েকবার চেষ্টা করল রেহাই পাবার জন্য, কিন্তু বৃথা সে চেষ্টা!

"এখন আমার টা-কা-আ চাই; এই আমার শেষ কথা। তোমার সঙ্গে আর বেশী বকতে পারব না—" বলে নরেন বাড়ীর ভিতর চলে গেল।

নরেনের এখন টাকা চাই। কেন না এখন সে পায়ে হেঁটে বেলেঘাটা থেকে আপিস যায় না। এখন সে পেট্রল পুড়িয়ে মোটর হাঁকিয়ে পথে ধূলো উড়িয়ে যায়; আর তা' যেতে গেলে তেল পোড়ে। অতএব এখন টাকা ছাড়া অন্য কিছু ভাবনা আনতে পারে না। সে এখন সাড়ে তিনশ' টাকা বেতনের বড়বাবু। আর সেই জন্যই টাকা আরও বেশী করে চাই।

নরেন বাড়ীর ভিতর এসে কল-ঘরে ঢুকল। সেখান থেকে সে না বেরোনো পর্য্যন্ত অমলা ইতস্ততঃ অস্বস্তিকর ভাবে পায়চারী করতে করতে মতলব আঁটতে লাগল মনে মনে—কি ক'রে স্বামীকে এই অন্যায় কাজ থেকে নিবৃত্তি করা যায়।

পায়জামা-স্যাণ্ডোর মধ্যে নিজেকে আচ্ছাদিত করে মাথাটা তোয়ালে দিয়ে মুছতে মুছতে ঘরের ভিতর গেল নরেন। তোয়ালেটা চেয়ারে রেখে খানিকটা হেয়ার ক্রীম হাতে নিয়ে মাথায় মাখল। অমলা বাইরে থেকে সব লক্ষ্য করল। ভাবল,—এবার মাথা ঠাণ্ডা হোয়েছে, অনুরোধ করলে রাখলে রাখতেও পারে তার কথাটা। মাথা আঁচড়ান শেষ করে নরেন যেই পিছু

ফিরেছে, অমলা জল খাবারের থালা নিয়ে ঘরে ঢুকল। তার ইচ্ছা স্বামীকে সর্ব্বতোভাবে সুস্থ করে তবে সে অনুরোধ করবে—বৃদ্ধকে যাতে রেহাই দেয়।

সে নরেনের পথরোধ করে দাঁড়াল প্রথমে; পরে গ্লাসটা রাখল টেবিলে—হাতটা একটু বাড়িয়ে। ঘুর্ণায়মান চেয়ারটার মুখ ঘুরিয়ে বললে: "বস। জল খেয়ে তবে বাইরে যাও—" বলে সে থালাটা নিজে হাতে ধরেই দাঁড়িয়ে রইল; ইচ্ছা যে তার হাত থেকে নিয়েই খাক নরেন।

নরেন একবার অমলার মুখপানে চেয়ে বসে পড়ল চেয়ারটায়। বিনা আপত্তিতে সে তার হাতের থালা থেকে খাবারগুলো একটা একটা করে শেষ করলে। খাবার শেষ হ'তেই জলের গ্লাসটা পর্য্যন্ত তার হাতে ধরিয়ে দিলে অমলা।···তোয়ালেয় মুখ মুছে উঠি উঠি করছে, এমন সময় নরেনের হাত দুটো চেপে ধরল অমলা। কয়েক মুহূর্ত্তে উভয়ে উভয়ের মুখের দিকে চেয়ে রইল।

"একটি কথা রাখবে?" সকাতরে অমলা তার স্বামীর কাছে প্রার্থনা করল: "জীবনে কোনো দিন আর কিছু চাইব না তা' হ'লে, দোহাই—" বলে সে নরেনের মুখের দিকে চেয়ে রইল—তার চোখ মুখে প্রাণের সমস্ত কারুণ্যটুকু টেনে এনে।

"অভিনয় করবার সময় নেই আমার; যা' বলবার তাড়াতাড়ি বলে ফেল—" স্বভাবসিদ্ধ রুক্ষস্বরে ও অমলার প্রতি তাচ্ছিল্য দেখিয়ে বললে নরেন।

"ঈশ্বর তোমার কোনো দিন কিছুর অভাব রাখবেন না এ আমি জোর করে বলছি; শুধু তুমি কারো মনে কষ্ট দিয়ে টাকা কড়ি নিও না, সে টাকা ভোগে সয় না"—

জ্যা-মুক্ত ধনুকের মতো ছিটকে নরেন চেয়ার থেকে উঠে পড়ল। পড়ে সে এমন ভাবে চক্ষু রক্তবর্ণ করে তাকাল স্ত্রীর প্রতি, তাতে অমলা মনে করল—তাকে বুঝি তুলে আছাড় মারবে। তবু সে স্বামীর হাত দুটো চেপে ধরে থাকল উত্তরের আশায়। নরেন সজোরে হাত দুটো ছিনিয়ে নিয়ে বেড়িয়ে গেল ঘর থেকে। অমলাও ত্বরিৎ পদে কিছুদূর স্বামীর পশ্চাদানুসরণ করতে করতে আকুল ভাবে শেষ বার চেষ্টা করল – "রাখবে না কথাটা, রাখবে না—"

নরেন স-শব্দে বাড়ীর ভিতরের দিকের দরজাটা বন্ধ করে খিল লাগিয়ে দিলে। দিয়ে বাইরের ঘরে গিয়ে সোফায় বসে চুরুট ধরাল।

বৃদ্ধ পূর্ব্বে যেখানে বসে ছিল ঠিক সেইখানেই বসে আছে, নিরাশ হ'য়ে।

"তা' হ'লে বাবু –" বৃদ্ধ হাত ঘষতে ঘষতে নরেনের মুখের দিকে তাকাল।

"তা' হ'লে আর কি ?···যা' বলেছি তাই। তুমি যে এখনও টাকার চেষ্টায় না বেড়িয়ে এখানে বসে আছো কেন, তাই আমি ভাবছি—" বলে নরেন বড়লোকী চালে চুরুট টানতে লাগল।

বৃদ্ধ নিরুপায় হ'য়ে তার শেষ বক্তব্যটুকু জানাল: "বাবু, আপনি যখন অন্নদাতা, তখন একটা সত্য কথা বলছি—" বলে বৃদ্ধ

নরেনের মুখের দিকে একবার চেয়ে নিয়ে কি যেন একটু চিন্তা করল; পরে তার স্বভাবসিদ্ধ টানাস্বরে বললে,—"বলছিলাম কি, এই—শ' দুই অড়াই টাকা জোগাড় করতে পারি উপস্থিত, আমার পুত্র বধূদের গায়ের গয়ণা খুলে বন্ধক দিয়ে; বক্রী টাকা পরের মাসের মাইনে পেয়ে দিলে হ'বে কি?" উত্তরের আশায় বৃদ্ধ বিনীত ভাবে চেয়ে রইল তার বড় বাবুর মুখের দিকে।

নরেন যেন মস্তবড় একটা সামস্যার সম্মুখীন হয়েছে, এই রকম ভাব মুখের 'পর টেনে এনে খানিকক্ষণ চিন্তা করতে লাগল ঘন ঘন চুরুটটা টানতে টানতে। "হ্যাণ্ডনোটের মতো কিছু একটা লিখে দিলে—" বৃদ্ধের দিকে না তাকিয়ে স্বল্প কথায় নরেন জবাব দিলে।

বৃদ্ধ আর দ্বিরুক্তি করলে না। করজোড়ে বড় বাবুকে প্রণাম করে ঘর থেকে বেড়িয়ে গেল।

চার দিন পর।

সন্ধ্যা হ'তে তখনও কিছু বাকী আছে। রান্নাঘরের চাতালে একটা পিঁড়ির 'পর বসে অমলা পরটা বেলছে।···মাঝে মাঝে পিটটা যখন সোজা করবার জন্য মুখ তুলছে, তখন তাকে দেখলে পরে সহজে অনুমান করা যেত যে, ও অন্তরে একটা অসহ্য যন্ত্রনা চেপে আছে। প্রাণপণে চেস্টা করছে তার অসুস্থ্যটা কেউ যাতে জানতে না পারে। আত্মীয় স্বজনের স্নেহ ভালোবাসা সেবা-যত্ন বঞ্চিত অসহায় প্রবাসী যেমন জীবনের যত দুঃখ কষ্ট মুখ বুজে সহ্য করে,

সে ব্যক্তি নীরবে তা সহ্য করে এই জন্য যে, তার ভাষা কেউ বুঝবে না; তার মুখ দেখে প্রাণের ব্যথা বেদনা অন্তর দিয়ে অনুভব করবার মতো দরদী সাথী নেই, চোখের ভাষা বোঝবার মতো মরমী বন্ধুর অভাব বলে,—ঠিক সেই রকম অমলাও তার দেহের মনের সমস্ত জ্বালা ঠোঁটে ঠোঁট চেপে সহ্য করে।····

হঠাৎ···অমলা একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ করে ধরাশায়ী হ'লো। সে কাটা-ছাগলের মতো ছট্‌ফট্ করতে লাগল, একটা অব্যক্ত যন্ত্রণায়। অনতি দূরে বসে কালীচরণ মসলা পিস্‌ছিল। অমলার অবস্থা দেখেই সে আকুল স্বরে চীৎকার করে উঠলঃ "বাবু শীগ্‌গীর আসুন, আসুন—মা কেমন হ'য়ে গ্যাচে—" বলে সে ছুটো-ছুটী আরম্ভ করে দিল। নরেন ঘরের মধ্যেই ছিল। কালীচরণের ডাক শুনে ছুটে বেড়িয়ে এল ঘর থেকে।

অমলা যে অবস্থায় ছট্ ফট্ করছিল তা' দেখলে পাষাণেরও প্রাণ গলে যেতো। সেই জন্যই বোধ হয় ক্ষণিকের জন্য নরেনের অন্তর দ্রবীভূত হ'য়ে তাকে করে তুলল অধীর।

"ওরে কেলো—মেঝেয় একটা বিছানা পাত, পাত—" বলে নরেন হাঁটু গেরে বসে অমলার একটা হাত নিয়ে ঘন ঘন ঝাঁকুনি দিতে দিতে ব্যথিত স্বরে ডাকতে লাগল ঃ "অমলা, অমলা ও অমল, কি হ'য়েছে ? কি হ'য়েছে তোমার—

অমলা পূর্ব্বের মতোই ছট্ ফট্ করছে। এখন আবার আরম্ভ হ'ল দরবিগলিত ধারে অশ্রু ঝরতে। নরেন অতি সন্তর্পনে

তাকে বুকে করে তুলে নিয়ে এসে ঘরের বিছানায় শুইয়ে দিলে। সে ভুলে গেল যে, ডাক্তার ডাকা আশু প্রয়োজন। টেবিলের কাছে গিয়ে একটুকরো কাগজে কি লিখলে; তার পর সেখানা কালীচরণকে দিয়ে ব্যস্ত ভাবে বললেঃ "ট্যাক্সি ভাড়া করে যা শীগ্গীর নিমাই বাবুর কছে, ড্রাইভারকে খুব জোরে গাড়ী চালাতে বলবি—"

কালীচরণ চলে যেতেই নরেন অস্থির হ'য়ে পড়ল দুর্ভাবনায়। সে অন্তরে অন্তরে নিমাইকে ভয় করে। সে ভাবতে লাগল, নিমাই এসে হয়ত অমলার এই অবস্থার জন্য তাকেই দায়ী করবে। হয়ত এও ভাবতে পারে যে, সে অমলাকে বিষ খাইয়েছে, কিংবা মার-ধোর করেছে। এই সব ভাবতে ভাবতে সে ঘেমে কাদা হ'য়ে যেতে লাগল। কারণ, সে জানে যে, অমলার প্রতি তার ব্যবহার নিমাইয়ের জানতে বাকী নেই।

কিছুক্ষণের মধ্যেই নিমাই এসে হাজির হ'ল। তার পরনের কাপড় কোমরে বাঁধা, গায়ে গেঞ্জি কাঁধের 'পর ভিজে একটা তোয়ালে। এই অবস্থায় আসবার কারণ, সে যখন হাত মুখ ধুয়ে তোয়ালেটা দিয়ে মুখ মুছিছল, ঠিক সেই সময়ে কালীচরণ গিয়ে হাজির। নরেনের চিঠি আর কালীচরণের ব্যাকুল বর্ণনা শুনে সে যে অবস্থায় ছিল সেই অবস্থাতেই বেড়িয়ে পরেছে।

"কি হয়েছে—", উদ্গ্রীব হ'য়ে ঘরে ঢোকবার আগেই নিমাই প্রশ্ন করল।

নরেন কিছু বলবার আগেই, নিমাইয়ের গলার স্বর অমলা

বুঝতে পেরে: "দাদা—মরে গেলাম, প্রাণ বেড়িয়ে গেল—" বলে এমন ভাবে ধেরেমেরে ওঠবার চেষ্টা করল, যেন নিমাই তার একমাত্র মরমী বন্ধু, তাকে জ্বালা জানাতে পারলেই সব যন্ত্রণার নিরসন হয়ে যাবে এক্ষুণি!

নরেনের আত্মা খাঁচা ছাড়া হ'য়ে গিয়েছিল; ঢোঁক গিলে গিলে নিমাইয়ের দু' একটা প্রশ্নের জবাব দিলে। পরে নিজের দোষ ক্ষালণের জন্য তাড়াতাড়ি বললে: "হবে না? কোনো দিন খাবে, কোনো দিন খাবে না। না খেয়ে থাকলে ওরকম রোগ হওয়াই স্বাভাবিক—" বলে নরেন লুকিয়ে নিমাইকে একবার দেখে নিলে; তার মুখের ভাবটা কি রকম।

"না খেলে ওদের কিছু হয় না, নরেন—" নিমাই ব্যথিত স্বরে বলতে লাগল: "ওরা গরীব, না খেয়ে হয় তো জীবনের অনেক দিনই কাটিয়েছে। অন্তরে এমন কিছু একটা আঘাত ও পেয়েছে, যার জন্য আজ এই যন্ত্রণা ভোগ করছে—"

ডাক্তার দেখানোর কোনো ব্যবস্থা তখনও হয়নি দেখে নিমাই ছুটল তার পরিচিত নাম-করা এক ডাক্তারের কাছে।

তিনটি সপ্তাহ অমলার একই অবস্থায় কাটল। না বাঁচার সম্ভাবনাই অধিক। চিকিৎসা, শুশ্রূষা কোনো কিছুরই ত্রুটি হ'তে দেয়নি নিমাই। ডাক্তার পরামর্শ দিলেন স্বতন্ত্র ভাবে ব্যবস্থা করে হাসপাতালে ভর্ত্তি করবার।

অমলা এখন হাসপাতালে জীবন্মৃতাবস্থায় রোগ যন্ত্রণা ভোগ করছে।

—পনের—

ক্লাইভ ষ্ট্রীটে বিরাট একটা প্রাসাদের তিন তলার উপর নিমাইয়ের অফিস। প্রবেশ দ্বারের এক পাশে ভোজপুরী দরোয়ান নিশ্চিন্ত মনে ঢুলু ঢুল নেত্রে গোঁফ পাকাচ্ছে। সম্মুখেই লিফ্‌ট্‌। ঘোর লাল রং-এর ইউনিফর্ম্ম পরিহিত লিফ্‌ট্‌-ম্যান এক হাতে সুইচ অন্য হাতে গেট্‌-লক ধরে কাষ্ঠ নির্ম্মিত মূর্ত্তির মতো নিস্পন্দ হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে। একটা গেঁও লোককে ওই লিফ্‌টের সামনে যদি দাঁড় করিয়ে দেওয়া যায়, তবে হয়ত সে লিফ্‌ট্‌ম্যানটাকে ভগবান বলে তার পা জাপটিয়ে ধরবে! কেননা লিফ্‌ট্‌ম্যানটা নড়ছে না চড়ছে না অথচ শোঁ করে উপরে উঠে যাচ্ছে আবার নেমে পড়ছে তেমনি ভাবে, অথচ কোনো কল কব্জার সঙ্গে সম্পর্ক নেই!···· বাইরের ফুট পাতে একটা অল্প বয়স্ক যুবক দাঁড়িয়ে দেখছে সাহেব ও বাবুদের যাতায়াত।····সে হয় তো মনে মনে ভাবছে ওই সব অফিসে যারা চাকরী করে না-জানি তারা কতই সুখী! কত জন্মের পুণ্যের ফলে তবে এখানে একটা চেয়ার পাওয়া যায়।····পথের

পাশে সারবন্দী রং বে-রং ও নানা ধরণের মোটর দাঁড়িয়ে আছে। তারই মাঝখানে একটা সতরঞ্চ বিছিয়ে চারজন সোফার তাস পিটছে।···সাহেব, বাবু, ব্রোকার, ইত্যাদির গট্ গট্ মস্‌মসানিতে ধরণী প্রকম্পিত।··· এই বিশ্বভরা বিরাট তামাসার নীরব দর্শক যে সে যদি ধাপার মাঠে গিয়ে থাকে, তবে সেখানকার পর্শ্বচরেদের সঙ্গে এই কলিকাতা নগরীর শ্রেষ্ঠ ব্যবসা কেন্দ্রের সঙ্গে কিছু মাত্র তফাৎ দেখতে পাবে না!····

এই অফিস গেটের এক পাশে একটি বৃদ্ধ ও তার সঙ্গী স-সঙ্কোচে দাঁড়িয়ে আছে; দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বোধ হয় কাণ্ডকারখানা দেখছে।··· বৃদ্ধের মাথার চুল, গোঁফ, ভ্রূ সব পেকে একেবারে শোন-এর মতো হয়ে গিয়েছে। গায়ের রং শ্যাম বর্ণ; দাড়ি কামানো, গোঁফ ছাঁটা। অতিরিক্ত বৃদ্ধ হয়ে গেলেও মুখে টোল টাল বেশী পারেনি। তবে চোখের নীচে মাংস ঢিলে হয়ে ঝুলে পড়েছে; গলার চামড়াও লোল। বৃদ্ধকে দেখলেই বোঝা যায় যে, সে আপাততঃ কি একটা দুঃশ্চিন্তায় মগ্ন ব'লে তার অন্তরে অন্তরে কিসের যেন একটা দ্বন্দ্ব চলছে; তারই ভাব চোখে মুখে সুপরিস্ফুট। মাথা নত করে মাঝে মাঝে নাক খোঁটবার মতো তর্জ্জনীতে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ সংযোগ করে নাকের কাছে নিয়ে যাচ্ছে।···সামনে এক শ্বেতাঙ্গী তরুণী এসে দাঁড়াতেই বৃদ্ধ তার সঙ্কোচের সীমা শেষ করে প্রায় দু' হাত পিছিয়ে গেল, যেতেই বেচারার মাথাটা দেওয়ালে গেল ঠুকে!···বৃদ্ধ একবার করে তরুণীটির প্রতি তাকাচ্ছে আর নাসিকা

মুখ করছে কুঞ্চিত। তার কারণ, শ্বেতাঙ্গীটি সর্ট-সামার গাউনের মধ্যে আছে। গাউনটির ছাঁট কাট একেবারে আলট্রা মডার্ণ। নীচে উরু পর্য্যন্ত নেমেছে গাউনটি; আর ওপরের ভাগটা স্তনাগ্র-চূড়াযুগলে আটকে আছে। একেবারে নগ্ন বললেই হয়।··· কুচযুগ মাঝে পিবর 'পর মতিমালার লকেটটি লুটিয়ে পড়ে আছে। রাজ পথে অর্দ্ধোলঙ্গ নারী মূর্ত্তি পাশ্চাত্যের দৃষ্টিতে রুচিকর হ'লেও এই মনু পরাশরের জন্ম স্থানে শুধু অদর্শনীয়ই নয়, হঠাৎ দৃষ্টিপথে পতিত হ'লে পণ্ডিতদের কাছে প্রায়শ্চিত্তের মতো একটা কিছুর বিধান দ্বারা চক্ষু শুদ্ধি করলে তবে বোধ হয় পবিত্র হওয়া যায়।··· মেম সাব নতমুখে তাঁর নখাগ্র খুঁটছিলেন—লিফ্‌ট্‌ আসতেই উঠে গেল। বৃদ্ধ যেন বাঁচল হাঁফ ছেড়ে।

বৃদ্ধ অপেক্ষা করছিল নিমাইয়ের। সে নেমে আসতেই নমস্কার আদান প্রদান হ'ল। পরে নিমাই ব্যস্ত ভাবে বললে। "হয় বাসায় চলুন; নয় তো আমাদের আপিসের ওপরে রেষ্টরাঁতে গিয়ে জলযোগ করতে হবে—"

"হেঁ হেঁ বাবা—" নিমাইয়ের অনুরোধের সম্মান রেখে বৃদ্ধ বলতে লাগল: "তোমার বাসায় যেতে গেলে ষ্টীমার ফেল হ'য়ে যাবে; আর জানই তো বাবা আমি সেকেলে বুড়ো বামুন, পথে ঘাটে খাই না—" গলার স্বর সহজতম করে বললে,—"খাব খাব; খাবার সময় অনেক পাওয়া যাবে পরে। আমি আজ শুধু এসেছি তোমায় নেমন্তন্ন করতে। বাবা আমার, মনে কিছু কোরো না; আজ আমি

তোমায় নেমন্তন্ন করেই চলে যাব, মনে কিছু কোরো না। হেঁ, হেঁ—” বলে বৃদ্ধ মুখে হাসির ভাব টেনে এনে ঘাড়-নাড়তে লাগল।

“আপনি তো চাঁদপাল ঘাটে ষ্টীমারে চাপবেন—” নিমাই জানতে চাইলে।

“হ্যাঁ, বাবা আমার—” বলে বৃদ্ধ নিমাইকে এক চোখ দেখে নিলেঃ “হ্যাঁ, ওই খানেই চাপবো—”

“তা' হ'লে চলুন ইডেন বাগানে বসে কথা সাড়া যাবে; ষ্টীমারের এখনও দেরী আছে—” নিমাই হাত-ঘড়ি দেখে বললে।

“তাই চল, বাবা আমার; তাই চল—” বৃদ্ধ সামনের দিকে একটু ঝুঁকে প'ড়ে গুর্ গুর্ করে হাঁটতে লাগল নিমাইয়ের পাশে পাশে।

ইডেন গার্ডেনের উত্তর-পশ্চিম কোণে একটা নির্জ্জন স্থানে এসে বসল তিন জনে। বৃদ্ধের মনে এখনও দ্বন্দ্ব চলছে। ভাবটা এই—যে-উদ্দেশ্যে সে এসেছে নিমাইয়ের কাছে, সেটার সফলতা নির্ভর করছে নিমাইয়ের মতামতের উপর। পোষ্ট কার্ডের মতো একটা জিনিষ পকেট থেকে বা'র করে কাগজের মোড়কটা খুললে বৃদ্ধ; খুলে নিমাইয়ের হাতে দিলেঃ “এই দ্যাখো বাবা, মা আমার দেখতে শুনতে সব দিক দিয়েই ভালো, তবে কিনা বাবা লেখাপড়া বেশী শেখাতে পারিনি—” বৃদ্ধের স্বরে অনুশোচনা।

নিমাই কিছুক্ষণ ধরে ছবিটি দেখে নীরবে বৃদ্ধের হাতে ফিরিয়ে

দিলে।···বৃদ্ধ নিমাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়েই একটু বিব্রত হ'য়ে পড়ল; সে মনের মধ্যে এই আঁচ করে নিলে—নিমাইয়ের হয়ত মেয়ে পছন্দ হয়নি।

"বাবা, এই গরীব বৃদ্ধ বামুনকে উদ্ধার করো; আমার ভাগিনীটিকে নিয়ে। কন্যাদায়ের চেয়েও বাড়া, বাবা—" বৃদ্ধ ব্যস্তভাবে বললে। একটু থেমে নিশ্চয়তার স্বরে বললে আরো: "মা আমার সেবা-যত্ন দিয়ে তোমাকে সন্তুষ্ট করতে পারবে একথা আমি আগে থেকেই বলে রাখছি। মা আমার লক্ষ্মী স্বরূপা।—" বৃদ্ধের গলার স্বর আদ্র হ'য়ে উঠল।

নিমাই বসে চিন্তা করতে লাগল নীরবে। কেননা সে ছবিটা দেখে ততটা সন্তুষ্ট হ'তে পারেনি, যতটা সে আগে আশা করেছিল মেয়ের বর্ণনা শুনে। তা' ছাড়া মেয়ের রং চুল ইত্যাদি তো আর ছবি দেখে অনুমান করা যায় না। সেই জন্য সে বৃদ্ধকে কোনো আশা ভরসা দিতে ইতঃস্তত করছিল। বৃদ্ধ ঘন ঘন তার দিকে তাকাচ্ছিল, এই বুঝি প্রত্যাখাত হ'তে হয়!

"মেয়েকে সামনে আমি না দেখে এখন কিছু বলতে পারি না—" নিমাই বললে: বৃদ্ধকে খুব বিচলিত হ'তে দেখে; সে ঈষৎ আশ্বস্ত করে বললে আবার: "ছবিতে যা দেখছি তাতে না পছন্দ হবার মতো কিছু দেখছি না; আপনি ভাববেন না বেশী; হ'বার হোলে ঠিক হ'য়ে যাবে—"

"তা' হ'লে বাবা, তুমি কবে যাচ্ছ?" বিনীত ভাবে বলে বৃদ্ধ নিমাইয়ের প্রতি সকাতরে তাকিয়ে রইল।

"পরশু—" নিমাই যাবার প্রতিশ্রুতি দিলে।

"ঠিক তো বাবা? আমি তা' হ'লে সব ঠিক করে রাখবো—" বৃদ্ধ নিমাইকে একবার ভেবে দেখবার অবকাশ দিলে; এমন কোনো কাজ তার হাতে আছে কিনা যার জন্য তার যাওয়ায় বিঘ্ন ঘটতে পারে।

"আমি যখন কথা দিচ্ছি, তখন যাবই; শত কাজ ফেলে রেখেও—" নিমাইয়ের যাওয়া সম্পর্কে নিশ্চিন্ত থাকবার জন্য সে দৃঢ়তা সহকারে বললে।

বৃদ্ধ নিমাইয়ের প্রতিশ্রুতিতে কৃতার্থত হ'ল যেন। তাদের কিছুদূর এগিয়ে দিয়ে এসে বাগানের একটা গাছ তলায় বেঞ্চের 'পর বসল নিমাই।···বিবাহ আসন্ন—এই কথাটাই সে বার বার ভাবতে লাগল; বিবাহ! সে ভাবল, জীবনের একটা পট-পরিবর্ত্তন? জীবনটাকে ঢেলে নতুন করে সাজতে হ'বে! সে-অবস্থা সাথে ক'রে কি নিয়ে আসছে—ভাবতেও ভাল লাগে। হয়ত ব শিহরণও জাগে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে সর্ব্বাঙ্গে। অভিমান···বিরহ··· ক্ষণিক বিচ্ছেদ···আলিঙ্গন···চুম্বন···অনাগত একটি জীবের স্বপ্ন—চিন্তায় আত্মহারা হ'য়ে পরতে হয়!···মন তখন মাটীর পৃথিবীতে থাকে না; সে বিচরণ করে কোনো এক কল্পলোকে।···সেখানে থাকে শুধু মিলন···আর চুম্বন; আর কিচ্ছু নয়।···নিমাই বসে দেখতে

লাগল—খালটার ওপাড়ে বসে একটী যুবক বাঁশী বাজাচ্ছে। আশে পাশে মেয়ে আসলে সে কসরত দেখাবার চেষ্টা করছে আপ্রাণ। এ পাড়ে কয়েকটা ফাজিল ছোক্‌রা সহাস্যে পাকাচ্ছে গুলতন; তাদেরই মাঝ থেকে একজন গান ধরেছে—'এ পথে আজ এস প্রিয়া করো না আর ভুল; এ-পথে আজ, এ-পথে আজ'—যেমন ফাটা রেকর্ডের একটা ঘাটে পিন্ পড়ে গেলে একই কথার বারে বারে আওয়াজ হয়, ঠিক সেই ভাবে ছোক্‌রা একই কথার পুনরাবৃত্তি করতে লাগল।...অন্যদিকে কয়েকটি তরুণ রুমাল বিছিয়ে বাদাম ভাজা খাচ্ছে। তাদের পাশ দিয়ে তিনটি তরুণী হন্ হন্ করে চলে গেল গল্প করতে করতে। একটী তরুণ ঘাড় বেঁকিয়ে ঠোঁট ফাঁক ক'রে তাদের গতিপথ লক্ষ্য করতে লাগল, অপরটি ফেটে পড়ল হাসিতে। 'কিন্তু নিষ্ঠুরা তরুণীত্রয় একবার ফিরেও তাকালেন না।...এই উভয় জাতির ইতঃস্ততঃ ত্বরিৎ গতিতে যাতায়াত, এদিক সেদিক চলিত-চোখের-চকিত-চাহণী প্রভৃতি দেখলে মনে হয়—পরস্পর আকর্ষণোন্মুখ দু'টো শক্তি এদের নাকে দড়ি দিয়ে ছুট কাটিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে যেন!...এদের উদ্দেশ্য বাহ্যতঃ হয় ত ভ্রমণ; কিন্তু অন্তরের আসল উদ্দেশ্যটি অতি-আদিম। আরও যে জিনিষটি মনে হয়, সে জিনিষটি হ'চ্ছে—এই অনন্ত কাহিনীর এমন একটী অধ্যায় অবির্ভাব হ'য়েছে, যেখানে মানুষ হয়ে পড়েছে বাহ্যাড়ম্বরের যন্ত্র বিশেষ;...তার ব্যক্তিত্বকে বিক্রীত করেছে অন্তঃসারশূন্য জাঁকজমকের পদপ্রান্তে।

নিমাই দু' পয়সার চানাচুর ভাজা কিনলে— কলিকাতাবাসীদের প্রায় লোকের কাছে পরিচিত ভদ্রলোকটীর কাছ থেকে, যিনি বিক্রি করেন, ভারী গলায় সুর করে 'চানাচুর গরম, এই বাদামের নকুল দানা, কুর্‌মুর্‌ ভাজা, এই নারকলের চিঁড়ে, মনোহর ঘুগ্‌ণী'— বলে বলে। সে চানাচুর খেতে খেতে লক্ষ্য করল অনতিদূর দিয়ে এক ভদ্রলোক স-স্ত্রীক ভ্রমণ করছে; ভদ্রলোকের বুকে একটী দুগ্ধপোষ্য শিশু, হাতে একটী বছর চারেকের বালক, আর তাঁর পশ্চাতে স্ত্রীর কাঁকালে বছর দু'য়েকের একটী কন্যা অতি কষ্টে বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে— তা' দেখলে সত্যই করুণার উদ্রেক হয়! বেড়াতে বেড়িয়েছে কি মোট বইতে বেড়িয়েছে তা' ওরাই জানে! স্ত্রীর হাত ধরে বেড়াতে বেরুলে যে ছেলে-পেলেদের ঝি বা আয়ার কাছে রেখে আসতে হয়, একথাটা আজও ওরা জানে না বোধ হয়।.... নিমাই একটা দৃশ্য দেখে হেসে ফেললে,—ভদ্রলোকের স্ত্রীটির পদযুগলে যে বিলিতি ধরণের স্লিপার আছে, তার একটা ষ্ট্র্যাপ্‌ ছিঁড়ে গিয়েছে ব'লে সেটাকে বেঁধেছে একটা লাল পাড়ছেঁড়া দিয়ে; যদি কালো রং-এর পাড় দিয়েও বাঁধত, তবে জুতোর রংয়ের সঙ্গে মিশে সাধারণের দৃষ্টি থেকে এড়াত। যে-ই এই সঙ দু'টিকে দেখছে সে-ই মুখে রুমাল চাপা দিয়ে একটু হেঁসে নিচ্ছে।....তারা বাগান থেকে বেড়িয়ে আউটরাম ঘাটে যাবার জন্য যখন রাস্তা অতিক্রম করবার উদ্যোগ করছে, তখন মহিলাটি হাঁ করে চেয়ে আছে—পোর্ট কমিশনারের লাইন দিয়ে একটা মাল-গাড়ী ঝ্যাক্‌ ঝ্যাক্‌ করে যাচ্ছে,

সেই দিকে। এমন সময় এক মেম সাহেব কঁ্যা—করে টু-সীটেড্ অষ্টিন খানার ব্রেক কসল একেবারে তাদের পিছনে। লাঠির আঘাত খেয়ে সাপ যেমন সঙ্কুচিত হয়ে যায়, তেমনি ভাব হ'য়ে ভদ্রলোক মহিলাটিকে পাঁচ হাত পিছুতে টেনে নিয়ে এল। মেম সাহেব লাল ঠোঁট দু'টি ঈষৎ ফাঁক কোরে দাঁতে দাঁত চেপে একটু খুচরো হাঁসির নমুনা দেখিয়ে ভোঁ কোরে বেড়িয়ে গেল ঠিক সেই রকম,—যেমন চাল্লুস ছেলে হঠাৎ সাইকেলের ব্রেক কসে আবার তখনই হেলতে তুলতে পিছন দিকের কাপড় ঠিক করতে করতে যায়!....

"কি রে একলা বসে আছিস—" পিছু দিক থেকে বলে নিমাইয়ের সামনে এসে দাঁড়াল এক ভদ্রলোক।

ভদ্রলোকটীর চাল-চলন, হাব-ভাব, কথাবার্ত্তা, পোষাক পরিচ্ছদ দেখলে ও শুনলে একটা জিনিষ স্বতই প্রমাণিত হয় যে, সাধারণের মধ্যেও একটী দর্শনীয় স্বাতন্ত্র বজায় রাখতে সমর্থ হ'য়েছে। যা' নকল করতে হ'লে শুধু দেহের বাইরেটা বদলালে হ'বে না, ভিতরটার সমস্ত জঞ্জাল সাফ করে ফেলতে হ'বে। পরনে কিন্তু সাধারণ পোষাক—ধূতি-সার্ট আর নিউকাট সেলিম সু। লম্বা, দোহারা চেহারা; রংটি গৌর বর্ণ বলা যায় না, কিন্তু উজ্জ্বল। মুখের ভাব লম্বা ধরণের, ভ্রূ দুটি পরস্পরের সঙ্গে সন্নিবদ্ধ। মাথার চুল ছোট—তিন পাশ ক্লিপ দিয়ে ছাঁটা। নাকের সোজা সরু সিঁথি; ছোট চুলের মধ্যে সরু সিঁথিটা দেখলে মনে হ'বে ওটি যেন জন্মগত। যার মানুষ চেনবার মতো একটু ক্ষমতা আছে, সে এক

চোখ ওর প্রতি চেয়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হ'বে যে, আজকালকার 'বাদের' বন্যায় কোনো রকম মার্কামারা 'বাদী' হ'য়ে ভেসে যাবার ছেলে সে নয়; তীক্ষ্ণ বিচার শক্তি সে রাখে। আর সেটার সাক্ষ্য দেয় ওর ওই অন্তর্দর্শী চাহনীটি।

"আমি না হয় একলা ব'লে একা আছি, কিন্তু তুমি যে সঙ্গী ছাড়া হ'য়ে বেড়িয়েছ?" বলে নিমাই ঠোঁঠ দিয়ে হাসিটা চাপল।

"কি গো, দা'-ঠাকুরের আজকাল দর্শনই মেলে না যে—" বলতে বলতে শাঁখা-সিঁদুর-আলতা-লাল-পাড়-শাড়ীর মধ্যে অতি পরিচিত বাঙালী হিন্দু-ঘরের লক্ষ্মী-স্বরূপিনী একটা খাট্টু খট্টু বধূ এসে দাঁড়াল নিমাইয়ের সামনে। তার নাম মায়া; ভদ্রলোকটীর স্ত্রী।

নিমাই কোনো কথা না বলে তাড়াতাড়ি বেঞ্চ থেকে উঠে পড়ল। সে পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের 'পর ভর দিয়ে আউটরাম ঘাটের দিকে এমন ভাবে তাকাতে লাগল, যেন কাকে সে খুঁজছে। "আহা! কোথায় গেল—" আক্ষেপের স্বরে নিমাই বললে।

"কি! অমন করে দেখছ কি?" মায়া জানতে চাইলে।

নিমাই দেখছিল পুত্র-কন্যা-সহ সেই দম্পতিটিকে। "আরে ছ্যাৎ; আর একটু আগে আসতে হয়। এলে পরে দেখাতাম একটা মজার জিনিষ—" বলে নিমাই ব্যাপারটা বর্ণনা করে স-শব্দে হেসে ফেল্লে: "এই বেলা সাধ মিটিয়ে বেড়িয়ে টেরিয়ে নাও, মায়া। তা' নইলে হাতে কাঁকলে নিয়ে মাঠে কি লেকে বেড়াতে যাবে, তা'

সইতে পারব না ; পায়ে কাদা ছুঁড়বো শেষকালে কিন্তু—" বলে নিমাই যেই পিছু ফিরেছে অমনি আর একটী তরুণীকে দেখে সে অতি মাত্রায় সঙ্কুচিত হ'য়ে পড়ল।....তরুণীটি পিছুতে স-সঙ্কোচে দাঁড়িয়েছিল মুখে রুমাল চাপা দিয়ে। তার রূপ-লাবণ্য-শ্রী'র সঙ্গে যদি নারীর শ্রেষ্ঠ গুণগুলি থাকে, তবে জীবন-সঙ্গীনীরূপে তাকে যে পাবে, সে তার বহু যুগের তপস্যার ফলস্বরূপ বলেই মনে করবে।

"আমি তো এঁকে চিন্‌তে পারছি না, মায়া ?" তরুণীটি সম্বন্ধে জানতে চাইলে নিমাই।....সেখানে অন্তর্দ্দিষ্টি সম্পন্ন এমন কোনো লোক যদি থাকতেন এবং নিমাইয়ের অন্তরটা লক্ষ্য করতেন, তবে তিনি অনায়াসেই একটা জিনিষ ধরতে পারতেন যে, সে তরুণীটিকে শুধু চেনে নয়, কোনো কালে হারিয়ে ফেলে তার খোঁজে নিমাই যেন জন্মজন্মান্তর ধরে পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছে।....

"তা' আর চিন্‌বে কি ক'রে, তুমি তো ওকে এর আগে দেখনি। ও আমার খুড়তুতো বোন; চন্দননগরে বাড়ী—" মায়া জবাব দিলে।

গল্প করতে করতে চারজন প্যাগোডার উত্তরদিকের লনে এসে বসল। মায়া নিমাইকে অনুরোধ করল আজ তার বাড়ীতে যাবার জন্য। নিমাই বললে যে, সে আজ যেতে পারবে না, যদিও এমন বিশেষ কোনো কাজ নেই। সন্ধ্যা আসন্ন। বিশ্রামও যথেষ্ট হয়েছে দেখে তারা উঠে পড়ল।

"কাল তো শনিবার দেড়টায় ছুটি করে আমাদের ওখানে যাওয়া চাই কিন্তু—" মায়া অনুরোধ করল নিমাইকে যাবার জন্য।

নিমাই মুখে কোনো কথা বলতে পারলে না। সে তরুণীটির প্রতি একবার তাকিয়ে নিজের মনটাকে কোরে ফেল্লে গোলমেলে।... তখন যদি কেউ লক্ষ্য করতো তবে দেখতে পেত যে, সে মায়ার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেনি; করেছিল ওই দু'টি কালো চোখের এক চোখ চাহনীর নিমন্ত্রণ।

বিদায় অভিবাদনের পর নিমাই বাসার উদ্দেশে পা চালিয়ে দিলে।

"সান্যাল বাবু, মোটরে করে কে একজন এসেছেন আপনার সঙ্গে দেখা করতে; নীচেয় গাড়ীতে বসে আছেন, ড্রাইভার এসেছে আপনাকে ডাকতে—" মেসের সহবাসী এক ভদ্রলোক এসে খবর দিলে নিমাইকে।

নিমাই তখনও অফিসের পোষাক পাল্‌টিয়ে উঠতে পারেনি। সে একটুখানি চিন্তা করে নিলে—আগন্তুক কে হ'তে পারে। পিছু ফিরতেই দেখলে তার অফিসের বড়বাবুর ড্রাইভার দাঁড়িয়ে আছে। সে আর গায়ে শার্ট চড়ান দরকার বলে মনে করলে না। গেঞ্জির ওপর কোঁচার খুঁট গায়ে দিয়ে নীচে; নেমে গেল।

"বাবা নিমাই—" ব্যস্ত ভাবে বৃদ্ধ বড়বাবু মটর থেকে বেড়িয়ে এসে বলতে সুরু করলেন: "তোমাকে বাবা কাল বাইরে বেড়িয়ে

যেতে হ'বে; সেণ্ট্রাল বিহারে কাজ খুব বেড়ে গিয়েছে, মিষ্টার প্রসাদ টেলিগ্রাম করেছেন—তিনি একা ম্যানেজ করে উঠতে পারছেন না। বিস্‌নেস্ কন্‌সিডারেবল্‌ই হ্যাম্পার করছে। সাহেব বলছিলেন টেম্‌পোরারি একটা লোক এন্‌গেজ করতে; তাঁর ধারণা তুমি আপিস থেকে বাইরে গেলে এখানকার কাজের গোলমাল হ'তে পারে—কারণ তোমার নামটাই প্রথমে আমি করেছিলাম কিনা।···আমি বললাম,—আমার হাতের কাছে কাজ, যা' হোক করে সামলে নেব; কিন্তু নতুন লোক পাঠালে বিস্‌নেস্ ঠিক মতো নাও হ'তে পারে!···· বাবা, বুড়োর মুখ রক্ষা করে একটু কষ্ট ভোগ তোমাকে করতে হ'বে। আগামী কাল পাঞ্জাব মেল কিম্বা দিল্লী এক্‌স্‌প্রেসে তোমাকে বেড়িয়ে যেতেই হ'বে। সেইজন্য সাহেবের সঙ্গে এতক্ষণ ধরে পরামর্শ করে আমি নিজে তোমায় বলতে এসেছি—"

এক্ষেত্রে সম্মতি না দিয়ে পারে না নিমাই। দিতে যখন হ'বেই তখন সে সানন্দে সম্মতি দিলে।

"আমি সাহেবকে নিশ্চিন্ত করেই এসেছিলাম; কেননা আমি জানতাম তুমি আমার কথা রাখবেই—" বড় বাবু খুশীতে গদগদ হ'য়ে মোটরে চড়ে বস্‌লেন।

বড় বাবুর মোটরখানা বেড়িয়ে যেতেই নিমাই দাঁতে দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁটটা চেপে কিছুক্ষণ ধরে কি যেন চিন্তা করতে লাগল। যেন তার নিজের সমস্ত কর্ম্মসূচী হ'য়ে গেল ওলট পালট। পরে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সে ওপরে উঠে গেল।

—ষোল—

কোলকাতার দক্ষিণ সহরতলী অঞ্চল।

পনের বিশ বৎসর নয়; মাত্র দশটা বৎসর পূর্ব্বে যে কেহ এই স্থানে একবার এসে সহরতলীটির চেহারা যেরকম দেখেছিল, এখন সে যদি এখানে আসে, তবে সেরকম চেহারাটি দেখতে না পেয়ে অপরিসীম বিস্ময়ে হত বাক্ হ'য়ে সে এই কথাটাই ভাববে যে,—পূর্ব্বের চেহারাটি কর্পূরের মতো উবে গিয়েছে কি-না!··· পূর্ব্বে এই সব অঞ্চলে মুসলমান, পদ্মরাজ প্রভৃতি জাতির কৃষকরা পাঁচ টাকা খাজনায় পাঁচ বিঘা জমি নিয়ে চাষ বাস করে সুখে কাল কাটাত; কিন্তু এখন সে সমস্ত জমির প্রতি কাঠা একের পিঠে তিনটি শূন্য!···আগে এই সমস্ত অঞ্চলের বেশীর ভাগ স্থানই আম কাঁঠাল জাম দারু পেয়ারা যজ্ঞ ডুমুর সেওড়া প্রভৃতি গাছে জঙ্গলাকীর্ণ ছিল—আর তারই মাঝে মাঝে এখানকার আদি অধিবাসীরা জীবনের সত্যকার স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে বসবাস করত; একদিন তাদের পেটে ভাত না জুটলেও শুধু বিশুদ্ধ বায়ুর নিশ্বাস নিয়েই সবল থাকতে পারত, কিন্তু এখন এই সমস্ত স্থানকে গ্রাস করেছে সভ্যতার সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধা।····দেখলে ঠিক সেই রকম মনে হ'বে,—যেমন, বৈশাখ মাসে পশ্চিমাকাশে কাল-বৈশাখীর কাল মেঘ যখন দেখা দেয়,—তখন যদি কেউ মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে সেই মেঘ লক্ষ্য করে, তবে দেখতে পাবে যে, চোখের প্রতি পলকে পলকে

মেঘটা সমস্ত আকাশটাকে ছেয়ে ফেলছে। সেই কাল-মেঘের মতো একটা জিনিষ ছেয়ে ফেলছে এই সমস্ত স্থানকে! আগন্তুকটার বিস্ময় বিহ্বলতা যখন কেটে যাবে তখন সে প্রকৃতিস্থ হ'য়ে এই কথটাই ভাববে যে, সৃষ্টি একদিন বন-জঙ্গল-পর্ব্বত-নদীর মধ্যেই জন্ম নিয়েছিল—যেদিন সে ছিল প্রাণরসে পরিপূর্ণ। কিন্তু ক্রমবিবর্ত্তনের পথে খোলস ছাড়াতে ছাড়াতে এখন তার হাড়-গোড় বেড়িয়ে পড়েছে যেন!···এখন প্রস্তরময় জঙ্গল পৈশাচিক মূর্ত্তিতে স্বীয় প্রভাব বিস্তার করছে, প্রাণবান আদিম জঙ্গলকে নির্দ্দয় ভাবে ধ্বংস করে!··· সে ভাবতে ভাবতে কাষ্ঠবৎ হ'য়ে পড়বে এই জন্য যে, এই অনাদ্যনন্ত কালের জন্য যে-কাহিনীর সৃষ্টি হ'য়েছে, তার অপ্রকাশিত অধ্যায়গুলির অন্তরালে না-জানি আরও কত বিস্ময়ই লুকান আছে! তখন তার গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে জানতে ইচ্ছা হ'বে,—এই সমস্ত বিস্ময়গুলি একত্র করে উপভোগ করবার জন্য কেউ কি বেঁচে থাকবে না?···সঙ্গে সঙ্গে প্রতিধ্বনি হ'বে, না—না—না! এই 'না-না' শব্দে চকিতে ভরিয়ে তুলবে আকাশ, বাতাস, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড! সে তখন এমন এক মার্গে গিয়ে হাজির হবে, যেখানে সে শুধু শুনবে—না, না, না! কিচ্ছু না! যতক্ষণ আছো কেবল সবিস্ময় চাহনী দিয়ে দেখে যাও!···সে আত্মহারা হ'য়ে আবার প্রশ্ন করবে, 'কবে, কোথায়, কোন্‌খানে তোমার ঐ কাহিনী শেষ হ'বে?' এ প্রশ্নের উত্তর কেউ দেবে না!···শুধু বিশ্বব্রহ্মাণ্ড-জোড়া একটা নিস্তব্ধতা তার কাণে এসে বাজবে—বজ্র পতনের শব্দসম।···যখন

তার সম্মোহন ভাব কেটে যাবে এবং বস্তুর জগতে ফিরে আসবে, তখন সে আবার ভাববে,—এই প্রস্তরময় জঙ্গলে যে জন্তুরা বাস করে, তাদের আর যাই থাকুক, প্রাণ নেই। প্রস্তরের মতো প্রাণহীন, মৃত। কেবল ঘরোয়া নাটকের অভিনয় করে চলে।

এই অঞ্চলের একাংশে প্রাসাদোপম একটা অতি প্রাচীন বাড়ী দেখতে পাওয়া যাবে। জনমানবশূন্য বাড়ীটি ধ্বংসোন্মুখ। শেওলায় বিবর্ণ; মাঝে মাঝে অশ্বত্থ বট প্রভৃতি গাছ জন্মেছে। বাড়ীর সংযোগস্থলের-পতনোন্মুখ দুটি অংশ গাছগুলি তাদের শিকর দিয়ে জড়িয়ে কোনো রকমে খাড়া রাখতে সমর্থ হয়েছে যেন!···যেন কোনো এক পুণ্যাত্মার কীর্ত্তি-কলাপের প্রবিত্র স্মৃতি বজায় রাখাই তাদের জন্মের একমাত্র উদ্দেশ্য।···পূর্ব্বোক্ত আগন্তুকটী যদি এই বাড়ীটির সম্মুখে এসে দাঁড়ায় তবে তার চোখের উপর একটা জিনিষ বেশ সুপরিস্ফুট হ'য়ে উঠবে তখন, যখন সে এই বাড়ীটির সঙ্গে দূরে—ওই কলঅনির বাড়ীগুলির সঙ্গে তুলনা করবে। এইটেই তার প্রতীতি হ'বে যে, মানুষ তার ধ্যানে-ধারণায়, চিন্তায়-কল্পনায় কত ক্ষুদ্র হ'য়ে পড়েছে; বাস্তব প্রয়োজন মিটলেই সে খুশী, অন্তরের শাশ্বত সৌন্দর্য্য-বোধকে মহনীয় রূপে ফুটিয়ে তুলবার তার ধৈর্য্য নেই!···এই প্রাচীন স্থপতিশিল্পটি নিরীক্ষণ করলে সেকালের শিল্পী তথা লোকজনের বিরাট সংযগতার হদিস পেয়ে অন্তরের চিদবৃত্তি আপনা থেকেই হ'য়ে উঠে বিকশিত।···আর ওই কলঅনির স্থপতিগুলি কেবল লালসার উদগ্র অভিব্যক্তি; চোখ

মেলে দেখলে অন্তরে শুধু বাসানার আগুন দেয় জ্বালিয়ে!....
বাড়ীটির ভিতর পায়রা থাকবার যে কুঠুরি আছে, তা' ওই কলঅনির এক একটা বাড়ীর চেয়ে বড়। তা' হ'লেও এই বাড়ীর অপাততঃ মালিক যিনি তিনি ঠাঁই করে নিয়েছেন ওই কলঅনির মধ্যে; উদ্দেশ্য, নিজেদের বংশটাকে সভ্যতার রাঙে ঝালিয়ে নেবেন,—আশ্চর্য্য!....
এও হয় তো আবার মানুষের দোষগুণ কিছু নয়, সে এ কথাটাও ভাববে,—যিনি এই বিশ্বের স্রষ্টা তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এমন এক দুস্তোষনীয় প্রবৃত্তি দিয়ে, যার জন্য মানুষ যে-জিনিষ যখন যে-ভাবে পেলে, তাকে সে ঠিক তার পর-মূহুর্ত্তেই পেতে চায় অন্য রকম; নূতন করে!...মানুষের এই প্রবৃত্তিই একদিকে যেমন বস্তুর অবাস্তবতার প্রমাণ দেয়, অন্যদিকে তেমনি স্থিতিশীলতার বিরুদ্ধে বিদ্রহ করে তাকে দেয় ভাঙ্গবার দুর্জ্জয় শক্তি!—ধরণীর বক্ষ চিড়ে নূতন কিছু দেখবার, পাবার, উপভোগ করবার জন্য তাকে কোরে তোলে উন্মাদ।....একের পর এক ক'রে প্রকৃতির রুদ্ধ দ্বার কক্ষের অন্তরালে যা কিছু আছে তাকে টেনে বা'র কোরে নির্দ্দয় ভাবে পিছুতে ফেলে এগিয়ে যাবার জন্যই বোধ হয় মানুষকে এই প্রবৃত্তি দিয়েছেন তিনি! এই বোধ হয় সৃষ্টির সার্থকতা!

এই বাড়ীটির সম্মুখ দিয়ে সোজা একটা সরু রাস্তা গিয়ে একটা বড় কাঁচা-পাকা রাস্তার সঙ্গে মিশেছে। এই বড় রাস্তাটি থেকে একটি রাস্তা বেড়িয়ে সোজা গিয়েছে দক্ষিণ দিকে।....রাস্তার দু'

পাশে সেওড়া রাঙচিতা খেজুর প্রভৃতির গাছ—গাছগুলির পাতা ধূলিতে ভরা; কারণ, অনবরত এই রাস্তা দিয়ে ইঁটখোলার লরী যাতায়াত করে। কিছু দূর গিয়ে রাস্তাটি ধনুকাকারে বেঁকে পূর্ব্ব দিকে গিয়েছে। এই বাঁকের মাথায় একটী বিরাট বটপী বৃক্ষ। তার তলায় একটী মন্দিরের ধ্বংসস্তূপ। পূর্ব্বমুখগামী রাস্তাটির এক পাশে বৃহত একটা আম বাগান; অন্য পাশে পোড়ো জমিতে পেয়ারা গাছের বাগান সবেমাত্র তৈরী হোচ্ছে। তার নীচে জলা-ভূমি, বর্ষাকালে ধান চাষ হয়।····ইঁটখোলার কুলিদের কাঁচা-ইঁটের-দেওয়াল-দেওয়া গোটা খড় দিয়ে ছাওয়া কয়েকটা কুঁড়ে পেরিয়ে একটা বাগানওয়ালা বাড়ীর সম্মুখে রাস্তাটা শেষ হ'য়েছে। মনে হ'বে যেন ওই বাড়ীটির জন্যই রাস্তাটি নির্ম্মাণ করা হ'য়েছিল। কেন না ওই বাড়ীটির আসে পাশে দু' এক ঘর কৃষকের বাস ছাড়া দ্বিতীয় ভদ্রলোকের বাস নাই।····বাড়ীটির সম্মুখে নাতিক্ষুদ্র মাঠটার তিন দিক অল্প উচ্চ ইঁটের প্রাচীর দিয়ে ঘেরা; প্রাচীরের গোড়া খয়ে ইঁট গুলো বেড়িয়ে আছে—মড়ার মাথা যেমন দাঁত খিঁচিয়ে থাকে, এও দেখতে ঠিক সেই রকম। ইঁটগুলো পোকায় খেয়ে ধুলো করে ফেলেছে। লোহার গরাদওয়ালা গেটের একদিকটা মাটীর সঙ্গে বসে গিয়েছে, অন্যদিকেরটা অতি কষ্টে যতটুকু খোলা যায়—তার ভিতর দিয়ে এক সঙ্গে একটা লোকের বেশী যেতে পারবে না। গেটের সংযোগস্থলগুলো নড়্‌বড়ে হ'য়ে গিয়েছে। লোহার গরাদগুলো অতিরিক্ত মরচে ধরা। এসব

দেখলে এই কথাটিই মনে হবে যে, এই বাড়ীটির বয়স অন্ততঃ পক্ষে দেড় শতাব্দী! গেট পার হয়ে একটি সরু রাস্তা বাড়ীর দিকে গিয়েছে; দু' পাশে সুপারি, নারকেলের গাছ।····দোতালা দক্ষিণ-মুখী বাড়ী। বাড়ীর পশ্চিম দিকের শেষ প্রান্তর মাটি থেকে ছাদের উপর পর্য্যন্ত খারাই সোজা; নীচে উপরে—দুটি করে চারটি জানালা। জানালা সবুজ রং-এ রঞ্জিত; আপাততঃ বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে। বাড়ীর রংটা শেওলা ও চূণের সংমিশ্রণে ছুলীরোগগ্রস্থ লোকের গায়ের মতো দেখতে। বাড়ীর সম্মুখে—একটী প্রবণ ভূমি। তার নীচে ক্ষীণস্রোতা আদি গঙ্গা। উত্তর দিকে খিড়কী পুকুর। বাড়ীর দিকের ঘাটটি পুরাতন কায়দায় দু'দিকে উঁচু ঢালু দেওয়াল। পূর্ব্ব দিকে কৃষকদের রবি-শষ্যের জমি।

এই বাড়ীর মালিক কিরণ মৈত্র; নিমাইয়ের বন্ধু, মায়ার স্বামী। সন্ধ্যা হ'তে তখনও প্রায় ঘণ্টা দুই দেরী আছে। মায়া খিড়কীতে গা ধুতে যাবার জন্য গামছাখানা কাঁধে ফেলে উপর থেকে নামছে, এমন সময় দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ ও তৎসঙ্গে —

"মায়া—"

মায়া বুঝতে পারলে নিমাই এসেছে। তাড়াতাড়ি গিয়ে কপাট খুলে তাকে সাদর আহ্বান করে সহাস্যে বললে মায়া—"ছোট কথা রেখেছ তা' হোলে—"

"বেশীক্ষণ থাকতে পারবো না, এক্ষুনি যেতে হ'বে; বাইরে

বেড়িয়ে যাচ্ছি—" ব্যস্তভাবে নিমাই বললে মায়ার সঙ্গে দালানে উঠতে উঠতে।

"হঠাৎ—" বলে সবিস্ময়ে মায়া নিমাইয়ের দিকে তাকালে।

"অফিসের জরুরী কাজে—" উত্তর দিয়ে নিমাই একবার চারদিক চেয়ে নিলে। পরে জানতে চাইলে,—"এরা কোথায় ?" বলেই নিমাই নিজের কাছে নিজেই অপ্রস্তুত হ'য়ে গেল। কারণ 'এরা' অর্থে কিরণ আর মায়ার খুড়তুতে বোন। কিন্তু তার খোঁজ করা সমীচীন কিনা প্রশ্নটা করবার আগে সে বুঝে উঠতে পারেনি। আর পারেনি বলেই কথাটা বলতেই তার কাণে বাজল, পাছে মায়া কোনো রকম টিপ্পনী কাটে। এটাও কিন্তু একটা কথা, নিমাই মায়ার মিমন্ত্রণ রক্ষা করতে আসেনি, সে আজ কাজের ভীড়েও একটুখানি সময় কোরে নিয়ে এসেছে শুধু মায়ার খুড়তুত বোনের এক চোক চাহনীর সম্মান রক্ষা করতে। যে-চাহনী সে গত কালকে বিকেল বেলায়, ইডেন গার্ডেনে বিদায় কালীন লক্ষ্য করেছিল। সে বুঝতে পেরেছিল সে চাহানীর ভাষা।...

"চায়নাকে সঙ্গে করে কর্ত্তা গিয়েছেন ভবানীপুর, আমাদের কাপড় কিনতে—" মায়া উত্তর দিলে।

"কি নাম বললে ?" নিমাই সাগ্রহে নামটা আর একবার জানতে চাইলে। সে ভুলে গেল তার আগ্রহাতিশয্যটা অত্যন্ত অশোভন ভাবে প্রকাশ পাচ্ছে।

"চায়না ডাক নাম; ভাল নাম চয়ন দেবী—" জবাব দিয়ে মায়া

ঠোঁটে হাসিটা চেপে চোখ তুলে চাইল নিমাইয়ের মুখের দিকে; "কেন—" বলে মায়ার চাপা হাসিটা মুখময় সংক্রামিত হ'য়ে পড়ল।

"না, তাই জিগ্যেস করছি; এমনি—" নিমাই বুঝতে পারলে না যে, এই ধরনের জবাবে তার অন্তরটা প্রকাশ হ'য়ে পড়ল।

"তা' বেশ। তুমি ভাই একটু বস, ততক্ষণ আমি চট্ করে গা-টা ধুয়ে আসি। অন্ততঃ চা হালুয়াও খেয়ে যেতে হ'বে।"

"খুব তাড়াতাড়ি এস; আমার সময় নেই, বেশী বসবার—" মোড়াটা টেনে নিয়ে তার উপর বসতে বসতে বললে।

মায়া গা ধুয়ে আসবার আগেই এসে পড়ল কিরণ আর চয়ন। তাদের দেখেই নিমাই আসন ছেড়ে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল।

"ভাগ্যি তোমরা এলে; নইলে দেখা হ'ত না, কত দিনের জন্য তা' কে জানে—" অচিন্তিত ভাবে নিমাই কথাগুলো খুব জলদ বললে। এবারও তার কাণে 'তোমরা' কথাটা বাজতে তার সারা মুখটা কে যেন সিঁদুর গুলে ঢেলে দিলে।

"কেন?" সবিস্ময়ে কিরণ জিজ্ঞাসা করলে, সিঁড়িতে পা দুটো ঠুকতে ঠুকতে—উদ্দেশ্য জুতোর ধূলি ঝাড়া।

"আজকেই পাঞ্জাব মেলে বেড়িয়ে যাচ্ছি, বিহার—"

"না কি! বেশ, ওপরে চল—"

সিঁড়ির কাছে গিয়ে কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য একটা অস্বস্তিকর আবহাওয়ার সৃষ্টি হল। কিরণ আগে আগে উঠছে। পরে নিমাই চায়—আগে চয়ন উঠুক, আর চয়ন চায় আগে নিমাই উঠুক।

শেষে উভয়ের দৃষ্টি বিনিময় হ'তেই চয়ন অস্ফুট স্বরে বললে:
"উঠুন—"

দু'জনে পাশাপাশি উপরে উঠল। উঠে নিমাই গিয়ে ঢুকল মায়ার ঘরে। বেশ বড় ঘর। দু' পাশে দুটি খাট পাতা। দু'টি খাটের নীচেই একটা করে পা-পোছ আছে। খাটে নেটের মশারি খাটান। ঘরের সামনের দেওয়ালের দিকে—ঠিক মাঝখানে বড় আয়না সমেত ড্রেসিং টেবিল। টেবিলের সামনে আর্ম্মলেশ শিশু কাঠের কালো বার্নিশ করা বেতের বুনতওয়ালা চেয়ার। ঘরের রং সবুজাভ। দেওয়ালে রামকৃষ্ণ পরমহংসের সম্মোহন মূর্ত্তি, পরিব্রাজক, রবীন্দ্রনাথের দামী তৈলচিত্র ছাড়া আর কিছুই নেই।

বারান্দার এক পাশে একটি গোল টেবিল। তার একদিকে বেতের একটি আরাম কেদারা, আর তিন পাশে তিনটি বেতের চেয়ার।

মায়া একেবারে চা খাবার নিয়ে উঠল। নিমাইয়ের সময় নেই বলে গল্প স্বল্প বিশেষ কিছু হল না। মায়া দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই নিজের কাপটা শেষ করে নেমে গেল, তার সঙ্গে সঙ্গে চয়নও নেমে গেল। নিমাই আর অপেক্ষা না করে, কিরণের কাছ থেকে বিদায় নিলে।····

মায়া রান্না ঘরে। চয়ন সিঁড়ির কাছে এমন ভাবে ইতঃস্ততঃ করছিল, যেন সে উপরে উঠতে চায়। নিমাইয়ের নামার শব্দ শুনতে পেয়ে সিঁড়ির এক পাশে দাঁড়িয়ে পড়ল মাথাটা

ঈষৎ নীচু করে। নিমাইও নীচেয় এসে শেষের সিঁড়িটায় যন্ত্রবৎ দাঁড়িয়ে পড়ল।···কয়েক মিনিট কারো মুখে কোনো কথা নেই।····কি যে বলতে চায় ওরা পরস্পরে—তা' অন্তরের ভাব ভাষায় প্রকাশ করতে পারছে না। একটা অদৃশ্য শক্তি অভিনয় দেখবার জন্য তাদের যেন দাঁড় করিয়ে রেখেছে।

"আপনার সঙ্গে মোটেই আলাপ পরিচয় হল না আমার—" চয়ন মৃদু স্বরে মুখ নীচু করেই বললে।

নিমাই এক হাতের অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলি অপর হাতের অঙ্গুলিদ্বারা খুঁটতে খুঁটতে চয়নের দিকে তাকায় আবার চোখ নামিয়ে নেয়। বার কয়েক এই ভাবে তাকাল সে;—তবু সে ঠিক করতে পারল না, কি উত্তর দেবে।

"আজ যাই—" সকাতরে বিদায় প্রার্থনা করা ছাড়া নিমাই আর কিছু বলতে পারলে না।

চয়ন ঘাড়টা ধীরে ধীরে এক পাশে হেলিয়ে সম্মতি দিলে।

নিমাই আর একবার চয়নকে দেখে নিয়ে পিছু ফিরল। দালান থেকে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বললে: "মায়া চললাম—"

"ফিরতে যদি বেশী দেরী হয়, চিঠি পত্তর দিও—" মায়া রান্নাঘর থেকেই বললে।

চয়ন তাড়াতাড়ি উপরে উঠে এক দৃষ্টে চেয়ে রইল, নিমাইয়ের গতিপথের দিকে। যতক্ষণ না সে রাস্তার মোড় ফিরে অদৃশ্য হয়ে

গেল ততক্ষণ চয়ন চোখের পলক ফেলল না। পরে সে অদৃশ্য হ'য়ে যেতেই একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বেতের আরাম কেদারাটায় বসে পড়ল।

—সতের—

মধ্য বিহারের একটী জিলা সহর।

একটা হোটেলের বসবার ঘরে নিমাই একা বসেছিল। মাঝে মাঝে হয়ে পড়ছিল তন্দ্রাচ্ছন্ন। কেননা সমস্ত রাত্রি জেগে বসে কাটাতে হয়েছে ট্রেণে, অতিরিক্ত ভীড়ের জন্য। সকাল নয়টা কি সাড়ে নয়টা বেজেছে তখন।

ঘরটা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ; অল্প দিনই হোয়াইট ওয়াস করা হ'য়েছে। দরজা জানালায় কাঁচের শার্সি, খরখরি দুইই আছে। নিমাই যেখানটা বসেছিল, সেখান থেকে বাইরের আকাশের কিছুটা দেখা যায়। উর্দ্ধে স্বচ্ছ নীলাকাশ, নিম্নে অরুণালোকজ্জ্বল ধরণী, তার মাঝে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে ঘন সবুজ ইউক্যালিপটাস গাছগুলো ; তারই মাঝে মাঝে লাল হলদে সাদা বিবর্ণ প্রভৃতি রংয়ের বাড়ী। শান্ত মলয়ে বিদায় কালীন শীতের হাম্‌লা তখনও রয়েছে। মধ্যে মধ্যে বাতাস যখন দ্রুত বয়ে চলে যাচ্ছে তখন

ক্ষীণাঙ্গ ইউক্যালিপট্যাস গাছগুলো দেখলে মনে হবে যেন অগুনতি ছোট ছেলেমেয়ে সহাস্যে হাততালি দিয়ে গান গেয়ে নৃত্য করে বেড়াচ্ছে। এই প্রাকৃতিক দৃশ্যে সৃষ্টির মাধুর্য্য উপলব্ধি করে সম্মোহিত হ'তে হয়।

নিমাই বসে বসে ভাবছিল। ভাবছিল সে,—আজ বারানগরের সেই বৃদ্ধের ভাগিনীকে দেখতে যাবার কথা ছিল। কিন্তু দৈবচক্রে তাকে চলে আসতে হোয়েছে প্রায় সাড়ে তিনশ' মাইল দূরে! গত পরশু বৃদ্ধের সঙ্গে যখন সে কথা বলছিল, তখনকার জীবনের সঙ্গে আজকের জীবনের একটা আকাশ পাতাল তফাৎ অনুভূত হ'তে লাগল। কি যেন একটা ওলট পালট হ'য়ে গিয়েছে! 'আমি যখন কথা দিচ্ছি তখন যাবই, শত কাজ ফেলে রেখেও'—বৃদ্ধের কাছে নিমাই এইরূপ দৃঢ় ভাষায় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, অথচ সে প্রতিশ্রুতি পালন করতে পারলে না—একথা চিন্তা করে নিমাই যেন মরমে মরে গেল। অনুনয় বিনয় করে বৃদ্ধকে চিঠি লিখবে যে তার ভাগিনীকে সে বিয়ে করবেই, কার্য্যগতিকে এখন যেতে না পারলেও—একথা লিখেও বৃদ্ধকে সে আশ্বস্ত করতে পারে না। হয়ত পারত; যদি না তার জীবনে চয়নের আবির্ভাব হ'ত! কিন্তু সে বৃদ্ধের সকাতর অনুনয় বিনয়ের ছবিটাও ভুলতে পারছিল না;—সে ছবিটা চোখের উপর ভেসে উঠতেই তার মনকে করে তুলল আরও পীড়িত। তার মাথায় যখন খেলতে লাগল এই সমস্ত চিন্তা তখন সে বসে রইল ধ্যান-মৌনী হ'য়ে।

নিমাই বসে বসে এই কথাটাই ভাবছিল,—ঘটনার দুর্নিবার ন্যায়ানুশাসনের অবাধ্য হয়ে ভবিষ্যতকে নিজের মনগড়া মতো দেখতে গিয়ে মানুষের বুক শুধু ভেঙ্গে চুড়মার নয়, জীবন্তে ধূলির সঙ্গে মিশিয়ে দেয়। তাই, তাই মানুষের এত দুঃখ! মানুষের জীবন, সে ভাবল, পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট কর্ম্মকল্পনার দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। সে হ'চ্ছে উত্তাল-উর্ম্মিমুখর ঘটনা-সাগরের উপর ভাসমান শোলা;—একবার উঠবে, আবার নামবে। মাঝে মাঝে খাবে নাকানী চোপানী! যে এতে অভ্যস্ত, সে নীরবে নাক ঝেড়ে ফেলে আবার ভাসতে সুরু করবে; আর যে অনভ্যস্ত, তাকে চোখের-জলে নাকের-জলে হ'য়ে জীবনের দিনগুলি কাটাতে হবে। এই হোচ্ছে সমস্ত কাহিনীটির মূল কথা!

নিমাই কর্ত্তব্য বোধের প্রেরণায় একখানা টেলিগ্রাম পাঠাবার মনস্থ করে পোষ্ট অফিসের উদ্দেশ্যে বেড়িয়ে পড়ল। এই কথাটাই বৃদ্ধকে তার করে জানাবে যে, সে মর্ম্মান্তিক দুঃখিত, যেতে পারলে না বলে; কারণ কার্য্যগতিকে তাকে চলে আসতে হ'য়েছে সাড়ে তিনশ' মাইল দূরে!

স্নানাহার সেরে দুপুর বেলায় নিমাই এসে পূর্ব্বের সেই স্থানটিতে বসল। ঘরের চারদিকের দরজা জানালা কাঁচের সার্শিগুলো দিয়ে বন্ধ করা। সকালের চেয়ে দুপুরের আবহাওয়া যেন অন্য রকম! সে এখানকার আবহাওয়ার সঙ্গে মোটেই পরিচিত নয়। তাই সে বসে বসে দেখতে লাগল,—বাইরে ঝড়

বইছে। মেঘের ঝড় নয়, রৌদ্রের ঝড়! রাস্তার ধূলি উড়ে চকিতে চারদিক যেন অন্ধকার করে দিচ্ছে! রৌদ্র আছে, অথচ সূর্য্য দেখা যায় না! যেমন মিল্ক হোয়াইট বৈদ্যুতিক বাল্‌বের ভিতরকার ত্বরিতোজ্জ্বল সূক্ষ্ম তারগুলি দেখা যায় না, অথচ আলো; ঠিক সেই রকম!···বাইরে একটা বর্ণহীন অবাস্তব জিনিষ গাছে-পালায়, ঘর-বাড়ীর দরজা-জানালায় যেন দাপাদাপি মাতামাতি ক'রে বেড়াচ্ছে! সবকিছু লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে মানুষকে পথের মাঝে উলঙ্গ করে দেওয়াতেই তার যেন আনন্দ!' পথিকের জামা কাপড় এমন ভাবে উড়ছে যেন ছিঁড়ে গেল গেল অবস্থা;—পট্ পট্ পট্ পট্।··· ধূলিগুলো দিগ্বিদিক বোঁ বোঁ শব্দে ছুটোছুটী করছে! ছেঁড়া কাগজ, খড়কুটো, ন্যাক্‌ড়া প্রভৃতি এক সঙ্গে তাল পাকিয়ে একদিক থেকে আর একদিক পর্য্যন্ত উড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে;—দেখলে মনে হ'বে যেন বস্তির একটা নোংড়া ছেলে চটের ফুটবল তৈরী করে ছুটোছুটী করতে করতে বে-ধবর বলটাকে পিটে বেড়াচ্ছে!··· ঘরের ভিতর থেকে শোনা যায় একটা শব্দ হ'চ্ছে—শোঁ-শোঁ-শোঁ-শোঁ।....যেন ক্রুদ্ধ ফনিণী ঘরে ঢোকবার জন্য সগর্জ্জনে মাথা খুঁড়ছে বাইরে!···ঘর থেকে পথের গাড়ী ঘোড়ার চলাচল দেখলে মনে হ'বে যেন, বাইরে একটা শব্দহীন জগৎ চলাচল করছে। হাওয়া যখন হোয়ে যাচ্ছে বন্ধ, তখন কিছুক্ষণের জন্য ঘরের ভিতর একটা নিস্তব্ধতা বিরাজমান।···সাথীহীন চড়ুই পাখীটা ঘরের কোণে মাকড়সা খুঁজতে খুঁজতে শব্দ করছে,—চ্যাক্ চ্যাক্ চ্যাক্।···

নিমাইয়ের নাক ধূলিতে বোঝাই হ'য়ে গিয়েছিল। নাকটা ঝেড়ে ফেললে; নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে পিচের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। পথে পিচ ঢালছে কিনা!

বরানগরের বৃদ্ধকে টেলিগ্রাম পাঠিয়েও নিমাই সন্তুষ্ট হ'তে পারলে না। তাই সে বৃদ্ধকে একখানা চিঠি লিখলে এই জানিয়ে যে, তার এখন শীঘ্র যাওয়ার সম্ভাবনা নাই। অতএব তার আশায় বৃদ্ধের বিনা চেষ্টায় বসে থাকাটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে শেষ কালে লিখে দিলে যে, বৃদ্ধ যেন তার আশা ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র চেষ্টা করে। চিঠিটা শেষ করে সোজা হ'য়ে বসতেই তার চোখের ওপর ভেসে উঠল চয়নের ছবিটি।

প্রায় মাসখানেক গত হ'য়ে গিয়েছে।

সেদিন সকালেই নিমাই অফিসের কাজে বেড়িয়েছিল। বাসায় যখন এলো, তখন প্রায় সাড়ে এগারটা বেজে গিয়েছে। কোটটা গা থেকে নামিয়ে, বাইরে বসবার ঘরে চেয়ারটায় বসে একটু বিশ্রাম করে নিচ্ছিল, পরে স্নানাহার করবে বলে। সে বসে আছে দেখে হোটেলের ম্যানেজার তাকে দু' খানা চিঠি দিয়ে গেলেন। একখানা টাইপ করা দেখেই সে বুঝতে পারলে যে সেখানা কোলকাতা অফিস থেকে এসেছে; অপরটা নীলাভ সখের লেফাফা। সুন্দর গোটা গোটা ইংরাজিতে ঠিকানা লেখা। সে অনেকক্ষণ ধরে চিঠিখানা এপিট ওপিট করে দেখলে, কিন্তু

ঠিক করে উঠতে পারলে না যে তার কোনো পরিচিত জনের হাতের লেখা। সে খামখানা তৎক্ষণাৎ ছিঁড়ল না; না ছেঁড়বার কারণ—একেই তো ঠিক করতে পারলে না সে যে কে দিয়েছে চিঠিখানা, তার উপর খামখানা ও হস্তাক্ষর অতি সুন্দর দেখে তার ভিতরে যা' আছে—সে অনুমান করে নিলে—সেটাও নিশ্চয় সুন্দর হ'বে। তাই চৈত্র মাসের রৌদ্রে সকাল থেকে ঘুরে ঘুরে তার মেজাজ বেসুরো হ'য়ে আছে বলে চিঠিখানা ভালো হ'লেও মেজাজের সঙ্গে খাপ না খেয়ে খারাপ হ'য়ে যেতে পারে ভেবে সে সেটাকে বুক পকেটে রেখে স্নানাহার সারবার উদ্দেশ্যে ভিতরে চলে গেল।

স্নানাহার সেরে ধীরে সুস্থ্যে তার খাটে অর্দ্ধশায়িত ভাবে বসে, গোঁফ ছাঁটবার কাঁচি দিয়ে খামখানা খুব সরু করে কাটল। পরে চিঠিখানা ভেতর থেকে এত ধীরে ধীরে বা'র করলে, যেন তাতে তার ফাঁসির হুকুম আছে!···নীচে চিঠিতে নাম দেখেই সে উত্তেজিত হয়ে সোজা ভাবে বসল। চিঠিখানা দিয়েছে চয়ন। প্রথমে সে এক নিঃশ্বাসে পড়ে শেষ করল। তাতে লেখা আছে:

শ্রদ্ধাভাজনেষু,

লুকিয়ে আপনাকে চিঠি লিখছি। এমন ভাবে লুকিয়ে যে, সে কথা আপনাকে কি আর বোলবো। যে-ভাবে চিঠিখানা পোষ্ট

করেছি, তা শুনলে আপনি হেসেই খুন হ'তেন; এখনও আমি মায়াদি'র কাছেই রইচি কিনা। এখন, আমি আমার চিঠির উদ্দেশ্য আপনাকে জানাচ্ছি স-সঙ্কোচে। সত্যিই, জানাবার আগে আমার এত ভয় হ'চ্ছে এইজন্যে যে, আপনাকে বিরক্ত করলাম কিনা।

আপনার চোখের উপর এই ছবিটাই এঁকে নিন, যেন আমি আপনার সামনে নতজানু হ'য়ে এই কথাটাই জানাতে চাইছি যে,—দেখে পর্য্যন্ত আপনার মূর্ত্তিখানা মূহুর্ত্তের জন্যেও মন থেকে মুছতে পারছি না কেন? ঘুমিও না। কতদিনে কোলকাতায় ফিরবেন?

উত্তরের আশায় উন্মুখ হ'য়ে রইলাম। ইতি—

বিনীতা

চয়ন

জীবনে এই প্রথম নিমাই প্রেম-পত্র ব'লে জিনিষটার সঙ্গে পরিচিত হ'ল। একটা অপূর্ব্ব অনুভূতির আস্বাদ পেল সে। বহুক্ষণ ধরে দাঁত দিয়ে নীচেকার ঠোঁট চেপে ধরে চিন্তা করল। চিঠিখানা পড়ে তার হৃদয় বীণায় যে-ঝঙ্কার দিলে তা' সে কাণ পেতে শুনে বুঝতে পারল, যেন দুটি হৃদয় এক সুরে বাঁধা। সে উত্তর লিখল:

বহুদিনের বাঞ্ছিত একটা জিনিষ জানতে পেরে পরমানন্দ অনুভব করছি। সেটা হ'চ্ছে,—পথ-মাঝে দু'টি লোক পরস্পর

পরস্পরকে দেখে একজনের অন্তরে অপর জনের ছবিটা যদি এঁকে যায়, তবে শুধু সেটা এক পক্ষেরই হয় অন্য জনের হয় না, না উভয়েই উভয়ের কথা চিন্তা করতে থাকে।

এর আগে আমি মায়াকে যে-চিঠি লিখেছিলাম তাতে আপনার কথা লিখিনি এইজন্য যে, মায়া হয়ত ঠাট্টা তামাসা করবে। বিশেষতঃ আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় শুধু ক্ষণিকের যখন। অথচ আজ সেই ক্ষণিকটুকু আমার কাছে মনে হ'চ্ছে যেন আপনি আমার কাছে যুগান্তরের পরিচিত!

আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য যত শীঘ্র পারি, অন্ততঃ একটা দিনের জন্যও, কোলকাতায় যাব। কিন্তু তাও বোধ হয় মাস দু' একের মধ্যে হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

অকপট ভলবাসা গ্রহণ করে কৃতার্থ করবেন কি? ইতি—

নিমাই সান্যাল

—আঠার—

আরও মাস খানেক পরে চয়নের দ্বিতীয় পত্র পেয়ে নিমাই আশ্চর্য্যের চেয়ে অধীর হ'য়ে উঠল বেশী সাক্ষাতের জন্য।

এই সহরের যে-অংশে নিমাইয়ের বাসা তার অপর অংশে

চয়ন এসেছে তার এক আত্মীয়ের বাড়ীতে, কি একটা উৎসব উপলক্ষে। সে চিঠিখানা ছেড়েছে এই সহরে এসেই। নিমাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য সে নিজেই একটা স্থান ও সময় নির্দ্দিষ্ট করে দিয়েছে চিঠিতে। আরও জানিয়েছে যে তার সঙ্গে থাকবে মাত্র একটি বালক; তার মামাতো ভাই।

সাক্ষাতের দিন অপরাহ্নের অপেক্ষায় নিমাই দুপুর বেলায় বাইরের ঘরে বসে রইল নিষ্কর্ম্মার মতো।··· বৈশাখ মাস। মাথার উপর মধ্যাহ্নের মার্ত্তণ্ড যেন অগ্নি বর্ষণ করছে! এই নিষ্ঠুর অত্যাচার ধরণী সহ্য করছে যেন নিঃশ্বাস বন্ধ করে ও ঠোঁটে ঠোঁট চেপে। পথ-ঘাট জন-প্রাণী শূন্য! বাতাস যেন বিদায় নিয়েছে এদেশ থেকে চিরতরে। অনতি দূরে বট গাছটার লক্ষ লক্ষ পাতা নীরবে স্থির হ'য়ে আছে,—কিন্তু তারই মাঝখান থেকে মাত্র একটি পাতা কেন এবং কি করে নড়ছে—ঘড়ির পেণ্ডুলামের মতো তা বুঝতে পারলে না নিমাই।···বট গাছটাতেই একটা বৌরী পাখী বসে এক ঘেয়ে শব্দ করছে—কক্ কক্ কক্ কক্···। বৈশাখী দ্বিপ্রহরের নিস্তব্দতা গভীর নিশীকেও হার মানিয়ে দিত, যদি অদূরে আম গাছটায় একটা কাঠবিড়ালি বিরামহীন—ক্রীক্-ক্রীক্-ক্রীক্-ক্রী-র্-র্-র্···শব্দ না করত। হঠাৎ একটা দম্‌কা বাতাস বয়ে গেল, নিদাঘের উত্তপ্ত নিশ্বাস যেন!···রৌদ্রোজ্জ্বলা সবুজ-পল্লব-ভারাক্রান্ত অশ্বত্থ গাছটা হাসছে ···

নিমাই সহরের এ প্রান্তে কোনো দিন আসেনি। বাস থেকে

নেমে নির্দ্দিষ্ট স্থানের উদ্দেশ্য পা বাড়াল; কিন্তু কোন্ পথ ধরে যাবে সে ঠিক করে উঠতে পারল না। কারণ পরিবার-পল্লীর তখনও পথিকহীন পথগুলো যেন মাতালের মতো হাত পা ছড়িয়ে চিৎপাৎ হ'য়ে পড়ে আছে। সে সামনের দিকে হাঁটতে লাগল। তার নিজের লম্বা ছায়াটা প্রায় বিশ-গজ আগে আগে হাঁটছে। হঠাৎ তার চোখে পড়ল—যেন তার ছায়াটা দুটো হ'য়ে যাচ্ছে মাঝে মাঝে!....কিন্তু দুটো ছায়া যথেষ্ট ছোট বড় দেখতে পেয়ে সে পিছু ফিরল। দেখল একটা লোক তার পিছুতে আসছে। নিমাই দাঁড়াল; লোকটা কাছে আসতেই সে জিজ্ঞাসা করল গঙ্গার ধার যাবার পথ কোন দিকে। লোকটি দেখিয়ে দিতেই সে সেইদিকে হাঁটতে লাগল। সরু একটী পিচের রাস্তা বিসর্পিল ভাবে দু'ধারে মেহদীর ভিতর দিয়ে চলে গিয়েছে গঙ্গার দিকে; গিয়ে একটা প্রবণ ভূমির মাথাতে শেষ হ'য়েছে।

নিমাই এসে দাঁড়াল গঙ্গার ধারে। সামনে একটা কঙ্করময় ঘাট। ঘাটের এক পাশে একটা ছোট্ট নৌকা ওপর হ'য়ে আছে। ঘুমন্ত মায়ের পাশে যেমন শিশু সন্তান শুয়ে থাকে, দাঁরটা ঠিক তেমনি ভাবে পড়ে আছে নৌকাটার এক পাশে। ঘাটের অন্য পাশে একটা নোঙর; তার সঙ্গে মোটা শিকল বাঁধা। শিকল ও নোঙরটায় অত্যধিক মরচে পড়ে গিয়েছে। খড় কুটোয় ঘাটটা আবর্জ্জনা করে রেখেছে কে!...গঙ্গার ধারে ফুর্ ফুরে মিষ্টি হাওয়ায় নিমাইয়ের মাথার চুলগুলো উড়ছে।, স্বচ্ছ শান্ত জাহ্নবীর

বোকে কাদা-খোঁচা পাখীগুলো আরাম করে নিচ্ছে স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে। পালা-তোলা নৌকাগুলোর মাঝিরা এই পাখী-গুলোরই সগোত্র বলেই নিমাই ঠিক করে নিলে; কেননা, ওরা শুধু হাল ধরে বসে আছে মাত্র।···ওপারের মন্দিরের পিতলের চূড়াটা অস্তরাগরঞ্জিত হ'য়ে ওটাকে করে তুলেছে যেন প্রবালের। নিমাই নির্নিমেষ নেত্রে সেই দিকে চেয়ে রইল।

নিমাই লক্ষ্য করেনি। তার দক্ষিণ দিকে গঙ্গার ধার দিয়ে চয়ন আসছিল ধীর পদবিক্ষেপে। তার পরনে একটা মিস্‌মিসে কালো রং-এর শাড়ী। শাড়ীর সোণালী জরীর পাড়ের 'পর অস্তারুণরশ্মি পতিত হ'য়ে ঝিল্‌মিল্ ঝিল্‌মিল্ করছে। দেখলে মনে হ'বে ঠিক সেই রকম যেমন, বর্ষাকালে পশ্চিমাকাশে একখণ্ড কালো মেঘের ওপাশে সূর্য্য অস্ত যায়—আর সেই মেঘের চার পাশ হ'য়ে ওঠে তাপোজ্জ্বল অঙ্গারের মতো।....চয়ন আসছে,—যেন একটা অত্যুজ্জ্বল উপগ্রহ তার নিজস্ব পথে আপন মনে চলেছে। সে এসে দাঁড়াল নিমাইয়ের পিছুতে। নিমাই কিন্তু তখনও টের পায়নি। সে দেখছে সেই মন্দিরের চূড়াটা অপলক নয়নে।

চয়ন মুহূর্ত্ত কয়েক নিমাইয়ের পিছুতে দাঁড়িয়ে যখন বুঝতে পারল সে টের পায়নি, তখন নিঃশব্দে একটা পা বাড়িয়েই সম্মুখে এমন ভাবে হ'ল হাজির—যাতে নিমাই চমকে উঠে এক পা পিছিয়ে গেল, আর তার চোখ দুটো অর্দ্ধীভূত হ'য়ে গেল যেন! বুঝতে পারল না সে, আকাশের চাঁদটা তার সামনে খসে পড়েছে কি না!···

উভয়েরই বাক্যস্ফুট হ'ল না কিছুক্ষণের জন্য। তারা বুঝতে পারল না যে, পরস্পর পরস্পরকে নমস্কার করবে, না হস্তমর্দ্দন করবে—না করবে আলিঙ্গন।...কিন্তু দুজনেরই অন্তরের মণিকোঠায়—পরস্পরের ওষ্ঠে ওষ্ঠ দ্বারা স্পর্শ করে একটা অপূর্ব্ব অনুভূতির আস্বাদ গ্রহণ করবার আশা মধু, পিয়াসী সোহাগী ভ্রমরের মতো গুঞ্জরন করছে।...কিন্তু আজন্ম-পুষ্ট-সংস্কার তাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে দু' হাত দিয়ে ঠেলে দু' জনকে তফাৎ করে রাখল!....

"কোনখান দিয়ে এলেন....আমি তো লক্ষ্য করিনি—" হাঁসি-ভরা মুখে নিমাই প্রশ্ন করল; সে প্রাণখোলা অথচ নিঃশব্দ হাঁসির উপর দিনান্তের ক্ষীণ রশ্মি পতিত হয়ে তাকে বর্ণনাতীত সুন্দর করে তুলল চয়নের চোখে।...

"চলুন—" চয়ন এগিয়ে গিয়ে নিমাইয়ের একটা হাত ধরে বললে: "ওদিকের ঢালু লনটায় গিয়ে বসিগে—" সে এমন ভাবে নিমাইয়ের হাত ধরে নিয়ে যেতে লাগল যেন তার একান্ত নিজস্ব যুগযুগান্তরের অধিকৃত প্রিয় বস্তুটি বে-হাত হয়ে যেতে বসেছিল!....

তারা নির্জ্জন স্থানটিতে গিয়ে ঘাসের উপর বসল খুব কাছাকাছি হ'য়ে। প্রথমে তারা যে গল্প সুরু করল—তাতে যেন যন্ত্রের সুর আর গাহকের স্বর অসামঞ্জস্য হ'য়ে বিপরীত গতিতে বইতে সুরু করল। এই বেসুর তাদের কাণেও বাজতে লাগল...কিন্তু আসল

কথাটি কে কি ভাবে প্রস্তাব করবে, তা' মুখে গল্প চলেও অন্তরে অন্তরে সংগ্রাম সুরু হ'য়ে গিয়েছে তাদের।....কিছুক্ষণ নীরবতা। ভাষাহীন চাহনীর বিনিময়। ধীর—নিঃশব্দ দীর্ঘশ্বাস।....তাদের দু'জনেরই যৌবনের সৌকুমার্য্য দুজনকে সম্মোহিত করেছে। তারা পরস্পর পরস্পরের প্রতি পলকহীন দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতে চায়। চায় তারা সুস্নিগ্ধ-প্রেমালাপের মধ্যে ডুবে থেকে যৌবনের প্রতি মুহূর্ত্তগুলি মধুময় করে তুলতে; বস্তুর জগতটার দিকে পিছু ফিরে, সম্মুখে সীমাহীন সাগরের সৈকতে একটা শিলাখণ্ডের 'পর বসে থাকতে : দিন রাত হোক না হোক ক্ষতি নেই তাদের।....বেসুরো বীণা-ধ্বনিতে অবহাওয়া অস্বস্তিকর হ'য়ে উঠেছে।

"আমার কিন্তু কেউ নেই—" অবশেষে নিমাই নীরবতা ভঙ্গ করল এক করুণ রাগিনী তুলে: যে রাগিনীর সুরে ঝঙ্কৃত হ'য়ে উঠল তাদের হৃদয়-বীণা।... "আত্মীয় স্বজন সকলেই আমাকে ফেলে বহুদিন আগে এ জগত থেকে 'চেলে গিয়েছে;—আমি—" তার কণ্ঠ রোধ করল একটা অব্যক্ত বেদনায়: অজ্ঞাতসারে তার চক্ষু দুটি সিক্ত হ'য়ে এসেছিল, সেই আধো-সজল চোখ তুলে সে একবার চয়নকে দেখে নিলে, পরে ধীরে ধীরে দৃষ্টি মাটিতে নিবদ্ধ ক'রে শেষ করল কথাটা—"আমি একা...."

না, না, না,—ওগো তুমি একা নও আমি তোমার পাশে আছি। তুমি আর সাথীহীন নও। আমি ছায়ার মতো তোমার কাছে কাছে থাকব; সেবায়-যত্নে, সোহাগে তোমার বুক ভরিয়ে

তুলব আমি। তারপর···তারপর···ফলভারাক্রান্ত-বেদানা-বৃক্ষের মতো জননীর বেশে আমি তোমার চোখের সামনে অহরহ ঘোরা-ফেরা করব। তুমি আজ থেকে একা নও···। চয়নের মনে হ'ল চীৎকার করে সে ওই কথাগুলো বলে। কিন্তু তার বাক্য-স্ফুট হ'ল না। সে সমব্যথার ভারে নুয়ে পড়েছিল। রুমাল দিয়ে সে চোখ ছুটো মুছে নিলে।····

"অমারও মা নেই, ছেলেবেলা থেকে—" ব্যথিত স্বরে চয়ন বললো,—"মা মরে যাওয়ার পর থেকে বাবা সন্ন্যাসী মতো হ'য়ে তীর্থে তীর্থে ফেরেন। আর আমাকে মানুষ করেছে এক ঝি, তাকে আমি ঝি-মা বলি। সে ছাড়া আমার আর কেউ নেই—"

ছু'টো হৃদয় বীণা এক সুরে ঝঙ্কার দিয়ে উঠে আকাশ বাতাশ ভরিয়ে তুললে যেন!····ঐক্যতানিক সুরের বন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে গেল তাদের যত ব্যথা বেদনা ছুঃখ। তারা এক····নিমাই আর চয়ন····। তাদের কাণে বেজে উঠল মিলনের মধুর সুর।···· ওই—দূরে—আকাশের ওপর থেকে ভেসে আসছে সে সুর। সে সুরের মাদকতায় আত্মহারা হ'য়ে চয়ন হাত ধরে তুলল নিমাইকে। যেন সে বলতে চাইলে, আজ এই এখন থেকেই আমরা হাত ধরাধরি করে পথ হাঁটব।

"চল, সন্ধ্যা হ'য়ে গিয়েছে—" বলে চয়ন নিমাইয়ের হাত ধরে পাশাপাশি চলতে লাগল।

সন্ধ্যার ঝির্ ঝিরে হাওয়া বইতে সুরু করল। আম গাছটা

থেকে একটা কোকিলের স্বর, ঘরে ঘরে সন্ধ্যার শঙ্খধ্বনি, ওপারে মন্দিরে সন্ধ্যারতির কাঁসর ঘণ্টার বাদ্য—এক সঙ্গে শুনতে পাওয়া গেল।··· পূর্ব্বদিগন্তে কৃষ্ণ পক্ষ তিথির দ্বিতীয়ার চাঁদখানা সবেমাত্র উঁকি মারছে—যেন জাহ্নবী দেবীর ললাটে সিঁদুর টিপ!···ভেসে ভেসে উঠছে চাঁদখানা। বহুদূরে—চাঁদের কোল ঘেঁসে, জাহ্নবীর জল তরলিত চন্দ্রিমার মতো টলমল করছে। সেই নাতিপরিসর চন্দ্রালোকের মাঝখান দিয়ে ধীরে ধীরে একখানা পাল-তোলা-নৌকা নিশীথে স্বপনে স্বর্গের স্বরূপ দেখার মতো ভেসে আবার তক্ষুনি অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।···

—উনিশ—

"সেই কথাই বলছিলাম, ভাই নিমাই—" বলতে বলতে চয়নের ঝি-মা ঘরে ঢুকল। বুড়ী পাকা আমের মতো, মাথার চুল পেকে শন হ'য়ে গিয়েছে; নিশি গুঁড়ো দিয়ে দাঁত মাজার জন্যে দাঁতগুলো হ'য়ে গিয়েছে ঝিঙে বীচির মতো। পান দোক্তার পরম ভক্ত। "আমাকে বোঝা বইতে দিয়ে সব সরে পড়েছে। চায়নাকে আমার মানুষ করেছি বুকে করে—" বৃদ্ধার চক্ষু সিক্ত হ'য়ে উঠল।

"আপনার কেউ নেই ?" বৃদ্ধা ঘরে ঢুকতেই শায়িত অবস্থা থেকে উঠে বসেছিল নিমাই; বৃদ্ধার কথা শেষ হ'তেই সে প্রশ্ন করলে।

"আছে—" বৃদ্ধা এক রকম উপেক্ষা ভরেই বললে,—"আছে এক নাতিনী; দিতে থুতে পারলেই খোঁজ খবর নেয়, নইলে নয়—" বৃদ্ধা কিছুক্ষণ ধরে নাতিনী নাতজামায়ের স্বার্থপরতার কথা চিন্তা করতে লাগল। যুগপৎ দক্ষিণ চক্ষুটা মুদ্রিত করে ও সেইদিকে মুখ-বেঁকিয়ে অস্ফুট স্বরে বললে—'মরুকগে আর তরুকগে।' নিমাই বৃদ্ধার এই স্বগতোক্তি শুনতে পেলে না। কিছুক্ষণ পরে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বৃদ্ধা বললেঃ "তোমার হাতে চয়নকে দিয়ে কাশীতে গুরুদেবের শ্রীচরণে গিয়ে বাস করব—" আবার বললে একটু পরে—"আর বাঁচবই বা ক'টা দিন—"

বৃদ্ধা মেঝেয় পা ছড়িয়ে বসে নিমাইয়ের সঙ্গে গল্প করতে লাগল। বিয়ের পর চয়নকে তার কাছ ছাড়া করলে কি করে সে থাকবে একা সেই সমস্ত দিনের কথা ভেবে অশ্রুবিসর্জ্জন করল খানিকটা। পরে নিজেই নিজেকে প্রবোধ দিলে যে, বিয়ের পরে মেয়ে পরের হ'য়ে যায় তাতে দুঃখ করবার কি-ই বা আছে? তারপর সে নিমাইয়ের কাছ থেকে জানতে চাইলে বিয়ের পর নিমাই দেশে ঘরবাড়ী করবে কিনা। সে উত্তরে নিমাই জানলে যে, তার আপততঃ দেশে ঘরবাড়ী করবার মতলব নেই। শেষ বয়সে ঘরবাড়ী করে একেবারে নিশ্চিন্ত হ'য়ে বসবে এই আশা।

"আশ্বিন মাসের শেষ হ'তে আর তো দিন কতক আছে মাত্তর, মাঝে কার্ত্তিক মাসটা গেলেই অগ্‌ঘাণ মাস; অগ্‌ঘাণ মাসেই বিয়েটা হ'বে তো?" বৃদ্ধা জানতে চাইলে নিমাইয়ের কাছ থেকে।

"না; অগ্রহায়ণ মাসে ছুটী পাব না—" নিমাই উত্তরে বললে; "আর পেলেও বড় জোর সপ্তা খানেক কি দু' সপ্তা; তাতে বিয়ের মতো একটা কাজ সাড়া যায় না। সেই মাঘ মাসের শেষের দিকে একেবারে পাওনা ছুটী তিন মাসের আছে, তাই নিয়ে বিয়ে করব—"

"তা' বটে—" বলে বৃদ্ধা একটু মুচকী হাঁসি হাসল: "নতুন বিয়ের পর আমোদ আহ্লাদ করবার জন্য দিন কতক বেশী ছুটী চাই বটে। তখন ছাড়াছাড়ি হ'তে মন চায় না, এটা সত্যি বটে—" বলে বৃদ্ধা স-শব্দে হাঁসল খানিকটা। ও-হাঁসি যেন হাঁসি নয়, দাঁত খিঁচুনী। যেন অন্ধকারে একটু শব্দ হ'ল মাত্র—হাসিটা ফুটে বেরুতে পারল না। মানুষের হাসির সৌন্দর্য্য নির্ভর করে দাঁতের উপর। সুসন্নিবদ্ধ মুক্তা-সদৃশ-শ্বেত দন্তরাজি আহ্লাদে বিকশিত হয়াটাই হচ্ছে হাঁসির রূপ।—আর সেই দাঁতই বৃদ্ধা করে রেখেছে অন্ধকারের মতো কালো মিশ মিশে: "কৈ লো চায়না, আয় না ভাই একবার এই দিকে, দুজনকে দেখি একবার পাশাপাশি—" বৃদ্ধা নাতিনীকে উদ্দেশ করে ডাকল। চয়ন আসবার আগেই বৃদ্ধা উঠে পড়ল: "বস ভাই; গালের পান-দোক্তা ফুরিয়ে গিয়েছে, খেয়ে আসি—" বলে বৃদ্ধা বেড়িয়ে গেল ঘর থেকে।

নিমাই আবার শুয়ে পড়ে বইখানা মুখের সামনে মেলে ধরল। ইতিমধ্যে চয়ন নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে নিমাইয়ের কাছে এসে বিরক্তির ভাব স্বরে টেনে এনে বলল : "বাব্বাঃ; রগের শিরগুলো ফুলে উঠেছে পড়ে পড়ে; বলিহারি যাই ধৈর্য্য, তোমার—" বলে চয়ন নিমাইয়ের হাত থেকে বই খানা কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে রেখে দিলে টেবিলেটার 'পর। চেয়ারটা টেনে নিয়ে খাটের কাছে বসল। তারা গল্প করতে লাগল দুজনে মুখোমুখী হ'য়ে। ভবিষ্যৎ জীবন তারা কি ভাবে নিয়ন্ত্রিত করবে, সংসারের সুখ স্বচ্ছন্দ আনবার দায়িত্ব কার কতটুকু ইত্যাদি বিষয়েও আলোচনা হল কিছুক্ষণ। চয়ন তার নিজের ঘর সংসার কি রকম ভাবে গুছিয়ে বাগিয়ে গড়ে তুলবে, বহু আকাঙ্ক্ষিত 'মধুঘর' কি ভাবে সাজাবে—সেই স্বপ্নে বিভোর হ'য়ে উঠল। চয়নের বিরুদ্ধে নিমাই কোনো কাজ করবার মনোভাব জানালে চয়ন তীব্র প্রতিবাদ করে : "না, না, না। তা' আমি পারব না; এক মাস দু' মাস যত দিনের জন্যে তুমি বাইরে যাবে, আমি সঙ্গে থাকব; যেখানে যাবে সেখানে বাসা করব একটা। কোলকাতাতেই কি, এই চন্দননগরে আর মায়াদি'র কাছেই কি, আমি একলা থাকতে পারব না—" চয়নের কথা শেষ হ'লেই নিমাই তথাস্তু বলেই জবাব দেয়।!

"আহা, দুটিতে যেন আমার লক্ষ্মী-নারায়ণ; দেখলে চোখের পাপ পালিয়ে যায়—" বলতে বলতে বৃদ্ধা ঘরে ঢুকল।

নিমাই লজ্জিত হ'য়ে পাশ ফিরে শুলে।

"কি ? মতলবখানা কি ?" চয়ন মুখ টিপে হাঁসতে হাঁসতে তার ঝি-মাকে বলে।

"মতলব কিছু নেই ভাই; দেখছি—"

"কি দেখছ ?"

"দেখছি কালে কালে কি-ই বা হোলো, আরও না জানি কত হ'বে—" বলে বৃদ্ধা আবার সেই কালো দাঁত বার করে স-শব্দে হাঁসল :

"অ্যাঁ—তোদের পেটে পেটে এত বুদ্ধি! ঘুরে ঘুরে নিজের মনের মত সঙ্গী জুটিয়ে নিলি ভাই ;—আর আমরা বিয়ের পর দশ বছর মুখ তুলে চাইতে পারিনি লজ্জায়—"

"ছেলের মা হবার পরেও না ? রাত্রেও ঘোমটা খুলতে না মুখ থেকে ?" বলে চয়ন মুচকে মুচকে হাসতে লাগল।

"তা' যা বলেচিস ভাই, সত্যিই তাই, পারতাম না—"

"আর বোলো না, বোলো না; আজকালকার আমাদের মতো মেয়েদের সামনে সে-সব কথা বললে তোমাদের গায়ে কাদা ছুঁড়বে। তোমরা তখন সব ছিলে জঙ্গলী—" চয়ন পূর্ব্বের মতোই হাঁসতে হাঁসতে বললে।

বৃদ্ধা বসে গল্প জুড়ে দিলে সে-কেলের। তার যখন বিয়ে হ'য়েছিল, তখন তার বয়স ছিল সাত বৎসর। সে নাকি বিয়ের পিঁড়ি থেকে উঠে গিয়েছিল রশুনচৌকীর বাজনা শুনে। সেকালে বাপ-জেঠা-খুড়ো ছেলেমেয়েদের বিয়ে দিত তাদের পছন্দ মতো;

তাতেই ছেলেমেয়েরা সন্তুষ্ট থাকত ও সুখে বাস করত। আর এযুগে এ আবার কি হাওয়া,—বাইরে বেড়িয়ে বেড়িয়ে নিজের পছন্দ মতো সাথী খুঁছে নেবে—সে বুঝতে পারে না। কেন এল, কে এ বুদ্ধি ছেলেমেয়েদের মগজে ঢুকিয়ে দিলে, তাতে তাদের লাভটাই বা কি হয়, তা' সে জানতে চায়।

"যে যাকে নিয়ে ঘর করবে—" চয়ন বৃদ্ধাকে বুঝিয়ে দেয়: "সে তার মনের মতো মানুষ খুঁজে নেবে, সেইটাই সব চেয়ে মঙ্গল; সংসারে কোনো দিনই অশান্তি ঘটবে না তা' হ'লে—"

"তোমার ওকথার দাম এক কানা কড়িও না ভাই, চায় না—" বৃদ্ধা সেকালের প্রথা পদ্ধতির হ'য়ে ওকালতি করে: "এক ছিদেমও নেই ভাই, তোমার ওকাথার দাম। মা বাবা খুড়ো চেষ্টা করে যাকে দেখে দেবে সেই হচ্ছে ভগবানের দেওয়া, ভগবানের ইচ্ছে; তার বিরুদ্ধে গেলে কেউ কোনো দিন শান্তি পায় না জীবনে—"

"মা-বাবা যদি কাণা-খোঁড়া-বোবা দেখে দেয়, তাও বোধ হয় ভগবানের দেওয়া?" শ্লেষভরে চয়ন প্রশ্ন করে।

"হ্যাঁ, ভাই, সেও ভগবানের দেওয়া;—ওই উপুরে যে আছে—" বৃদ্ধা চোখ ও হাত উর্দ্ধে তুলে বলে: "সে যার সঙ্গে যার গিঁট বেঁধে দেয়, তা মানুষের বললে অন্যায় হ'বে। তার বিদেনই আলাদা; কাউকে দেয় সোনার তাল, আর কাউকে

দেয় রাংতা ; যে তাঁর দেওয়া হাত পেতে নেয় সেই শান্তিতে বাস করতে পারে সংসারে—"

"তোমার ভগবানকে তো আর এসে ঘর সংসার করতে হয় না ; তাই—" চয়ন আর কথাটা শেষ করতে পারলে না ; বৃদ্ধার উৎকট ভগবৎ প্রীতিতে তার গায়ের জ্বালা ধরেছিল।

"ওলো—ঘর সংসারটাই যে তার ; সে মানুষের মন ছলে, কাউকে ভালো দিয়ে, কউকে মন্দ দিয়ে—"

"ও সমস্ত কথা দিয়ে তোমাদের আগেকার গেঁও ভূতদের ভোলান যেত ; আমাদের ও সমস্ত শুনিয়ে হাঁসিও না বাপু—"

"ওই সরকারদের বড় ছেলে—" বৃদ্ধা চয়নের কথায় কর্ণপাত না করে নিজের মনে বলে যেতে লাগল : "মা বাপের কথায় অবাধ্য হ'য়ে নিজের ইচ্ছে মতো একটা বিজেতের মেয়েকে বিয়ে করলে রেজেস্টিরি করে ; করে কি দুঃখে কষ্টেই না পাড়েছে ; বাবা বাড়ীতে জায়গা দেয় না, কিন্তু মায়ের প্রাণ তা তো আর সইতে পারে না তাই লুকিয়ে লুকিয়ে মাসে মাসে টাকা দেয় তবে খেতে পায়—"

"হাস্ ! সুপারষ্টিসাস্ ইডিয়ট—" চয়ন মুখটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে ঘৃণা ভরে উচ্চারণ করল কথাটা অস্ফুট ভাবে। পরে বৃদ্ধার দিকে মুখ করে বলে :

"রোগে লোক অকর্ম্মণ্য হ'য়ে গেলে কে কি আর করবে ?" বিরক্তির ভাব চয়নের স্বরে।

"বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ, তর্কে বহু দূর, ভাই চায়না—" শিক্ষিতা নাতিনীর চার্ব্বাকতা বৃদ্ধার বুকে লাগল, তাই সে আর তর্ক না করে, নিমাই ও চয়ন যাতে সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন কাটাতে পারে সেই আশীর্ব্বাদ করতে করতে ঘর থেকে বেড়িয়ে গেল।

চয়নও একটু পরে ঘর থেকে বেড়িয়ে যাবার সময় নিমাইকে তাড়া দিয়ে গেল তৈরী হ'তে ; কোলকাতা যাবায় জন্য।

—কুড়ী—

বিহার প্রদেশের মেন রেলওয়ে লাইনের ছোট খাটো একটা জংশন স্টেশন।

সূর্য্য সবেমাত্র অস্ত গিয়েছে ; সন্ধ্যার ছায়া ধরণীর বক্ষে নামছে ধীরে ধীরে। মাঘ মাসের মাঝামাঝি—হু হু করে পশ্চিমে-বাতাস বয়ে লোকের অন্তরাত্মা পর্য্যন্ত কাঁপিয়ে দিচ্ছে : রাত্রে যে আরও শীত নামবে, এ তারই পূর্ব্ব সূচনা। চারদিক ধোঁয়ায় ধাঁয়াকীর্ণ ; ধোঁয়াগুলো উর্দ্ধে উঠতে না পেরে একটা সীমাবদ্ধ স্থানের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে যেন!···অদূরে কোয়ার্টারের ধূম নির্গতের চিম্‌নী দিয়ে নিঃশব্দে ধীরে ধীরে ধোঁয়াগুলো নির্গত হ'য়ে কুণ্ডলী পাকাতে পাকাতে চলে যাচ্ছে।···গিয়ে মিশে যাচ্ছে ওই দূরে—একটা

বাগানের প্রান্তর রেখার সঙ্গে। বাগানটা কাক-পাখী দ্বারা কলরব মুখর!...স্টেশনটা কিন্তু জন-কোলাহলহীন—নিস্তব্ধ। কেবল যখন ওদিকের ক্রস-গেটটা দিয়ে লোক যাচ্ছে তখন একটা শব্দ হ'চ্ছে ক্যাঁ—কট্ কট্। রেল লাইনটা বিনা কারণে থেকে থেকে শব্দ করছে--ঘট্ ঘট্।....একটা শিশুর ক্রন্দন ধ্বনি শোনা যাচ্ছে কোয়ার্টারের ওদিক থেকে। সেই ক্রন্দনের শব্দটা দুরে—মাঠের মধ্যে একটা বসতিহীন ছোট্ট কোঠাঘরের দেওয়ালে আছাড় খেয়ে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে যেন!....আর সেই প্রতিধ্বনি আকাশে বাতাসে মিশে আবহওয়াটাকে কোরে তুলছে করুণ। যেন শিশুর ক্রন্দনের কারণটা সর্ব্বসম্মুখে উদ্ঘাটিত করছে—'মা কোলে নাও; তোমার কোলে শুয়ে আমি ঘুমুব!....'

পাটনাগামী ট্রেণ ফেল করে এই ষ্টেশনে নিমাই এক পাশে একটা বেঞ্চের 'পর বসে বসে সে ওই সমস্ত শুনছিল কাণ পেতে। ইদানীং নিমাইয়ের চেহারাটা যেন বদলে গিয়েছে। একেই ঘন দাড়ি, তার উপর বহু দিন কামায়নি; চাপ দাড়ি গোঁফে মুখ ভর্ত্তি। তার উপর চোখ উঠেছে বলে একটা চামড়া সমেত কালার্ড চশমা সব সময় পরে থাকে। মাথাতেও এক ঝাঁকড়া চুল। তিন চার মাস আগেও তাকে যে দেখেছে সে তাকে এখন দেখলে চিনতে পারবে না।

নিমাই লক্ষ্য করেনি। অনতি দূরে অপর একটা বেঞ্চে এক মহিলা বসে ছিলেন। তাঁর বেশ ভূষার ও চেহারার অস্বাভাবিক

ভাবটা লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে, তিনি প্রকৃতিস্থ নয়; কি যেন একটা আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় মুহ্যমান।—যেমন ঘর-ছাড়া বিদুরা-বধূ ভরা-গাঙ্গিনীর তীরে এসে যখন দেখে, পাটনী পরপারের উদ্দেশ্যে নৌকা ছেড়ে মাঝ গঙ্গায় চলে গিয়েছে; ঘাট জন-প্রাণী শূন্য অথচ সম্মুখে আসন্ন সন্ধ্যা, তখন তার মনের অবস্থা যেরূপ হয়,—মহিলাটিকে বাইরে থেকে দেখে ঠিক সেই রকম অনুমানই করবে সে, যে তাকে দেখবে। প্রভাতে সরোবর থেকে একটা সদ্য-প্রস্ফুটিত পদ্ম তুলে এনে যদি রাস্তায় ফেলে রাখা হয়, তবে দিনান্তে রৌদ্র-দগ্ধ সেই ফুলটির অবস্থা যেরকম হ'বে, মহিলাটির মুখখানির অবস্থাও ঠিক সেই রকম। দুই হাতে অঙ্গুলিতে অঙ্গুলি সংযোগ করে তদ্দ্বরা একটা হাঁটু টেনে মাথা নত করে বসে আছেন; পাশে একটি মাঝারি রকমের চামড়ার সুটকেশ।

স্থায়ী কোনো চিন্তাই নিমাইয়ের মাথায় কোনো দিনই ঠাঁই পায় না। বিশেষতঃ সে যখন একলা থাকে, তখন তার একমাত্র সাথী এলোমেলো চিন্তা। সন্ধ্যা যখন প্রায় ঘনিয়ে এসেছে, তখন একটা কুলি এসে বললে,—"বাবু, হুঁয়া এক জানানী আপ্‌কো বোলাতেঁ—" বলে সে হাতটা বাড়াল মহিলাটির দিকে।

"কৌন? হামকো?" নিমাই এক রকম চমকে উঠল। সে আর উত্তরের অপেক্ষা না করে নিজের ব্যাগটী নিয়ে মহিলাটির দিকে অগ্রসর হল।

নিমাই ইতিপূর্ব্বে মাত্র দু'টি কথা তার এক বন্ধুকে বলেছিল,

যিনি কিছুক্ষণ পূর্ব্বে কলিকাতা-গামী লুপ এক্সপ্রেসে গিয়েছেন। "আমার যাওয়ার সম্ভাবনা নেই"—এই ভাবে তাকে কেউ ধরে নিতে পারে বাঙ্গালী বলে।

ইত্যবসরে মহিলাটি উঠে দাঁড়িয়েছেন। তিনি দাঁড়াতে যেন আর পরেছেন না; ক্লান্তিতে, অবসাদে সর্ব্বাঙ্গ ভরে গিয়েছে তাঁর।

কাছে গিয়ে আলো-আঁধারে দণ্ডায়মানা মহিলাটিকে দেখে নিমাই এমন ভাবে চমকে উঠল, যেন তাকে কে এক ঘা চাবুক মারলে। সে অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করল, আরে! বসু নয়?····বসুর কথা মনে হ'তেই ক্ষণিকের জন্য তার মন ঘৃণায় ভরে উঠল। তার চোখের উপর ভেসে উঠল সেই দুই বৎসর পূর্ব্বে সাদার্ণ এভিনিউয়ের ঘটনার ছবিটা। অপমান লাঞ্ছনার কথা মনে হোতেই তার সর্ব্বাঙ্গে কে যেন শত সহস্র ছুঁচ ফোটাতে সুরু করল।

নিমাই কাছে যেতেই মহিলাটি তাঁর সুটকেশটি তুলে নিয়ে, নিমাইকে তাঁর পিছু পিছু যাবার জন্য ঈসারা করলেন। তাঁর কথা বলার মতো শক্তি ছিল না; মুখ আঠা বেঁধে আছে ক্ষুধায় তৃষ্ণায় নয়,—ও জিনিষ একেবারে তিরহিত হয়েছে বলে।

নিমাই যন্ত্র-চালিতের মতো তাঁকে অনুসরণ করতে লাগল। এরই মধ্যে তার মাথা দিয়ে বয়ে যেতে লাগল চিন্তার ঝড়। ভাবল,—যদি সত্যিই বসু হয়, তবে কেন কি করে কে নিয়ে এল এখানে ওকে?

অনতিদূরে একটা বয়েটিং রুমে গিয়ে ঢুকল দুজনায়। ভৌতিক

মন্ত্র তন্ত্র দিয়ে নিমাইকে মহিলাটি যেন তার ব্যক্তিত্ব থেকে চ্যুত করে দিয়েছেন। তিনি রুমের কপাট দুটি বন্ধ করে দিলেন। ঘরের ভিতর অন্ধকার। শুধু ঈষৎ আলোর আবছা ভাব আসছে দূরের একটা আলো থেকে। মহিলাটি স্যুটকেশটা নামিয়ে গলাটা পরিষ্কার করে নিলেন; নেওয়ার পরও নীরবে তিনি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। যেন তাঁর বক্তব্য কি ভাবে বলবেন তা' এখনও ঠিক করে উঠতে পারেন নি। নিমাই নিঃশ্বাস বন্ধ করে নীরবে প্রস্তর মূর্ত্তির মতো দাঁড়িয়ে রইল।

"আমি অশ্রয়হীন, অসহায়।—আমায় রক্ষা করতে হ'বে আপনাকে—" কাতর ভাবে বলে মহিলাটি নিমাইয়ের পায়ের তলায় বসে পড়লেন।

একি! বসুর গলার আওয়াজ নয়? তাই তো! সত্যিই তো সে! কি হ'য়েছে? কি ব্যাপার!...এই দারুন শীতে ঘেমে উঠল নিমাই। কিন্তু সে কথা বলতে পারলে না; সে বলবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে গলার স্বর বিকৃতি করবার তরজমা করতে লাগল মনে মনে। সে নিজেকে নিজেই প্রশ্ন করল,—চিন্‌তে পারেনি তো? না, তা' পারে না; সে নিজেই এখন নিজেকে চিনতে পারে না।

"কি হ'য়েছে ব্যাপার কি—" পূর্ব্বের মতই সবিনয়ে মহিলাটি বলতে লাগলেন: "এসব এখন কৃপা কোরে জিগ্যেস করবেন না; শুধূ একটা অসহায় নারী আপনার সাহায্য প্রার্থনা করছে, এইটেই

আপনি জেনে নিন। আপনি পুরুষ শক্তিমান, অনায়াসে একটা নারীকে আশ্রয় দিয়ে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে পারেন। আর তা' যদি না করেন তবে আমার অবস্থা আপনি কল্পনা করে নিন—" মহিলাটি আকুল ভাবে নীরবে রোদন করতে লাগলেন।

নিমাই তখনও নির্ব্বাক। নিশ্চল। সে গলার স্বরেই নিঃসন্দেহ ভাবে ঠিক করে নিলে যে, এ বসু। বসুকে-যে সে চেনে! তার চলন বলন সব কিছু যে তার অতি পরিচিত! নিমাইয়ের মানশ্চক্ষে ফুটে উঠল বসুর সব কিছু! কিন্তু সে অপমান?—না না না।— সে সব কিছু নয়; সে অপমান নিমাই মন থেকে মুহূর্ত্তে মুছে ফেলল। কিন্তু একথাও সে না ভেবে পারল না যে, কে তাকে এই রূপ সহায়হীনা করলে? মাথায় সিঁন্দুরের দাগ রয়েছে, কিন্তু স্বামী কোথায়? নিমাই নিজেকে লুকিয়ে রাখবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল। না, সে পরিচয় দেবে না। সে পূর্ব্বের মতোই দাঁড়িয়ে রইল।

"আমি আপনার কাছে আত্মসমর্পন করলাম। আমাকে আপনি মারুন, ধরুন, কাটুন, বিক্রি কোরে ফেলুন,—আমি কিচ্ছু বোলব না—" বলতে বলতে মহিলাটী উঠে দাঁড়ালেন।

নিমাইয়ের মধ্যে তখন নিমাই ছিল না; তবু কোন্ একটা শক্তির প্রেরণায় পকেট থেকে নোট্ বুক বার করে প্রশ্ন করল বিকৃতি স্বরে, "আপনার নাম?"

"বসুমতী—"

নিমাই চমকে উঠল। পরে সে একটা শুকনো ঢোক গিলে নিলে। আরও খাট স্বরে প্রশ্ন করলে,—"পদবী কি ?"

"পদবী—" বলে নীচের ঠোঁটটা দাঁত দিয়ে সজোরে কামড়ে চিন্তা করতে লাগলেন—যেন তাঁর দুটো পদবী। "পদবী—আচ্ছা আমার বাবার পদবী অনুসারে রায় করলে… রায়ই করুন আপনি, দয়া কোরে। আপনার কোনো ভয় নেই ; আমার দ্বারা আপনার কিছু মাত্র অনিষ্ট হ'বে না। পরে আমি সব কথা খুলে বোলবো আপনাকে—" বসুমতী বললে সবিনয়ে।

"বাবার নাম ?"

"গোপাল চন্দ্র রায়—"

"স্বামীর নাম—"

"অনুগ্রহ কোরে ওটি এখন জানতে চাইবেন না ; পরে সমস্ত আপনাকে খুলে জানাব ;—কথা বোলতে আর পারছি না, বড় কষ্ট হ'চ্ছে আমার। একটু জল এনে খাওয়ান ; পিপাসায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে—" সকাতরে বললে বসুমতী।

নিমাই এতক্ষণ যেন ঘুমিয়ে ছিল। তার চেতনা হল হঠাৎ। সে ভাবল, একি ! আমি বসুর ওপর অত্যাচার করছি কেন ? বসুকে নির্দ্দয় ভাবে জোর করে তাকে কষ্ট দিচ্ছি—কি নিষ্ঠুর আমি ! 'পিপাসায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে' কথাটা শুনে নিমাইয়ের বুকে শেল বিঁধল যেন। সে আর এক মূহুর্ত্তও অপেক্ষা না করে জলের অন্বেষণে বয়েটিং রুম থেকে বেড়িয়ে গেল ঝড়ের মতো।

বেড়িয়ে যাবার সময় তার চীৎকার করে ব'লতে ইচ্ছা হল,—ভয় নেই, ভয় নেই বসু—আমি নিমাই সান্ন্যাল ; যে তোমাকে একদিন প্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছিল, তোমার নিমুদা। কিন্তু বিবেক তাকে উপদেশ দিল যে, সে যেন এখন নিজেকে লুকিয়ে রাখে বসুর কাছ থেকে।

পাটনা সহরের পূর্ব্ব-পশ্চিমগামী একটা বড় রাস্তা থেকে নাতিপরিসর একটা গলি বেড়িয়ে গিয়েছে উত্তর দিকে। সেই গলিতে পাকা গাঁথুনির উপর খাপরা দিয়ে ছাওয়া একটা কুঠুরী ঘরে নিমাইয়ের বাসা। দেখতে কতকটা বড় বাড়ীর বৈঠক খানার মতো। পশ্চিম দু'য়ারী ঘর। বারান্দার নীচেই গলির রাস্তা, আবার ওই ঘরের উত্তর দিকের দেওয়াল ঘেঁসে একটা সরু গলি পূর্ব্বদিক চলে গিয়েছে। বাড়ীর ভিতর পূর্ব্বদিকে পাঁচীল দিয়ে ঘেরা, খানিকটা খোলা জায়গা ; এক পাশে একটী ছোট রান্নাঘর, অন্য পাশে কুঁয়া।

বসুমতীকে নিয়ে নিমাই যখন বাসায় উপস্থিত হল, রাত্রি তখন অনেক হোয়েছে। সে তার লণ্ঠন জ্বালল না ; আসবার সময় মোড়ের মাথায় বিড়ির দোকান থেকে মোম-বাতি কিনে এনে ছিল, তাই জ্বালল। লণ্ঠন না জ্বালবার কারণ হচ্ছে, পাছে বসুমতী তাকে চিনে ফেলে। কুঁয়া থেকে জল তুলে দিলে হাত মুখ ধোবার জন্য। ছুটোছুটী করে দোকান থেকে হুকুম দিয়ে খাবার

তৈরী করিয়ে আনলে। ঘরের ভিতর দিকের বারান্দায় বসুমতীকে খেতে বসিয়ে, ঘরে ঢুকে বিছানা ঝেড়েঝুড়ে ঠিক করে রাখল।....
বসুমতীর কথাগুলো তার কাণে বাজতে লাগল,—'আজ দু' দিন আমি অনাহারে অনিদ্রায় কাটাচ্ছি'—বসুমতীর সে-কষ্ট নিমাইকে কি ভাবে পীড়িত করেছে তা' একমাত্র অন্তর্যামী আর সে নিজে জানে। তাই, সে নিজের ক্ষুধা তৃষ্ণা সব কিছু ভুলে গেল। বসুমতীর খাওয়া শেষ হ'তেই, বিছানা দেখিয়ে দিলে নীরবে হাত বাড়িয়ে। জানাল সে, ভয় করবার কিছু নেই পাশেই সে থাকবে; তখনই ঘরে খিল দিয়ে শুয়ে পড়তে অনুরোধ করল।

বসুমতী দ্বিরুক্তি না কোরে তখনই ঘরে ঢুকে খিল দিয়ে দিলে। ক্লান্ত দেহটা বিছানার 'পর এলিয়ে দিয়ে, কমল হাল্কি লেপখানা চড়িয়ে দিলে গায়ে; শুয়ে শুয়ে সে ভাবতে লাগল,— কে এ ভদ্রলোকটি; মানুষের প্রতি এত সেবাযত্ন! সে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা না করে পারল না যে, ভদ্রলোকটির যেন তিনি মঙ্গল করেন। কিন্তু তাকে বেশীক্ষণ চিন্তা করতে অবসর না দিয়ে নিদ্রাদেবী এসে তার সমস্ত ক্লান্তি মুছে নিলেন।

নিমাই রাস্তার দিকের বারান্দায় এসে দাঁড়াল, উদ্দেশ্য খেতে যাবে। একটা দমকা বাতাস বয়ে যেতেই তাকে শীতে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপিয়ে তুলল। সে আর অপেক্ষা না করে পা বাড়িয়ে দিলে দোকানের দিকে।

কিছুক্ষণ পরে যখন সে এসে দাঁড়াল বারান্দায় তখন বাঁকীপুর

ফাঁড়ীর ঘড়িতে বারটা বাজার শব্দ শোনা গেল। সে চুপটি করে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল,—এখন কোথায় শোওয়া যায়? চিন্তায়, বসুমতীর ভাবনায় তার গায়ের রক্ত গরম হ'য়ে গিয়েছিল,—তা' ক্রমশঃ ঠাণ্ডা হ'য়ে আসতে লাগল।···সত্যই এখন সে কোথায় শোবে, কার কাছে যাবে এই দারুন শীতের রাত্রে? আর বসুমতীকে একলা এখানে ফেলে রেখে সে যাবেই বা কোথায়? আর, তা' ছাড়া, যাবার স্থানই বা কোথায়! বহুক্ষণ ধরে চিন্তা করেও কোনো উপায় ঠিক করতে পারল না। সে শুনতে পেল বসুমতীর নাক ডাকছে—ঘর্-র্-র্, ঘর্-র্-র্।—সে লক্ষ্য করল অনতি দূরে উকিলদের মেসের বারান্দার নীচে একটা অর্দ্ধভগ্ন দড়ির খাট পড়ে আছে। ও-খাটটায় মেসের একটা চাকর শোয়, কিন্তু সে দেশে গিয়েছে ব'লে খাটটা ক'দিন ধরে ওইখানেই পড়ে থাকতে দেখেছে নিমাই। নিঃশব্দে সেখানা নিয়ে এল সে ঘাড়ে করে; এনে পাতল বারান্দায়। একবার নাড়া চাড়া দিয়ে দেখল,—ওপরে শুলে পড়ে যাবার সম্ভাবনা আছে কি না। না, তা নেই। চাদরটায় নিজেকে ঢেকে সে শুয়ে পড়ল।

তন্দ্রাচ্ছন্ন হ'য়েছে নিমাই, এমন সময় সে অনুভব করল কে যেন তার গায়ে জল ঢেলে দিলে! জেগে উঠল সে। জল ঢেলে দেয়নি কেউ, হু-হু করে শীতের হাওয়া বইছে। কাঁপিয়ে তুলল তার অন্তরাত্মাকে। হাঁটু দুটো হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরে, তার ওপর থুতনিটা রেখে সে বসে রইল গুড়িশুড়ি মেরে। সে এতক্ষণ

লক্ষ্য করেনি যে, তার গায়ে একটা সূতী সার্ট আর পাতলা খদ্দরের চাদরটা ছাড়া আর কিছু নেই। বাসায় এসে হাত মুখ ধোবার সময় কোট, পশমের পুলোভারটা খুলে রেখেছিল,—তাড়াতাড়িতে আর পরবার সময় পায়নি; আর তখন ওদুটো পরবার প্রয়োজন আছে, এ চিন্তা তার মনের মধ্যে উদয়ই হয়নি। তখন তার একমাত্র চিন্তা ছিল, কি করে বসুমতীর ক্লান্তি অপনোদন করবে। সে এখন ভাবল,—কি বোকামী কাজই না সে করেছে, সে দুটোকে গায়ে চড়িয়ে না রেখে? এখন তার মাথায় বুদ্ধি গজাতে লাগল, কি করা তার উচিত ছিল, না ছিল। সে একবার ভাবল, বিছানার চাদরের তলায় যে র‍্যাগটা পাতা আছে সেখানা নিয়ে আসে বসুমতীকে উঠিয়ে। কিন্তু তা' করলে বসুমতীর কষ্ট হ'বে হয় ত,—নীচে ওপরে বেশ গরম হয়; আরাম দেয় বেশ।—সবচেয়ে ভালো ছিল, সে ভাবল, কোট আর পুলভারটা গায়ে দিয়ে অসা; তার মনের মধ্যে একবার উদয় হল, বসুমতীকে উঠিয়ে ও দুটো নিয়ে এলে কেমন হয়? মনে হ'তেই সে জিভ দিয়ে দাঁত কাটল—ছিঃ ছিঃ।···কিন্তু শীত, দারুণ শীত! হওয়া বইছে—হু-হু-হু। শীতের হাওয়া ঢুকে নিমাইয়ের কাণ দুটো কট্ কট্ করতে লাগল। সুপ্তিমগ্ন সহরটা ঠাণ্ডায় জমে বরফ হ'য়ে গেল, গেল অবস্থা!···জ্যোস্না রাত্রি; কিন্তু মনে হ'চ্ছে, বরফ বৃষ্টি যেন! বস্ত্রহীন একটা পাগল মাঝে মাঝে শব্দ করছে, হো—হোক্। মোড়ের মাথায় ময়রার দোকানের উনানের ভেতরে একটা কুকুর

শুয়ে শব্দ করছে—কুঁই কুঁই কুঁই। এছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। কেবল যেন বরফ পড়ছে! হঠাৎ···নিমাইয়ের তলপেট থেকে একটা তরঙ্গ বুক পর্য্যন্ত উঠে তাকে দাঁড় করিয়ে দিলে। সে উঠে দাঁড়িয়ে কোঁচার খুঁটটা গায়ে জড়ান চাদরের ওপর দিয়ে। কিন্তু তাতেও বিশেষ সুবিধা হল না, ডান পায়ের অর্দ্ধেকটা উলঙ্গ হ'য়ে গেল। সে কাঁপছে—থর্ থর্ থর্। দাঁতগুলো—কাট্ কাট্ কাট্ শব্দ করছে। শীতে সর্ব্বাঙ্গ শিউরে তার দেহের শিরগুলো ছিঁড়ে যায় বুঝি এবার! কি করবে ভেবে ঠিক করে উঠতে না পেরে সে বারান্দার এক দিক থেকে আর একদিক পর্য্যন্ত ছুটোছুটী আরম্ভ করে দিলে—পাগলের মতো।··· বসুমতীর নাক ডাকছে—ঘর্-র্ র্, খর্-র্-র্! আহা! নিমাই ভাবল, ঘুমুক বসু, দুদিন আজ ঘুমেয়েনি—আহা! সে কিন্তু স্থির হ'তে পারছে না, শীতের জন্য। বারান্দা থেকে নেমে পড়ে সে উকীলদের মেসের দিকে ছুটল, তাদের বারান্দায় কতকগুলো কাপড় শুকোচ্ছে দেখে। গিয়ে সে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল খানিকক্ষণ। ভাবল, হ্যাঁ - কাপড়গুলো এখন নিয়ে গিয়ে গায়ে দিই; ভোর বেলায় রেখে গেলেই হ'বে। কিন্তু হাতটা ভিতর থেকে আস্তে আস্তে বা'র করে কাপড়গুলো নেড়েচেড়ে দেখলে যে, সেগুলো এখনও ভিজে! মুখটা শিষ দেবার মতো করে সে ভাবল,—তাই তো কি করা যায়!···সে আবার এক ছুট দিয়ে নিজের বাসার বারান্দায় এসে দাঁড়াল।····ঢনং ঢনং···। দুটো

বাজল। যাক্, রাত আর শেষ হ'য়ে এসেছে, ভাবল সে। কিন্তু বড্ড শীত ; এখনই গায়ে কিছু দিতে না পারলে সে জমে বরফ হ'য়ে যাবে। বারান্দার কোণে সে কুকুরকুণ্ডলী হ'য়ে বসল খানিকক্ষণ। উঃ, কি শীতরে বাবা—বলে সে উঠে পড়ল আবার। সামনে একটা গরুর গোয়াল ঘর। তৎসংলগ্ন একটা চালা ঘর ; সে ছুটে গেল সেইদিকে। গিয়ে ঘাড়টা একদিকে ঈষৎ বেঁকিয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল—কিছু খড় গাদা দেওয়া আছে, সেইগুলোকে।...একবার ভাবল,—যাবে নাকি ওই খড়গুলোর ভিতর ঢুকে? তা' হ'লে শরীরটা বেশ গরম হয়! আবার পরক্ষণেই ঠিক করলে,—না, তা' হয় না ; কিছু থাকলে কামড়ে দেবে!...খড়গুলোর পাশে তালপাতার নাতিদীর্ঘ একটা চেটি পড়ে রয়েছে। সে পূর্ব্বের মতো ঘাড় বেঁকিয়েই হাত দুটো মুঠো করে বুকের মধ্যে নিয়ে তার 'পর থুত্‌নিটা রেখে দেখতে লাগল সেটাকে। কি ভেবে সে একটু মুচকি হাসল। সন্ত্রস্ত ভাবে একবার চার দিক একবার চেয়ে নিলে ; তারপর তাড়াতাড়ি ক'রে গাদা থেকে কতকগুলো খড় ফেরে বগলদাবা ক'রে অন্য হাতে চটিটা নিয়ে দিলে নিজের বারান্দার দিকে ছুট। এসে ভাবল,—হ্যাঁ, এবার ঠিক হ'বে।—আঁটি খুলে খড়গুলো এলাল সে, পরে সেই এলান খড়গুলো চেটিটার ওপর পাতি পাতি করে পাতল বেশ পুরু করে। আর একবার আপন মনে মুচকে হাঁসল। হেঁসে অস্ফুট স্বরে বললে,—'ঠিক হ'য়েছে এবার'। বসা অবস্থায় পিছু হটতে হটতে

অতি সন্তর্পনে চেটিটাকে টেনে নিয়ে গেল বারন্দার এক কোণে। গিয়ে গুড়িশুরি মেরে বসে আস্তে আস্তে চটিটাকে খাড়াই ক'রে দু' দিকে দু' হাতে ধরে নিজের গায়ে চেপে ধরল।— আঃ বাচলাম বাবা; বেটা শীত? এবার কোথায় যাবে? মনে মনে কথাগুলো বললে নিমাই। খুব-খুব জোরে চেপে ধরল সে চটিটা নিজের গায়ে। সে ভাবল,—যাক, বাঁচা গেল শীতের হাত থেকে। ঘরের ভিতর বসুমতীর নাক ডাকছে – ঘর্‌-র্‌-র্‌, ঘর্‌-র্‌-র্‌।··· আহা, ঘুমুক; নিমাই ভাবল,—বসু বিছানায় লেপ মুড়ি দিয়ে আরামে শুয়ে আছে, আর-আমি এই কোণে কি ভাবে রাত কাটাচ্ছি! তা' হোক্ গে; পরক্ষণেই সে ভাবল, আমি পুরুষ কষ্ট সহিষ্ণুতাই আমার ধর্ম্ম। বসু নারী। না, না,— বসু তো শুধু নারী নয়; সে যে 'বসু',—যাকে সে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে। কিন্তু···কিন্তু···বসুর বিয়ে হ'য়ে গিয়েছে! নইলে তার মাথায় সিঁদুর কেন? তা' হ'লে তার আর ভালবাসায় লাভ কি?····না, এখানে লাভ ক্ষতির প্রশ্ন অবান্তর, বসুকে সে ভালবাসে, শুধু ভালবাসার খাতিরেই সে ভালবাসে। "ভয় নেই বসু", চীৎকার করে বসুকে অভয় দিতে তার প্রাণ চাইলে,— "ভয় নেই আমি আছি; যার নাম নিমাই সান্ন্যাল"। কিছুক্ষণ পরে তার মনে হল,—বসু···চয়ন···মায়া···কিরণ···নরেন···অমলা সব এক সঙ্গে ভীড় করে এসে তার এই দুরবস্থা দেখছে! লজ্জায়, সঙ্কোচে সে যেন মনে মনে ছোট হয়ে গেল।···সত্যিই তারা

এসেছে কিনা দেখবার জন্য আস্তে আস্তে একদিক দিয়ে উঁকি মেরে দেখল। দেখল, একটা কুকুর চাটাইটা শুঁকছে; তার মতলব, ঠ্যাং তুলে সেটাকে অপবিত্র করে দেওয়া।—"হেই, ভাগ—" কথা দুটো নিমাইয়ের গলা থেকে বেরুল খুব ক্ষীণ ভাবে। কুকুরটা ভয়ে 'কেঁউ—' শব্দ করে ছুটে পালাল।

ভর বেলার দিকে নিমাই একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হ'য়ে পড়ল। কিন্তু সারা রাত্রি শীতে কষ্ট ভোগ করে, অনিদ্রায় দেহের বাঁধন যেন খুলে গিয়েছে। তার চোখ মুখ নাক করছে জ্বালা, মাথার ঘিগুলো গলে পাতলা হ'য়ে গিয়েছে যেন! গায়ের রক্তগুলোও মরে সর্ব্বাঙ্গে চাপ বেঁধে আছে বোলে মনে হ'ল তার; দাঁতের মাড়ী নীরস, গলা শুক্‌নো। দেহাভ্যান্তরের যত সমস্ত অ-শিব পদার্থের দুর্গন্ধ নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে অনুভব করতে লাগল সে। আর সে কাণ পেতে শুনতে লাগল পাকস্থলীর কারখানার নানা রকম শব্দ। দেহটা তার আড়ষ্ট হ'য়ে মনে হ'চ্ছে যেন একটা তার-ছেঁড়া, ভিজে বীণা; সেটাকে বাজাতে গেলে শব্দ হ'বে ভ্যাঁ, ভোঁ, ভাঁ···

নিমাই নিদ্রার আশা ত্যাগ করে, রাত্রির অবশিষ্টটুকু জেগে কাটিয়ে দেবার মনস্থ করলে।

দিনের বেলা বাইরে থেকে নিমাই বসুমতীর দরকারী যাবতীয় জিনিষ খাবার দাবার থেকে আরম্ভ করে সব কিছুই পাঠিয়ে দিলে। গত রাত্রের অভিনয় যাতে পুনরাভিনীত না হয় তার জন্য সে নিকটবর্ত্তী স্থানে এক বিহারী ভদ্রলোকের হোটেলে নিজের জন্য বন্দোবস্ত করে নিলে অস্থায়ী ভাবে কিছু দিন থাকবার। এক সেট বিছানা পত্র নতুন কিনলে; বিছানা কেনবার সময় তার মনে হয়েছিল, গত রাত্রের শীতটাকে লজ্জা দেবার জন্য এক সঙ্গে দশখানা লেপ কিনবে নাকি?—বসুমতীকে স্থায়ী ভাবে অথচ সকল স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে কোথায় রাখা যায় তা' এখনও সে ঠিক করে উঠতে পারে নি। তাই কয়েক দিনের জন্য সে ঠিকে ঝি ও রাঁধুনীর বন্দোবস্ত করলে—বসুমতীর তত্ত্বাবধানের জন্য।

সন্ধ্যা বেলায় সে চুপে চুপে বাসায় এসে উঁকি মেরে দেখলে যে, বসুমতী রান্নাঘরে রাঁধুনী ঠাকুরাণীর কাছে বসে আছেন। সে নিঃশব্দে ঘরের মধ্যে ঢুকল; উদ্দেশ্য, কতকগুলো জামা কাপড় ট্রাঙ্ক থেকে বা'ড় করে নেবে। বসুমতী কিন্তু লক্ষ্য করেছে; তার অবস্থাটা এখনও স্বাভাবিকতায় আসেনি, দেখলে কাঠগোড়ায় খুনী আসামীর মতো মনে হবে। কি একটা দুশ্চিন্তার ছায়া তার চোখে মুখে এখনও ফুটে রয়েছে। নিমাই আস্তে আস্তে ট্রাঙ্ক টেনে বা'র করল খাটের তলা থেকে। একটা মোমবাতি জ্বালল। হাঁটু-গেড়ে

বসে অন্য হাঁটুতে থুত্‌নিটা রেখে নিঃশব্দে কাজ সারতে লাগল।

"আমি আপনার চিঠি পড়েছি—" বলতে বলতে বসুমতী ঘরে ঢুকল।

নিমাই এমন ভাবে চমকে উঠল, একটু হ'লেই তার মুখটা ট্রাঙ্কের ঢাকনার সঙ্গে ঠুকে গিয়েছিল আরকি! কিন্তু ওই চমকে উঠাতে তার একটা লাভ হ'ল,—বাতীটা একটা ঠোকা খেয়ে উল্‌টে পড়ে গিয়ে নিবে গেল; যেতেই ঘরটা হ'য়ে গেল অন্ধকার: নিমাই মনে মনে বললে, যাক্ বাঁচা গেল বাবা, এক্ষুনি চিনে ফেলেছিল আর কি! সে মুখ নীচু করে বসে রইল।

"আপনি জানতে চেয়েছেন—" বসুমতী নিমাইয়ের সামনে এসে কিছুদূরে খাটটার এক কোণায় বসে বললে,—'সুটকেশে কত কি আছে। ঠিক যে কত আছে, তা' আমি জানি না; তবে অনুমান শ'সাতেক টাকা আর কিছু গহনা আছে। সে যাই থাক—" নিমাইয়ের 'পর সম্পূর্ণ ভাবে বিশ্বাস রেখে সে বললে,—"তার জন্য আপনি কোনো চিন্তা করবেন না; আপনি যা ভাল বোঝেন তাই করবেন—" বলে বসুমতী ঘাড় গুঁজে কি চিন্তা করতে লাগল। সে যেন চাইলে আরও কিছু বলতে নিমাইকে। কিন্তু যে-কথাটা বলবে সেটা গলা পর্য্যন্ত এসে আর বেরুতে চাইছে না। এদিকে উভয় পক্ষের দীর্ঘ-নীরবতা ঘরের আবহাওয়া অস্বস্তিকর হ'য়ে উঠেছে। নিমাইয়ের অলক্ষ্যে বসুমতী কয়েক বার তাকিয়ে নিলে

তার প্রতি; সে পূর্ব্বের মতোই ঘাড় নীচু করে বসে আছে। বসুমতী সাহস করে তার বক্তব্য শেষ করতে চাইলে; কিন্তু কথা মুখ থেকে বেরুবার আগে তার দেহের সমস্ত রক্ত মুখে জমে লাল হয়ে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে কাণ দুটোও হ'য়ে উঠল গরম আগুন।

"আপনি আমার প্রাণ রক্ষা করেছেন—" মুখ নীচু করে অতি কষ্টে বলতে স্বরু করলে বসুমতী,—"আপনি আমার অশ্রয়দাতা, সেইজন্য সমস্ত সত্য ঘটনা আপনাকে জানান আমার উচিৎ বলেই আমার মনে হয়—" বলে একটুখানি চুপ করে রইল।

এদিকে নিমাইয়ের অবস্থা হ'য়ে উঠেছে কাহিল। সে বেচারী এসেছিল চুপে চুপে নিজের কাজ সেরে সরে পরবার জন্য। কিন্তু এই অব্যবস্থিত আলোচনায় আটক হ'য়ে তার দম বন্ধ হ'বার উপক্রম হল। সে ঘেমে উঠল ভেতরে ভেতরে।

"আপনাকে দুটি জীবের প্রাণ রক্ষা করতে হবে—" শান্ত ও বিনয় সহকারে কথাকয়টি বসুমতী বলে কি যেন একটা ত্রাসে কাঁপতে লাগল। নিমাই কিন্তু এটা লক্ষ্য করেনি, কেন না সে পূর্ব্বের মতো মুখ নীচু করেই বসে আছে।

"অর্থ?" নিমাই বসুমতীর কথায় বিস্মিত হ'য়ে প্রশ্ন না করে পারলে না; অথচ সে চায় যে তাকে কথা যাতে মোটেই বলতে না হয়। বসুমতী উত্তর দিতে দেরী করছে দেখে নিমাই প্রশ্ন করল,—"বাইরে আর কেউ আছে না'কি?"

"সে কথা শুনলে ঘৃণায় ঘাড় ধরে এখনই আমাকে ব'ার করে

দেবেন পথে—" বসুমতীর মুখ নুয়ে একেবারে কোলের কাছে এসে পড়েছে, ভয়ে লজ্জায় নিজের প্রতি নিজের ঘৃণায়।

বসুমতীর কথা কয়টা নিমাইয়ের বুকে গিয়ে ধক্ করে লাগল। সে ভাবল,—এই নারী আমাকে এমনই অমানুষ বলে মনে করে যে, আমি তাকে ঘাড় ধরে পথে বা'র করে দেব—অসহায় জেনেও! তাই সে ব্যথিত হ'য়ে গলার স্বর পুরোপুরি বিকৃতি করতে একরকম ভুলে গিয়ে বলল,—"আপনার অভিজ্ঞতা থেকে জগতটাকে যদি ততটা তিক্ত বোলে মনে হয়, যতটা আপনি মনে করছেন, তা' হ'লে আমার আর বলবার কিছু নেই। তবে আমার একটা কথা হোচ্ছে যে, আমি একটা সামাজিক জীব; মানুষের কাছ থেকে আমি উপকার পেয়েছি এবং ভবিষ্যতে যে আমাকে আবার মানুষের দ্বারস্থ হ'তে হ'বে না, একথা বলবার মতো স্পর্দ্ধাও আমার নেই। তাই মানুষ অসহায় অবস্থায় কারুর শরণাগত হ'লে, সে যদি তাকে সাহায্য না করে। তবে তার স্থান সমাজে নয়; জঙ্গলের গাছ পালায় বোলেই আমার মনে হয়—" ধীর সংযত ভাবে কথাগুলি শেষ করে নিমাই এমন ভাবে ঘেমে গেল, যেন সে সবেমাত্র স্নান ক'রে উঠেছে। তার মনের মধ্যে কাল বৈশাখীর ঝড় বয়ে চলেছে···

আশ্রয় দাতার এরূপ মনোভাব দেখে বসুমতী আশ্বস্ত হ'ল। তবু সভয়ে বললে,—"আর মাস ছয়েক পরেই আমায় মা হ'তে হ'বে—" বলে সে সঙ্কুচিত হ'য়ে একেবারে এতটুকু হ'য়ে গেল।

অন্ধকারে ঝাঁকড়া চুল, এক মুখ দাড়ি কালার্ড চশমার মধ্যে নিমাইয়ের ভূতের মতো চেহারাটার দিকে একবার তাকিয়েই তিনি দৃষ্টি নামিয়ে নিলে।

"এ রকম অবস্থায় আপনি কি করেই বা ঘরছাড়া হ'লেন; আর আপনায় স্বামী—" কথাটা নিমাইয়ের গলায় আটকে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তার অন্তরটায় কে যেন মোচড় দিলে। সে এই আবহাওয়া থেকে এখন পালাতে পারলে বাঁচে।

"শুনুন, সব কথা আপনাকে খুলে বলছি—" বলে একটু নিজেকে নাড়াচাড়া দিয়ে দৃঢ় হ'য়ে বসুমতী বসল। তারপর সে বলে চল্ল যে,—তার বিয়ে হয়েছে সবে মাত্র আজ দশ দিন। এখন যিনি তার স্বামী, তাঁর সঙ্গে বিয়ে হ'য়েছে হঠাৎ; নিরুপায় হ'য়ে। তার বিয়ে হ'বার কথা ছিল অন্য এক ভদ্রলোকের সঙ্গে। তার মা সেই ভদ্রলোকটিকে নিজের জামাই মনোনীত করেছিলেন। তাই ভদ্রলোকটী তাদের বাড়ী যাওয়া আসা করতেন ঘন ঘন। এমন সময় তার মা মারা যাওয়াতে তাদের বিয়েতে হয় দেরী। কিন্তু তারা পরস্পরের প্রতি এতটা আকর্ষিত হ'য়েছিল যে, বিয়ে এক রকম সারা হ'য়ে গিয়েছিল গন্ধর্ব্ব মতে; আর এরকম বিয়েতে তারা কোনো রকম দোষ দেখতে পায়নি; কেননা একদিন যখন তারা প্রণয়-সূত্রে আবদ্ধ হ'বেই। তাই বসুমতী অস্বীকার করলে না যে, তাদের মিলনে উভয়েরই পূর্ণ সম্মতি ছিল। তার বাবা কোনো দিকে ভ্রূক্ষেপ করতেন না; তিনি আধ-পাগল-গোছের মানুষ।

রেলওয়ে কর্ম্মচারী, রাত্রিতে ডিউটি দিতে যেতেন; বাড়ীতে ঝি ছাড়া দ্বিতীয় অভিভাবক কেউ ছিল না। সেইজন্য তাদের আমোদ প্রমোদ নির্বিবঘ্নে পুরোমাত্রায় চলত। শেষে যখন তার বিয়ের যোগাড় হ'তে লাগল, তখন হঠাৎ তার মায়ের মনোনীত জামাতা সড়ে পড়েন। কিন্তু সে তখন সন্তান সম্ভবা। তখন সে ঘোর সঙ্কটের সম্মুখীন হল; কাকে বলবে কার পরামর্শ নেবে, কি করা উচিৎ না উচিৎ সে ভেবে ঠিক করে উঠতে পারলে না। তারপর তার সেই ভাবী স্বামী হঠাৎ চিঠিতে জানান যে, তিনি তাকে বিয়ে করতে নারাজ। কেন না, বসুমতী বললে যে, তার মা নাকি কথা দিয়েছিলেন স্বামীকে দিয়ে ভাবী জামাতার রেল অফিসে চাকরী করে দেবেন। কিন্তু ভদ্রলোকটীর ভাবী শশুরকে জিজ্ঞাসা করে যখন জানতে পারেন যে, চাকরী পাবার সম্ভাবনা মোটেই নেই, তখন তার মন ভেঙ্গে যায়। প্রসঙ্গক্রমে বসুমতী অবশ্য একথাটা বলতে পারলে না যে,—নিছক প্রেমের খাতিরে অর্থাগমের উপায়-রূপ-একটা-ভেলা বগল দাবা না করে আস্ত জগদ্দল পাথরের মতো একটা ধুমসো আইবুড়ো মেয়েকে গলায় বেঁধে সংসার সমুদ্রে সাঁতার দিতে নেমে ডুবে তলিয়ে গিয়ে প্রাণটা বেখোরে বিসর্জ্জন দিক আর কি।...এই সব চিন্তা কোরেই বসুমতীর তখন কার ভাবী বর প্রখর বুদ্ধির নমুনা দেখিয়ে প্রেমের প্রতি যুগপদ পদ ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে পিটটান মেরেছেন!...তারপর বসুমতী বলতে লাগল,—ভদ্রলোকটী তাকে জানিয়েছিলেন যে, তার বাবা যখন স্ত্রীর প্রতিশ্রুতি

রক্ষা করতে পারলেন না, তখন দোষটা তার যে প্রকৃতি ভঙ্গ করেছে আগে। তিনি নির্দ্দোষ; তাই, তিনি অপর এক উচ্চ পদস্থ রেল কর্ম্মচারীর মেয়েকে বিয়ে করবার কথা দিয়েছিলেন, যিনি তাঁকে রেল অফিসে চাকরী করে দেবার জন্য স্বয়ং প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলেন।

বসুমতী আরও বললে যে, তিনি তার ভাবী স্বামীকে চিঠির দ্বারা সমস্ত ব্যাপার জানিয়েছিলেন। জানিয়েছিলেন যে, এমতাবস্থায় তিনি যদি তার বাক্‌দত্তাকে বিয়ে না করেন তবে একটা নারীর ভবিষ্যৎ-জীবন কি ভয়াবহ তা' একবার ভেবে দেখতে; তা' ছাড়া তাঁর নিজেরও মঙ্গল হ'বে না এতে। কিন্তু কিছুতে কিছু হয়নি। তাই সে এক দিন মনস্থ করেছিল আত্মহত্যা করতে; কিন্তু মানুষের কাছে নির্দ্দয় ব্যবহার পেয়েও পৃথিবীর মায়া সে কাটাতে পারে নি, সংসারকে সে বড় ভালবাসে। ঈশ্বরের হাতে নিজেকে সমর্পন করে বসেছিল।

"তাই, প্রকৃতির নিয়ম যখন পাল্টানো যাবে না—" বসুমতী কিছুক্ষণ চুপ কোরে পর একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস মোচন কোরে বললে : "লোকের চোখে ধুলো দেওয়া যখন সম্ভব নয়, তখন ঠিক করলাম বিয়ের পর স্বামীকে সত্য কথাটা বলবো।...আর বললামও; আমাদের প্রথম-রাত্রের সন্ধার আগে। তিনি গুম্. হ'য়ে বসে সব কথা শুনলেন। কিন্তু আমি ক্ষমার অযোগ্য বোলে তিনি ঘরছাড়া হোলেন—যখন আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। ভোর বেলায় উঠে যখন

দেখলাম তিনি নেই, তখন চারদিক খোঁজাখুঁজি করলাম নীরবে কিছুক্ষণ। বাড়ী থেকে বেড়িয়ে দেখলাম শিশিরে ভেজা রাস্তায় তাঁর জুতোর দাগ বরাবর চলে গিয়েছে মাঠের দিকে। ভাবলাম সেই দাগ দেখে দেখে আমিও তাঁর অনুসরন কোরবো; কিন্তু সে-দাগ কিছু দূর গিয়ে মিলিয়ে গিয়েছে দেখলাম। বেড়িয়ে যখন পড়েছি তখন আর বাড়ীতে থাকবো না বোলে সুটকেশটা নিয়ে বেড়িয়ে পড়লাম—”

নিমাই কথাগুলো শোনার পরে সে পিছিয়ে গেল তার অতীত জীবনে—অনেক দূরে—সেই আশ্রম জীবনে। সে ভাবল,—ভাগ্যি আশ্রমের বৃদ্ধ বাসুদেব গোস্বামীর কথা' শুনে বেড়িয়ে এসেছিল! যদি না আসত, তবে সমাজে এই মনুষ্য-চর্ম্মাবৃত এক অসহায় জীবের পদে পদে পাগলামীর সঙ্গে সে পরিচিত হ'তে পারত না; সেটা কি কম দুর্ভাগ্যের কথা!

“আপনি ভাববেন না কোনো রকম কিছু; আমার বুকের এক বিন্দু রক্ত থাকা পর্য্যন্ত আপনার গায়ে কাঁটার আঁচড় লাগতে দেব না—” বলে বাটিতি ঘর থেকে বেড়িয়ে গেল নিমাই।

বসুমতী সকৃতজ্ঞ নয়নে নিমাইয়ের প্রতি একবার তাকাবার অবকাশ পেল না; সে তখন চলে গিয়েছে বড় রাস্তার গোড়ে। বাইরের বারান্দায় এসে সেইদিকে চেয়ে ভাবতে লাগল সে,—কে এই দেবতুল্য ভদ্রলোকটী!…

"মায়া—"

"অ্যাঁ, আসছি—" উপরের ঘর থেকে মায়া সাড়া দিলে।

নিমাই মায়ার রান্না ঘরের দুয়ারে একটা খুঁটিতে হেলান দিয়ে আসনের 'পর বসেছিল। সে কোলকাতায় এসেছে প্রায় সপ্তাখানেক হ'ল। আজ মায়াদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে প্রায় এক ঘণ্টা হয়েছে। কিন্তু এই ভালমানুষ বন্ধু লোকটিকে বসিয়ে রেখে মায়া তার বৈকালিক কাজ সারছে, কিরণ নেই বাড়ীতে।

"নিমু বাবু, বিয়েটা পিছিয়ে দিলে কেন?" মায়া নিমাইয়ের পিছুদিকে আসতে আসতে জিজ্ঞাসা করলে।

মায়ার প্রশ্নে নিমাই ভিতরে ভিতরে বেশ একটু বিব্রত হ'য়ে পড়ল। কেননা চয়নের সঙ্গে মাঘ মাসে বিয়ে হবার কথা এক রকম পাকা হ'য়ে ছিল। কিন্তু হঠাৎ নাটকীয় ভাবে বসুমতীর আবির্ভাব হওয়াতে বিয়েটা কেন যে পিছিয়ে দিলে, তা' সে নিজেও ভালো রকম জানে না। কি উত্তর দেবে সে ঠিক ক'রে উঠতে পারল না; মিথ্যা বলতেও তার জিভটা ভিতর দিকে কে টেনে ধরে।

"বিশেষ কোনো কারণ নেই—" সহজ ভাবে বলে সঙ্গে সঙ্গে প্রসঙ্গটা চাপা দেবার জন্য সে মায়াকে প্রশ্ন করল: "আচ্ছা, মায়া, একটা কথা জিগ্যেস করব? জানতে ভারি ইচ্ছে হ'য়—"

"হুঁ, কি কথা?" মায়া কাঁকালের তরকারীর চুপরীটা,

অন্য হাতে বঁটি নিয়ে নিমাইয়ের কাছে আসতে আসতে সম্মতি দিলে নিমাইকে প্রশ্ন করবার।

"তুমি একজন জেলা জজের মেয়ে হ'য়ে, সাধারণ গৃহস্থ ঘরের মতো নিজের হাতে তোমার সংসার সুষ্ঠু ভাবে চালাও কি করে? ধরতে গেলে তুমি সাহেবীয়ানার মধ্যে মানুষ—" বলে উত্তরের প্রত্যাশায় নিমাই মায়ার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

"কেন—" মায়া ঠোঁট দিয়ে হাঁসিটা চেপে পাল্টা প্রশ্ন করল,—"খুব আশ্চর্য্য বলে মনে হয় না-কি?

"তা' একটু হয়; সত্যি কথা বোলতে কি মায়া। কারণ আমি তো তোমাদের নারী নক্ষত্র জানি—"

"বাবা তাঁর সংসার চালান সাহেবীয়ানা ভাবে, সেই দেখাদেখি যে আমাকেও চালাতে হ'বে, একথা তোমাকে কে বল্লে? আর তা' ছাড়া তাঁর বাড়ীতে সাহেব লোক সব যখন আনাগোনা করেন—"

"তবু—" নিমাই একটু অপ্রস্তুত হ'য়ে গিয়ে বললে: "যে আবহাওয়ার মধ্যে মানুষ হোয়েছো—" নিমাই কথাটা অসমাপ্ত রেখে মায়ার দিকে তাকিয়ে থাকল।

"তা' ঠিক—" মায়া নিমাইয়ের কথা অস্বীকার না কোরে বললে,—"কিন্তু ভাই নিমু বাবু, ছেলেবেলে থেকেই আমি এক আলাদা প্রকৃতির লোক। ঝামেলা জটলা প্রাণহীন কেতাদুরস্ত জীবন যাপন, এসব আমি কোন্দিন বরদাস্ত

কোরতে পারিনি। আমার জ্ঞান হওয়ার পর থেকে মনে প্রাণে যে-জীবনের জন্য প্রার্থনা করেছি, ভগবান তা' মিলিয়েও দিয়েছেন—"

"তুমি একজন বি. এ. পাশ মেয়ে হোয়েও বুঝি এই স্বহস্তে রান্নাবাড়া করা, বাটনা বাটা, স্বামী সেবা এই—তার পরে, চেয়ারে বসে টেবিলে খাওয়া ছেড়ে কম্বলের আসনে খাওয়ার কামনা কোরতে?" নিমাই শ্লেষভরে কথাগুলো বোলে হাসতে লাগল মৃদু মৃদু।

"হ্যাঁ, কোরতামই তো—" সহজ ভাবে নিমাইয়ের কথার জবাব দিয়ে মায়া হাতের খোসা ছাড়ান আলুটা চার ফাঁক কোরে রাখল পাশের থালায়। চুপড়ী থেকে আর একটা আলু নিয়ে ছাড়াতে লাগল; কিন্তু তার দৃষ্টিটা নিমাইয়ের দিকে নিবদ্ধ; তার চাহনীতে চাপা হাসির ছটা।

"না-দেখে আলু ছাড়চ্ছ হাত কেটে যাবে যে?"

"না, যাবে না; অভ্যেস আছে—" মায়া এই কথাগুলো বললে, মুখের ভাসা কথা; কিন্তু সে ভিতরে ভিতরে কি একটা চিন্তা করছে। সেটা হচ্ছে তার শিক্ষা ও বর্তমান সংসার চালানোর মধ্যে নিমাইয়ের চোখে যে অসামঞ্জস্য ঠেকেছে তারই জবাব।

"দেখ নিমু বাবু—" মায়া নিমাইকে এক-চোখ দেখে নিয়ে ধীরে ধীরে বলতে লাগল: "একটা দেশ বা জাতির আবাহমান কালের অলিখিত রীতিনীতির মধ্য দিয়ে জীবন যাপন করার মধ্যে

যে-শান্তি আছে, সে-শান্তি তারা কি কোরে উপলব্ধি কোরবে, যারা মোহগ্রস্ত? নকল করতে করতে যারা হায়রান হয়? আপাত রমনীয়কে যারা সুন্দর বোলে মনে করে অথচ সুন্দর কি তা' চিন্তা করবার সময় যারা পায় না?" থেমে গলার স্বর পাল্টিয়ে পুনরায় বলল মায়া,—"নিজের মা-কে মা বোলে যতটা শান্তি পাওয়া যায়, ততটা শান্তি কি পাওয়া যায় পরের মা'কে মা ডেকে?" বলে মায়া নিমাইয়ের দিকে তাকাল; কিন্তু নিমাই কোনো কথা বললে না দেখে বললে মায়া,—"যা নিজস্ব তাকে ত্যাগ কোরে ধার করা আচার পদ্ধতির মধ্যে জীবন যাপন করাকে আমি পরভোজী গাছের জীবন ধারণের মতোই মনে করি—" মায়ার শেষ কথাটা একটা ঝাঁকুনিতে দু' ফাঁক হোয়ে গেল, বঁটিতে একটা কুমড়ো চেড়ার সঙ্গে সঙ্গে। খোসা ছাড়িয়ে কুচি কুচি কোরে ডালনার কুমড়োগুলো থালায় রাখল। কুমড়ো কাটা শেষ করে আঙ্গুল মটকাতে মটকাতে নিমাইয়ের দিকে তাকিয়ে মায়া বললে: "কারণ, অন্ততঃ আমার বিশ্বাস, ঐতিহ্য হ'চ্ছে মানুষের গায়ের রক্ত; এই রক্ত ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে, এ-ধারণা যাঁরা করেন তাঁরা ঈশ্বর টিশ্বর,—আমাদের মতো সাধারণ মানুষ নন।" বলে মায়া মৃদু মৃদু হাঁসতে লাগল।

কিছুক্ষণ নীরবে কাটার পর নিমাই প্রীতিসূচক স্বরে বললে,—"বাঙালী হিন্দু ঘরের অতি সাধারণ লোকের বউ তুমি, কিন্তু তোমার পেটে এত বিদ্বে বুদ্ধি আছে, তা' তোমার চাল চলন, কথাবর্ত্তা দেখে

কারো সাধ্য নেই যে ধরে।" বলে নিমাই হাঁসতে লাগল ; মায়া কোনো কথা বললে না দেখে নিমাই পুনরায় বললে,—"একেই তো তুমি সুন্দর, তোমার কথা সুন্দর ; তার ওপর দর্শন শাস্ত্রের জ্ঞানের পরিচয় তোমার কাছ থেকে যখন পাই, সত্যিই মায়া বিশ্বাস কর আমায়, তোমার প্রতি শ্রদ্ধার আর সীমা থাকে না আমার—"

"রক্ষে কর ঠাকুর—" নিমাইয়ের প্রশংসায় মায়া ঈষৎ বিচলিত হ'য়ে বললে,—"যিনি করুণা করে শিখিয়েছেন, সেই তোমার বন্ধু মৈত্রী মশায়কে প্রশংসা পত্র দিও ভাই, আমায় নয়। তিনি না পড়ালে আমার বিদ্যের জোর এত ছিল না যে, গীতা আর স্পিনোজা-কেণ্টের আধ্যাত্মিক তত্ত্বের সদর্থ করে বুঝে ওঠা, কিংবা টমাস হার্ডির জীবন-দর্শন ও স্নিগ্ধ রস-রচনা উপভোগ করবার মতো ক্ষমতা—" বলা শেষ হ'তেই চরম সার্থকতা সূচক একটা নিঃশ্বাস ত্যাগ করে কিরণের প্রতি কৃতজ্ঞতার ভারে সে একটু নুয়ে পড়ল।

সন্ধ্যা প্রায় আগত ; কিরণ আর চয়ন তখনও এল না দেখে নিমাই মায়ার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পরদিন আসবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে চলে গেল।

পরদিন। বৈকালিক চা-পানান্তে উপরের বারান্দায় কিরণ নিমাই চয়ন বসে গল্প করছিল। মায়া ব্যাচারা তার নিজের কাজ সেরে এখনও এসে যোগাতে পারেনি।

টেবিলের উত্তর দিকে একটা চেয়ারে কিরণ বসে আছে আর তার সামনেই নিমাই ; পশ্চিম দিকের আরাম কেদারাটায় চয়ন বসে আছে। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে চয়ন যখন ছিল না তখন নিমাই বসুমতীর অবস্থাটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কিরণের কাছে বর্ণনা করেছিল ; এবং কিরণকে সে বলেছিল যে, সে বুঝতে পারে না, শিক্ষিত হ'য়েও লোক এত নীচ প্রকৃতির কি ক'রে হ'তে পারে। একটা নারীর জীবন যে নষ্ট করে দিলে, এত কি তার বিবেকে বাধেনি !

"দেখ নিমাই—" কিরণ শান্ত স্বরে নিমাইকে বুঝিয়ে দিতে লাগল মানুষ কি করে নীচ মনোবৃত্তি সম্পন্ন হয় : "ধরে নাও তুমি একজন মহৎগুণবান লোক ; নিয়ে তোমার দেহটা থেকে 'তোমাকে' একটু দূরে সরিয়ে নিয়ে যাও, গিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখ,—দেখবে তোমার আদিম অসভ্য প্রবৃত্তিগুলো মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। সে তখন কামনা চরিতার্থেয় জন্য বন্য পশুর মতো দিগ্বিদিক ছুটোছুটী কোরছে ; আত্মশ্লাঘায় পরচর্চ্চায় করছে কালক্ষয়, অহেতুক আস্ফালনে চীৎকার কোরে গলা ফেলছে ফাটিয়ে ;—সেই অবস্থায় যে-'তুমি', সেটা একটা বারুদের তাল বিশেষ। তাই যখন 'তোমার' ইচ্ছা বা পছন্দের বিরুদ্ধে কেউ কোনো কথা বা কাজ কেরতে বা বোলতে যাবে তখন 'তোমার' বুকে ধক্ কোরে আগুন জ্বলে উঠবে, আর সেই আগুন তখনই ছড়িয়ে পড়বে সমস্ত দেহে—পায়ের আঙ্গুল থেকে মাথার মণি-কোঠা পর্যন্ত। আর তখন 'তুমি' যে-কোনো কাজ কোরতে পার, সে-কাজ 'মানুষের' কাজ বলে গণ্য

হ'বে না ; কেননা তখন তুমি বন্য দুর্দান্ত অপোষনীয় নীল-ঘোড়া। সেই নীল ঘোড়াকে জব্দ কোরতে হ'লে চাই কাঁটা লাগাম ; সেই কাঁটা-লাগাম তার মুখের মধ্যে পড়িয়ে দিয়ে লগাম খেঁচে ধরে থাকলে তবে সে স্থির থাকবে। সেই কাঁটা লাগাম হোচ্ছে তোমার ওই মহৎ গুণসম্পন্ন 'তুমি', যেটাকে তুমি দূরে সরিয়ে রেখেছ—" বলে কিরণ প্রশান্ত দৃষ্টিতে একবার নিমাইকে ও চয়নকে দেখে নিলে ; তার প্রতি মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে তারা। কিরণ শেষ করল কথাটা,—"man without virtue is beast ; man without *Faith* is fiendish, সব সময় জেনে রাখবে—"

কিছুক্ষণ কেউ কোনো কথা বললে না। তারপর অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা হ'লে খানিক। এর পরের নীরবতা ভাঙ্গলে চয়ন।

"আচ্ছা নিমাই বাবু—" নিমাইকে লক্ষ্য করে চয়ন জিজ্ঞাসা করলে ঃ "আপনি দাদাবাবুর মুখে কোনো দিন হাঁসি দেখেছেন ?"

"সে-ভাগ্যটা মায়ার ছাড়া আর কারো হয়নি বোধ হয়—" হাঁসতে হাঁসতে বললে নিমাই।

এই কথায় কিরণ চয়নের দিকে তাকালে। তার মুখে হাঁসির বহিঃপ্রকাশ নেই বটে, কিন্তু অন্তরে অন্তরে যে-হাঁসির বন্যা বয়ে যাচ্ছে, তাতে তার সারা মুখখানা ও চোখ দুটোকে কোরে তুলেছে দীপ্তিময়।

"কেন ?" বলে কিরণ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চয়নের দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ : "হাঁসব কেন ? আমাদের যতগুলো প্রবৃত্তি আছে,

তার মধ্যে নিকৃষ্টতম হ'চ্ছে ওই হাঁসিটা। যে-প্রবৃত্তিটা আমাদের দেহের প্রবিত্রতা নষ্ট করে, তার চেয়েও শতগুণে নিকৃষ্ট—" বলে টেবিলটার 'পর হাতের কনুই দুটো রেখে অঙ্গুলি দ্বারা-বদ্ধ হস্ত দ্বয়ের ওপর থুত্‌নি রেখে চেয়ে রইল চয়নের দিকে।

"মা গো—মা—" চয়ন ব্যথার হাঁসি মুখে টেনে এনে বললে: "হাঁসি খেলাতেই মানুষের জীবন; আর সেই হাঁসিকেই আপনি করলেন কলঙ্কিত—"

"আচ্ছা, সে কথার উত্তর আমি পরে দিচ্ছি; আগে তুমি আমার ক'টা প্রশ্নের জবাব দাও—"

"বলুন—" উত্তর দেবার জন্য চয়ন প্রস্তুত হ'য়ে বসল।

"অন্তরে ক্রূর চক্রান্ত রেখে ঠোঁটে ভদ্রতার-হাঁসি ঝোলান যায় কিনা?"

"তা' যায়—"

"একজনকে পথের মাঝে লাঞ্ছিত অপমানিত হোতে দেখলে মুখে হাঁসি আসে কিনা?"

"সাধারনতঃ অনেক ক্ষেত্রেই আসে—"

"কোনো একজন সাধু সজ্জন লোক কয়েকজন সাধারণ লোকের সম্মুখে এসে কথাবার্ত্তা বোলে চলে যাবার পর তাদের মুখে তাচ্ছিল্যের হাঁসি ফুটে ওঠে কিনা?"

"তাও দেখেছি বটে হাঁসতে; আমার বাবাই সন্ন্যাসী মানুষ, তাঁকে দেখে লোকে হাঁসে বটে—"

"বেশ।" চয়ন স্বীকার করাতে কিরণ সন্তুষ্ট চিত্তে বললে: "তাই যদি হয়, তবে এর যে সূক্ষ্ম অথচ মারাত্মক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া আছে জীবনে, তা' দেখবার শক্তি তোমার আছে কি?"

"ও রকম দিব্য-দৃষ্টি লাভ আমাদের মতো অধম জনের কি হয় দাদাবাবু—" চয়ন মনে মনে ভেঙ্গে পড়ল।

"হয়। চেষ্টা, চিন্তা কোরলেই হয়—" কিরণ চয়নকে আশ্বস্ত কোরে কিছুক্ষণ ধরে চিন্তা করতে লাগল। পরে চয়নের পূর্ব্ব কথাটার উত্তর দেবার চেষ্টা কোরতে সুরু করলে: "আমরা হেঁসে খেলে জীবন কাটাই, নয় চয়ন?" চিন্তিত স্বরে বলতে লাগল কিরণ: "দেখ চয়ন, আমরা ওই হেঁসে খেলে দগ্ধ-পিতল-পাত্রের মতো কলঙ্কলাঞ্ছিত দেহ নিয়ে বাস করি। সেখানে আমরা দেখানিয়া-হাঁসি খেলার যন্ত্র। বিশেষ, হাঁসি খেলার প্রাণহীণ অভিনয় করে চলি মাত্র,—যা জীবনকে দুঃখময় কোরে তোলে, শান্তি পাওয়া যায় না।" কিরণের মুখে একটা দুঃখের ঘন ছায়া নেমে এল ধীরে ধীরে; যেন মানুষের মূঢ়তায় তার হৃদয় দুঃখে ভরে হ'য়ে উঠেছে কানায় কানায়। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কিরণ বললে: "শান্তি বোলে যদি কোনো জিনিষ এই দুঃখময় জগতে থাকে, তবে তা' পাওয়া যায় নিজেকে অন্তর্লীন করে রাখার মধ্যে—" নাসিকা ও মুখ কুঞ্চিত করে চয়নের দিকে চেয়ে রইল কিরণ।

এর পর তারা সমাজ সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা কোরতে

লাগল। চন্নন static-dynamic, Transendental-Immanenence-এর defination জেনে নিলে ভালো কোরে কিরণের কাছ থেকে। তার পর নিমাই জানতে চাইলে যে, intuition আর intellectual-এর মধ্যে তফাৎ কি; এই দু'জনের সৃষ্টির মধ্যে মৌলিকতা কার কতটা।

"Intuition হ'চ্ছে ঝরণা—" কিরণ সুচিন্তিতভাবে নিমাইয়ের প্রশ্নের জবাব দিতে লাগল: "তার পিছুতে আছে উৎস; তাই সে বার মাস বেয়ে যাবে। আর Intellectual হ'চ্ছে তোমার—শান-বাঁধান চৌবাচ্ছা, তাতে মাত্র কিছুটা অপর জায়গার জল ধরা আছে—তাই ছিদ্র দিয়ে চুইয়ে চুইয়ে পড়ে; ফুরিয়ে গেলেই জল ঢালতে হ'বে আর কি—" বলে কিরণ এমন ভাবে কাণ পেতে তন্ময় হ'য়ে রইল কিছুক্ষণ, যেন তার পূর্ব্ব কথাটাকে ভালো করে বোঝাবার জন্য একটা নজীর ঠিক করতে লাগল। বললে: "Intellectual Intuition-এর diameterically opposite—" বলে একটা হাত দিয়ে চোখ দুটো টিপে ধরল এবং কিরণ কপাল কুঁচকে চিন্তা করতে লাগল। যেন তার চিন্তাকে এক ঠাঁই করবার চেষ্টা করছে।—"হ্যাঁ, ধর—" ধীরে ধীরে হাতটা চোখ থেকে সরিয়ে নিলে। তার চোখ দুটো টিপে ধরার জন্য ছোট হ'য়ে গিয়েছে যেন।—"Intuition যদি centripetel force হয়, তবে Intellectual centrifugal force—" বলে কিরণ নিমাইয়ের দিকে নীরবে চেয়ে রইল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হ'য়ে গিয়েছে। তারা তিন জনেই বেশ কিছুক্ষণ নীরবতার মাঝে নিমজ্জিত হ'য়ে রইল। নিস্তব্দ বৃক্ষবহুল পল্লীটির মাথার 'পর শুক্লা সপ্তমীর চাঁদখানা সবেমাত্র হাঁসতে সুরু করেছে। এই নিস্তব্ধতাকে মায়া যেন চিড়ে দু ফাঁক করে দিলে—কড়ার তপ্ত তেলে তরকারী ছেড়ে—ছ্যাঁ—য়্যা—। তরকারীগুলো খুনতি দিয়ে নাড়ছে মায়া। সেগুলোর জলীয় অংশ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শব্দও মিইয়ে এলো। খুনতিটা বার কয়েক কড়াতে ঠুকে তাতে জল ঢেলে দিলে বোধ হয় মায়া; শব্দ এলো—চোঁ—ওঁ—।···পাশে নারকেল গাছটার 'পর একটা পাখী পাখা ঝাঁকুনি দিয়ে ভালো ক'রে বসে নিলে।···সম্মুখে আদি গঙ্গায় জোয়ার এসেছে—জ্যোৎস্নালোকে তা' প্রত্যক্ষীভূত করে তুলল। গঙ্গায় জলের 'পর ভাসমান চাঁদখানা কাঁপছে থর্ থর্ করে।

"তাই—" বহুক্ষণ চিন্তা করে কিরণ পুনরায় পূর্ব্ব কথার রেশ ধরে বোঝাবার চেষ্টা কোরল নিমাইকে: "Intuition চায় কাজ, আর Intellectual চায় তর্ক, এদের মুলতঃ পার্থক্য এইখানে। কাজ ছাড়া তর্ক দ্বারা সংসারে একটা মানব জাতির মঙ্গল হয়, এ চিন্তা Intuition করতেই পারে না। Intelletual তার বিরুদ্ধ মতবাদীর কাছে যুক্তি তর্কের দ্বারা একটা আদর্শবাদের জয় করতে পারে; কিন্তু তার মুলে কালক্ষয় ছাড়া আর কিছু নেই। কিন্তু Intuition প্রতিটি মূহুর্ত্তের মুল্য দিতে চায় কাজ করে; তার কারণ, সে যে-মূহুর্ত্তে জীবিত আছে, ঠিক তার পর মুহুর্ত্তেই মৃত্যুর

জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকে। সেইজন্যই তার সেই জীবিত মুহূর্ত্তটিতে কাজ কোরে তার মানব জীবন সার্থক কোরতে চায়!···সংসারে এই কাজই থেকে যায়, কথার কারসাজি নয়।" বলে কিরণ চয়ন ও নিমাইয়ের দিকে একবার এমনভাবে তাকাল, যেন সে তার কথাটার সমর্থন চায় তাদের কাছ থেকে। "তোমার Intellectual নিমাই—" কিরণ পুনরায় বলতে লাগল; যেন নিমাই কিরণের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছে তার Intellectual-কে ছোট করে দেখার জন্য: "ব্যবসাক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করার জন্য নানা রকম ধোঁকাদারী ফন্দী খাটাতে পারে, দিন দুপুরে লোকের চোখে ধূলো দিয়ে ডাকাতি করতে পারে—সাদা জাতিদের গায়ের চটকদারী রঙের মতো blackmailing কথাটা দিয়ে। কিন্তু Intuition এসব চিন্তাই করতে পারে না; কেননা, এসব মিথ্যা। আর ওই মিথ্যার মধ্যেই থাকে মড়কের কীট। যার দংশনে তার, যে ওই কাজ করে, মৃত্যু সকলের আগে—এটা Intuition স্পষ্ট দেখতে পায়।"

কিরণ ভাবে মগ্ন। নিমাই আর চয়ন মুগ্ধ নয়নে তার দিকে চেয়ে আছে।

"Man of means যে, বুঝেছো নিমাই—" কিরণ বলতে লাগল: "সে হ'চ্ছে সাগর সৈকতের শিলাখণ্ড; ঝড় বৃষ্টি, ক্ষণে ক্ষণে তরঙ্গ মালার নির্দ্দয় আঘাত—কিছুতেই তাকে টলাতে পারে না; সে সর্ব্বদাই তার সাধনায় মগ্ন। সহিষ্ণুতা ও সংবেদনশীলতায়

তার বুক ভরা—" বলে কিরণ ঘাড়টা বেঁকিয়ে নিমাইয়ের দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ : "ওই সহিষ্ণুতা ও সংবেদনশীলতাই হোচ্ছে মানুষের আসল সম্পদ। মানুষ নিজেকে নিজে যাচাই কোরবে এই দুটো জিনিষের কষ্টি পাথরে। দেখবে, এই সম্পদ তার কতটুকু আছে। যার যতটা পরিমাণে আছে, তার জীবনে সফলতা ততটা। আর যার মোটেই নেই, সে জনসাগরে বুদ্‌বুদ্‌।" একটু থেমে একটা প্রশস্তির নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে : "Emperical is the only way to acquire real knowledge—"

"তার আগে মনেকে করতে হ'বে প্রদীপের নির্ব্বাত শিখার মতো —' বলতে বলতে মায়া এসে দাঁড়াল।

মায়ার গায়ের সেমিজের উপর আধ ময়লা লাল পাড় শাড়ী পরনে। তাতে জায়গায় জায়গায় হলুদের দাগ লেগে আছে। হাতেও মসলার ছোপ। বিকেল বেলায় চুল বেঁধে কপালে সিঁদুরের টিপ পড়েছিল, সেটায় অসাবধানে হাত লেগে ছ্যাকা ব্যাকা হ'য়ে গিয়েছে। মায়ার গা থেকে বেশ একটা রান্নাঘর-রান্নাঘর গন্ধ আসছে। মায়া ও কিরণ চোখাচোখি হ'য়ে কিছুক্ষণ নীরবে চেয়ে রইল। তাদের চাহনীর মধ্যে কি ভাষার বিনিময় হ'লো তারাই জানে,—কিরণ কিন্তু তৎক্ষণাৎ নীরবে উঠে গেল।

"এই, তোমরা দুজনে এসো—" মায়া চয়ন ও নিমাইকে

উদ্দেশ করে বললে: "খাবার জোগার করেছি, শীগ্গীর এস—" বলে মায়া নীচে নেমে গেল।

কিরণ আর মায়া! ভাবল নিমাই, যেন দুটি তারের একটী বাদ্য-যন্ত্র। এক সুরে সব সময় বেজে চলেছে। এদের মিলন হ'য়েছে যেন যুগযুগান্তরের তপস্যার ফলে!

হঠাৎ ওরা দুজনে চলে যেতে চয়ন আর নিমাই একটা অস্বস্তিকর আবহাওয়ার মধ্যে পড়ে গেল। কেননা চয়ন চন্দন-নগর থেকে এসে পর্য্যন্ত নিমাইকে একবারও একলা পায়নি। পেলেই সে সব কিছু খুঁটিয়ে জানতে চাইত, বিয়ে পিছিয়ে দেবার কারণ; নিমাই চিঠিতে যে অজুহাত দেখিয়েছে, তাতে সে দেখতে পায়নি কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ। নিমাই তো আর সত্য কথাটা লিখতে পারে না যে, সে চয়নের বহু আগে জীবনের প্রথম দর্শনে—একটি মেয়েকে ভালবেসেছিল সকলের অগোচরে প্রাণ দিয়ে। বহুদিন পরে তারই পুনরার্বির্ভাব হ'য়েছে নাটকীয় ভাবে। হ'য়ে তার হৃদয়ের গোপনতম স্থানে সোনার কৌটোর মধ্যে যে ভালবাসার ভ্রমর নিদ্রিত ছিল, সে জেগে উঠেছে স-গুঞ্জরণে! সেই গুঞ্জরণ ধ্বনিতে সে এখন আত্মহারা। তার চিত্ত এখন অব্যবস্থিত। সে কিছু ঠিক কোরে উঠতে না পেরেই বিয়ে পিছিয়ে দিয়েছে।

"কেন? পিছিয়ে দিলে কেন?" চয়ন আরাম কেদারা থেকে উঠে ধীরে ধীরে নিমাইয়ের সামনে টেবিলটার এক কোণে বসে জিজ্ঞাসা করল আকুলিত স্বরে।

"লক্ষ্মীটি—" নিমাই চয়নের একটা হাত তার দু' হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বিনীত ভাবে বললেঃ "ক্ষুণ্ণ হো'য়ো না; জীবনে এমন একটা ঘটনা ঘটেছে যার জন্য মন প্রাণ খুব খারাপ। তাই মানসিক অসুস্থ্যতা নিয়ে বিয়ে করলে তার মাধুর্য্য নষ্ট হ'য়ে যাবে, চায়না—" বলে নিমাই চয়নের হাতটায় একটা চাপ দিয়ে সকাতরে চেয়ে রইল চয়নের প্রতি।

"তবু কত দিন ?" বলে চয়ন অপর হাতটা দিয়ে নিমাইয়ের খাঁজ কাটা সিঁথিটা স্পর্শ করলে।

"বছর খানেক—" আগের মতোই নিমাই স্বল্পাক্ষরে উত্তর দিলে।

"এ—ক ব—ছ—র ? এতদিন একলা আমি কি কোরবো ?" চয়নের চোখ দুটো ছল্ ছল্ কোরে উঠল, আর কথাগুলো এমন ভাবে বলল, যেন জীবনের প্রথম দিন থেকে নিমাইয়ের সঙ্গছাড়া সে একটা মুহূর্ত্তও হয়নি, তাই দীর্ঘ এক বৎসর প্রিয়তমের অনুপস্থিতিতে প্রতি দিনটি যে কিরকম বিষময় হ'য়ে উঠবে তা' কল্পনা করে তার ডুক্‌রে কাঁদতে ইচ্ছা হ'ল। চয়নের চোখের পাতা ভিজে জ্যোৎস্নালোকে চিক্ চিক্ করতে লাগল। মুহূর্ত্তের জন্য নিমাইয়ের অন্তর আর্দ্র হ'য়ে গিয়ে তাকে ভুলিয়ে দিলে বসুমতীর কথা। সে যেন চাইলে চয়নকে বুকে টেনে নিয়ে অধোরষ্ঠে একটী চুম্বন এঁকে দিয়ে বলতে,—না না, আগামী প্রভাতেই অমাদের বিয়ের লগ্ন—

"কই নিমু—" নীচে থেকে মায়া ডাকল: "চয়ন বড্ড দেরী হ'চ্ছে, সব জুড়িয়ে গেল যে—"

উভয়ের একবার দৃষ্টি বিনিময়ের পর নীরবে উঠে ধীরে ধীরে নীচেয় নেমে গেল।

—তেইশ—

অমলাকে হাসপাতালে ভর্ত্তি করবার সময়ই নরেন নিঃসম্বল হ'য়ে পড়েছিল। তাই দেখে নিমাই নিজের পকেট থেকে দেড়শ' টাকা বন্ধুর হাতে দিয়ে তার স্ত্রীর চিকিৎসার যেন কোনো ত্রুটি না হয় সেইদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে অনুরোধ করেছিল। হাসপাতালে ভর্ত্তি করার পরও নরেনের যথেষ্ট অর্থ ব্যয় হ'য়েছিল, যার জন্য তাকে করতে হ'য়েছিল মোটা টাকা ঋণ। ক্রমশই সে ঋণগ্রস্থ হ'য়ে পড়তে লাগল—রোগের খরচ, বড়-বাবুয়ানী ঠাট বজায় রাখার খরচ চালাতে চালাতে। দীর্ঘ ছ' মাসেও অমলা যখন সম্পূর্ণ সুস্থ্য হ'য়ে উঠল না, তখন নিমাইয়ের কোলকাতার বাইরে থাকার সুযোগ নিয়ে, নরেন অমলাকে হাসপাতাল থেকে তার দাদার বাড়ীতে স্থানান্তরিত করে ফেলে। তার দাদাকে সে জানিয়ে দেয় যে, মাসে মাসে খরচ দেবে, কোলকাতায় রেখে সে আর হয়রাণ হ'তে

পারে না। নরেনের এই নির্দ্দয়তায় অমলা ও তার দাদার চুপ করে থাকা ছাড়া আর টু-শব্দটি করবার সাহস হয়নি তাদের। কিন্তু একদিক থেকে এই ব্যাপারটা সাঁপে বর হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল।... গরীবের নাকি 'ওপরওয়ালা' সহায় আছে, তাই অমলা তার দাদার বাড়ীতে ধীরে ধীরে আরোগ্য লাভ করতে লাগল—এক রকম বিনা চিকিৎসায়। কিন্তু তার রোগক্লিষ্ট চেহারাটা এমনই হ'য়ে গিয়েছিল, তা' দেখলে অতিবড় শত্রুরও চোখ ফেটে দু' ফোঁটা জল পড়বে।

বহুদিন পর নিমাই কোলকাতায় এসেছে এই সংবাদ অমলা তার দাদার মুখে শুনে একখানা চিঠি সে নিমাইকে দেয় তার দাদার মারফত। কিচ্ছু না, শুধু তার সঙ্গে একবার দেখা করবার জন্য অনুনয় বিনয় করে চিঠিখানা সে লিখেছিল।

কোলকাতা থেকে প্রায় কুড়ি মাইল দূরে একটী পল্লীতে অমলার দাদার বাড়ী। ষ্টেশন থেকে বেড়িয়ে যে-রাস্তাটা গ্রামের ভিতর দিয়ে চলে গিয়েছে—সেই রাস্তা দিয়ে মোটর যাতায়াত করে। গ্রামটা জঙ্গলাকীর্ণ। সেই জঙ্গলের মধ্যে এখানে এক ঘর ওখানে এক ঘর—এই ভাবে লোকের বাস। রাস্তাটা বর্ষাকালে হয় এক হাঁটু কাদা আর গ্রীষ্মকালে হয় ময়দার মতো ধূলো।—পথিপার্শ্বের মেহদী লতাগুল্ম প্রভৃতি গাছগুলো ধূলিতে ঢাকা পড়ে গিয়েছে। এর ওপর দিয়ে যখন মোটর যায় তখন গোলক একবারে হয় অন্ধকার। এই রাস্তার উত্তর দিকে খানিকটা পতিত জমি

পার হোয়ে গেলেই অমলাদের বাড়ী। বাড়ীর আয়তন অনুপাতে মাটির ঘর ছুটি দেখলে মনে হয়, যেন একটা মস্ত জালার ভেতরে এক মুষ্টি তণ্ডুল পড়ে আছে!···ঘরগুলি খড়ের ছাউনি; পৈঁঠা পর্য্যন্ত মাটির। বাড়ীর চারিদিক মাটির দেওয়াল দিয়ে ঘেড়া; দেওয়ালের মাথা খাপ্‌ড়া দিয়ে ছাওয়া। বাড়ীতে ঢোকবার দ্বারটা এত ছোট যে, একটা প্রমাণসই মানুষ মাথা হেঁট করে না ঢুকলে বাজুতে মাথা ঠুকে যাবে! বাড়ীর ভেতরে ঢুকে চারদিক একবার তাকালেই মালিকের সিন্দুকের খবর পর্য্যন্ত অনুমান করা কঠিন হবে না। বাড়ীর এক কোণে একটী গোঁড়া-নেবুর গাছ; তার গোড়ায়া কতকগুলো খোলা হাঁড়ি ইঁট ভাঙ্গা স্তূপাকার হ'য়ে আছে। অন্যদিকে একটি পেয়ারা ও বাতাবী নেবুর গাছ; পেয়ারা গাছটা ডাঁটাসার। কিন্তু বাতাবী নেবুর গাছটায় মড়ার মাথার মতো মেলাই নেবু ঝুলছে। উঠানের মাঝখানে একটী মাত্র সরু লম্বা নারকেল গাছ খোঁটার মতো খাড়া হ'য়ে আছে। গাছটার গোড়ায় চারদিকের ঠুঁটো শিকরগুলো দেখলে মনে হ'বে যেন পাছাতে চাপ দাড়ি গজিয়েছে! উঠানটার চার পাশ সাদা ধপ-ধপ করছে কিন্তু।····

বাড়ীর বাইরে থেকে আধখোলা কপাটের ভিতরে দিয়ে দেখা যায়—অমলা দক্ষিণ-দুয়ারী একটা ঘরের দুয়ারে মাদুরের 'পর বসে কি সেলাই করছে। বাড়ীতে সে ছাড়া আর কেউ নেই। হাতে সে কাজ করছে, কিন্তু সে উন্মুখ হ'য়ে বসে আছে নিমাইয়ের জন্য।

দাঁত দিয়ে সূতো কাটবার সময় অনেকক্ষণ ধরে অন্যমনস্ক হোয়ে উঠানের নারকেল গাছটায় তার দৃষ্টি স্থির ভাবে নিবদ্ধ করে রাখছে কিছুক্ষণ। আবার যখন চমক ভাঙ্গছে, তখন তাড়াতাড়ি কাপড়ের খণ্ডগুলো নিয়ে কাজে দিচ্ছে মন। বড় রাস্তা দিয়ে মোটর যাওয়ার শব্দ শুনে সে দেখছে মাঝে মাঝে নিমাই এল কিনা। আবার কোনো সময় সূঁচে সূতা পড়াবার সময় তার শূন্য দৃষ্টি নিবদ্ধ হ'চ্ছে নীলাকাশে।...সে সময় অলক্ষ্যে থেকে কেউ যদি তাকে দেখত, তবে দর্শক স্পষ্ট দেখতে পেত যে, নিরালায় থাকা-কালীন সকলে যে-চিন্তা করে, সেও সেই চিন্তাই করছে— জীবন, আর তার রঙিন সূতোর সখের জাল!...সে-জাল কে কেন বারে বারে ছিঁড়ে দেয়!...তার সেই জালের শতছিন্ন অংশগুলি আপন মনে গ্রন্থি বাঁধতে বাঁধতে অন্তরটা এমন ভাবে প্রকাশ্যে এনে ফেলে যা' না কি এই নিরালা ছাড়া লোক চক্ষুর গোচরে সে-অন্তর অন্দর থেকেও অন্তর্হিত হয়!....

নিমাই যখন একেবারে বাড়ীর ভিতর ঢুকে পড়েছে তখন অমলার চমক ভাঙ্গল। সে প্রথমত নিজের কাছে নিজে একটু অপ্রস্তুত হ'য়ে পড়ল! কেননা, সে আগে থেকে ঠিক করে রেখেছিল যে, নিমাইকে মোটর থেকে নামতে দেখলে বাড়ীর বাইরে গিয়ে সম্বর্দ্ধনা করবে কিন্তু তা' হল না, মানুষের ইচ্ছাটা-যে তার নিজের গড়া জিনিষ, আর সে-জিনিষ যে,—যে এই বিশ্বরূপী বিরাট একটা কারখানার কালকাঠি টিপছে অদৃশ্যলোকে থেকে,

কর্ত্তব্যের মধ্যে আনা প্রয়োজন বোধ করে না।—এতে যদি মানুষ মাথা-মুখ খুঁড়ে রক্তারক্তি করে ফেলে, তবু সে কালাপাহাড়ের মতো পিছু ফিরে আপন কাজ করে যাবে!…

"আমি জানি, দাদা কখনই ছোট বোনের অনুরোধ পায়ে ঠেলতে পারবে না—" অমলা যেখানে বসে ছিল, তারই অনতি দূরে একটা কম্বল পাততে পাততে রোগক্লিষ্ট মুখখানায় হাঁসি টেনে এনে বললে।

নিমাই দাঁড়িয়ে তার দু'টো হাতই কোমড়ে তুলে এক দৃষ্টে অমলার অস্থি-চর্ম্মসার-দেহখানা দেখছিল। তার চোখ দুটোকে পীড়িত করছিল এইজন্য যে, পূর্ব্বে অমলার দেহে সহজাত একটী লাবণ্য-শ্রী ছিল, তা' রোগের নিষ্ঠুর আক্রমণে লোপ পেয়ে গিয়েছে!…

"যাক্ ; বেঁচেছেন, সেই ভাল—" নিমাই আসন গ্রহণ করতে করতে বললে।

"না দাদা—" অমলা গাড়ু গামছা নিমাইয়ের কাছে রেখে বললে ঃ "গেলেই হাড় জুড়োত ; আমার মতো পোড়া-কপালির বেঁচে থেকে কার কি উপকার হ'বে—" অন্তরে বেদনার পুঞ্জিভূত যে মেঘ জমেছিল, তাই অশ্রু হ'য়ে ঝর্ ঝর্ করে ঝরে পড়তে লাগল অমলার দু'টি কপোল বেয়ে—একটী ব্যথার ব্যথীকে কাছে পেয়েই বোধ হয়।—"কই, দেখি—" দুয়ার থেকে উঠানে নেমে বললে ঃ "পা দুটো ঝোলান দেখি, ধুইয়ে দিই ; ধূলোয় ভরে আছে—"

"আরে না, না ; ওকি করছেন, আমি নিজেই ধুচ্ছি—" ব্যথিত নিমাই ব্যস্তভাবে বলল।

"না, তা' হবে না—" অমলা আঁচল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে শান্ত স্বরে বলল : "আপনি দাদা, তার ওপর আবার ব্রাহ্মণ।—"

নিমাই আর দ্বিরুক্তি না করে যন্ত্রচালিতের মতো পা দুটি বাড়িয়ে দিলে, অন্তরে আপত্তি থাকা সত্ত্বেও। অমলা নিমাইয়ের পা দুটি ধুইয়ে দিয়ে মুছিয়ে দিলে তার আঁচল দিয়ে, কাঁধের 'পর গামছাখানা থাকা সত্ত্বেও ; সদ-ব্রাহ্মণের পদ সেবা করে আজন্ম দুঃখের যৎকিঞ্চিৎও যদি লাঘব হয়, সেই উদ্দেশ্যেই বোধ হয়।

নিমাই আসবে বলে অমলা কিছু খাবার তৈরী করে রেখেছিল। সেগুলি একটা রেকাবিতে সাজিয়ে আর এক গেলাস জল এনে রাখল নিমাইয়ের সম্মুখে। জলযোগ করতে অনুরোধ করে একখানা পাখা নিয়ে হাওয়া করতে লাগল অমলা নিমাইকে, তার কাছে বসে।

নিমাইয়ের জলযোগ সমাপ্ত হ'লে অমলা তার মনোগত ভাব খুলে বললে। সে একবার মাত্র নরেনকে দেখতে চায় ; দেখেই পরের ট্রেণে আবার এখানে চলে আসবে। ইতি পূর্ব্বে সে নরেনের কাছে বহু চিঠি লিখেছে কিন্তু সে সব গিয়েছে বৃথাই। একটা দিনের জন্যও নরেন আসা তো দূরের কথা, শেষের কয়েক-খানা চিঠির উত্তরেই দেয়নি। সে নিমাইকে আরও জানাল যে,

নরেন যদি তাকে নিয়ে ঘর করে সুখী না হয়, তবে সে দেখে শুনে নিজের মনের মতো আর একটা বিয়ে করুক। কেন না, সে নিজে দুঃখ কষ্ট ভোগ করতে রাজী আছে, কিন্তু অপরকে অসুখী করতে চায় না। তাতে নাকি পরজন্মে আরও দুঃখ কষ্ট ভোগ করতে হ'বে। নিমাই অমলাকে নরেনের কাছে নিয়ে যেতে কিছুমাত্র আপত্তি ত করলেই না, বরং ট্রেণের আর দেরী নেই দেখে অমলাকে তাড়া দিলে তৈরী হ'য়ে নেবার জন্য।

অমলাকে নিয়ে নিমাই যখন নরেনের বাসায় হাজির হ'ল, তখন চৈত্রের অস্তগামী সূর্য্য ধরণীর অন্তরালে অদৃশ্য না হ'লেও সহরের এ অংশ থেকে আর দেখা যায় না। কড়া নাড়ার শব্দ শুনে কালীচরণ বেড়িয়ে এলো। এসে তার মা—অমলাকে—দেখেই হাউ মাউ করে কেঁদে উঠল। তার কান্নায় অমলাও চোখের জল সম্বরণ করতে পারলে না; আঁচলে চোখ ঢেকেই বসবার ঘরে এসে বসল।—কালীচরণ অযাচিত ভাবে বলে চলল যে, বাবুর হাতে তার লাঞ্ছনার আর বাকী নেই। তার বাবু এখন নাকি পুরো দস্তুর সাহেব হ'য়ে পড়েছেন। আরও বলল যে,—সে মানুষ হ'য়েছে খুদ-ভাত আর সজনে শাক সেদ্দ খেয়ে; শিখিয়ে না দিলে মাংসতে মসলা না দিয়েও যে রান্না করা যায় একথা সে কেন, তার বাবার চোদ্দপুরুষও কখনো শোনেনি। তারপর সন্ত্রস্তভাবে একবার চারদিক চেয়ে নিয়ে গলার স্বর খাটো করে

বলল যে,—তার বাবু আজকাল প্রায়ই এক মেম সাহেবকে এ বাড়ীতে নিয়ে আসেন ; আবার অনেক রাত্রিতে রাখতে যায়, কোনো দিন ফেরে কোনো দিন ফেরে না। কালীচরণের মুখ থেকে একথা শুনে অমলা ও নিমাই দুজনেই ঘাড় হেঁট করে বসে রইল। এমন সময় দেখা গেল বাইরে—দূরে—গলিতে নরেন তার স্কোডা চালিয়ে আসছে, তার পাশে বসে আছে এক তরুণী ; তারা দুজনেই সহাস্যে গল্প করতে করতে আসছে। নিমাই দেখেই চিনে নিল যে, সে যে-তরুণীটিকে দেখেছিল নরেনের সঙ্গে লেকে ঘুরতে, ইটি তিনিই। আধুনিকা-বেশা পুরুষের কামনার মূর্ত্তিমতী ইন্ধন। ইনি তাঁদেরই সগোত্র, যাঁরা বিলাস ব্যাসনের উগ্র মোহে যাদের কাঁধে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন, তাঁদেরই করতে চান দেউলিয়া !

স্কোডাখানা দ্বারগোড়ায় এসে দাঁড়াতেই তরুণীটি স্প্রীং-এর মতো ছটকে নেমে কোনো দিকে দৃক্‌পাত না করে বাড়ীর ভিতর ঢুকে গেলেন।

ঘরের ভিতর নিমাই অমলা কালীচরণ জুজুর ভয়ে ভীত শিশুর মতো বসেছিল। নরেন যেই ঢুকেছে, নিমাই ডাকল,—
"নরেন—"

নরেন নিমাইয়ের গলার স্বর শুনতে পেয়ে চমকে উঠে থমকে দাঁড়াল। তারপর ঘরের ভিতর পা বাড়িয়ে এক কোণে অমলাকে বসে থাকতে দেখে একেবারে পায়ের কাছে বিষধর ফণীনি দেখলে

যেমন ভীত হ'য়ে পড়ে, ঠিক সেই ভাবে ভীত এবং সঙ্কুচিত হ'য়ে পড়ল !···তার বাকাস্ফূর্ত্ত হ'ল না। প্যাণ্টের দু' ধারের সাইড পকেটে দুটো হাতই ঢুকিয়ে নীচের ঠোঁটটা দাঁত দিয়ে চেপে ধরে মাথা নীচু করে বেওকুবের মতো দাঁড়িয়ে রইল।···একটা মানুষ যদি শতাব্দীর শ্রম দ্বারা কোনো কিছু একটা গড়ে তোলে, আর সেটা আচম্বিতে একটা ঝোরো হাওয়ায় ভেঙে দিলে যেমন তার অবস্থা হয়—নরেনের অবস্থাও হ'য়েছিল ঠিক সেই রকম। কী-যেন একটা অজানা আশঙ্কায় তার মুখ ক্রমশঃ মসীময় হ'য়ে আসছিল।

"মলুম কি বাঁচলুম, তা' বুঝি একবার দেখতে যেতে নেই—" অমলা ধীরে ধীরে নরেনের কাছে এসে একটা বুক ফাটা কান্না কোনো রকমে চেপে রেখে বলল,—"তা' না যাও তাতে দুখ্যু নেই—" অশ্রু-বেদনা-বিরহ-মিশ্রিত স্বরে ধীরে ধীরে বলতে লাগল অমলা,—"তুমি এত কাছে থাক, আর টাকা যায় ডাকে ; লজ্জায় লোকের কাছে মুখ দেখাতে পারি না—" অমলার দু' চোখ বেয়ে নীরবে অশ্রু ঝড়ছে, তা' কেউ দেখতে পেত না, যদি সে অশ্রু নরেনের জুতোয় পড়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ না করত।—"টাকা তুমি আর পাঠিও না—" বলে অমলা হাঁটু গেড়ে নরেনের জুতোয় মাথা রেখে প্রণাম করলে। তারপর খাড়া হ'য়ে উঠতে উঠতে চোখ দুটো সকলের অগোচরে আঁচল দিয়ে মুছে নিলে। উঠে দাঁড়িয়ে তার বেদনা-ক্লিষ্ট-মুখে একটা মর্ম্মান্তক হাঁসি ফুটিয়ে

নরেনের মুখের দিকে একবার তাকালে; পরে বললে: "এখন যাচ্ছি—" বলে ঘাড়টা একদিকে অতি ধীরে কাত করল। পরে দৃষ্টিটা নামিয়ে নিয়ে বললে,—"শরীরটার দিকে একটু নজর রেখো, বেশী অত্যাচার করলে অসুখ বিসুখে কষ্ট পাবে—" এক নিঃশ্বাসে কথাগুলি বলে অমলা ঘর থেকে বেড়িয়ে যাবার জন্য যেই অগ্রসর হ'য়েছে, দেখে সেই তরুণীটি দাঁড়িয়ে আছে প্রস্তর মূর্ত্তির মতো স্থির হ'য়ে। তার মুখের দিকে অমলা মুহূর্ত্ত কয়েক চেয়ে থাকার পর একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বেড়িয়ে গেল বাড়ী থেকে।

তরুণীটি নিঃশব্দে কখন এসে দাঁড়িয়েছিল, তা' কেউ লক্ষ্য করেনি। সে গাড়ী থেকে নেমে বাড়ীর ভেতর ঢুকে যখন কালীচরণকে দেখতে পেলনা এবং কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেও নরেন যখন বাড়ীর ভিতর গেল না, তখন সে ব্যাপারটা কি দেখবার জন্য বেড়িয়ে এসেছিল বাড়ীর ভিতর থেকে; এসেই বাইরের ঘরের দৃশ্য দেখে সে স্তব্ধ হ'য়ে গিয়েছিল।

তাল গাছের গোড়া কেটে দিলে যেমন ভাবে ধরাশায়ী হয়, অমলা ঘর থেকে বেঁড়িয়ে যাবার পর নরেন ঠিক সেই ভাবে সোফাটায় বসে পড়ল; তাতে তার মাথাটা সজোরে গেল ঠুকে দেওয়ালের সঙ্গে। কিন্তু সেদিকে তার হুঁস নেই। সে আর্ত্তের মতো অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করল: "কি হোলো নিমাই!" বলে মাথা নীচু করে হাত দিয়ে চোখ ঢেকে বসে রইল।

তরুণীটি ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকে একবার নরেন ও নিমাইয়ের প্রতি তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ নীরবে। পরে নিমাইকে উদ্দেশ করে জিজ্ঞাসা করলে,—"যে ভদ্র মহিলাটি এখনই বেড়িয়ে গেলেন, তিনি কি এঁর স্ত্রী?" বলে তাঁর দৃষ্টি দিয়ে দেখিয়ে দিলেন নরেনকে।

হাঁ না কিচ্ছু না বলে নিমাই উঠে পড়ল। বেড়িয়ে যাবার জন্য প্রায় ঘরের দ্বারগোড়ায় এসে পিছন ফিরে বললে শ্লেষভরে,—"সে কথাটা ওই নরেনবাবুকেই জিজ্ঞাসা করুন, উনিই উত্তর দিতে পারবেন ভালো রকম।" বলে ত্বরিতে ঘর থেকে বেড়িয়ে গেল নিমাই।

—চব্বিশ—

প্রায় দু বৎসর গত হ'য়ে গেল নিমাই বসুমতীকে এক নার্সের কাছে রেখে কর্ম্মব্যস্ততার অজুহাত দেখিয়ে পার্শ কাটিয়ে ঘুরল। এর মধ্যে সে একটা দিনও বসুমতীর সঙ্গে দেখা করেনি। খরচ পত্রের টাকা নার্সের নামে পাঠিয়ে দিয়ে প্রায় এক রকম নিশ্চিন্ত হ'য়ে থাকত সে। নার্সটি এক বিহারী ব্রাহ্ম ভদ্রলোকের ভগিনী। নিমাইয়ের কোম্পানীর এতদঞ্চলের কর্ম্মচারী ভদ্রলোকটী; সেইজন্য তিনি

নিমাইকে যথেষ্ট খাতির করতেন। তাঁর অনুগ্রহেই সম্ভব হ'য়েছিল নিমাইয়ের পক্ষে বসুমতীর জন্য একটী আশ্রয় ঠিক করা; যখন বসুমতীর,—নারী হিসাবে,—সঙ্কটতম দিন উপস্থিত হ'য়েছিল। সে বিপদ থেকে নির্ব্বিঘ্নে উদ্ধার পেয়ে সে একটী কন্যার মা হ'তে পেরেছিল। কিন্তু এখন আর সেখানে রাখা প্রায় অসম্ভব হ'য়ে উঠেছে।

বসুমতী এখনও জানেনা যে, তার আশ্রয়দাতাটি কে। বিহারী ভদ্রলোকটী বা তাঁর ভগিনী নিমাইকে মিষ্টার সানিয়েল ব'লে ডাকতেন। সেইজন্য বসুমতী ঠিক করে নিয়েছিল যে, তার আশ্রয় দাতার নাম সানিয়েল; এই দেশী বাঙালীদের নাম হবেও বা। বসুমতী তার অভাব অভিযোগ কিছুই নিমাইকে জানায় না; যদিও অভাব অভিযোগ করবার মতো কিছু ছিলও না তার; তা করবার অপেক্ষা নিমাই রাখেনি। তবে কিছুদিন আগে সে মিষ্টার সানিয়েলকে একখানা চিঠি দিয়েছে, যার মর্ম্মার্থ,—সেখানে অর্থাৎ নার্সটির কাছে থাকা আর সম্ভব নয় তার, একটা লজ্জাকর আবহাওয়া উপস্থিত হ'য়েছে। আর নিমাইকে যখন এই বিহারে থেকে হোটেলে বাস করতে হ'বে, তখন একটা বাসা করে তাকে কাছে রাখার মধ্যে সে কোনো অন্তরায় দেখতে পায় না। যেহেতু তার নিমাই ছাড়া যখন সহায় সম্বল আর কেউ নেই।

সেইদিন সকাল বেলায় হোটেলের নীচের বারান্দায় বসে

নিমাই এই সব কথাই ভাবছিল। ভাবছিল সে,—প্রথমতঃ বসুমতী যখন তাকে চিনতে পারবে তখন সে একটা গুরুতর আঘাত পাবে। যা’ পাওয়ার একাধিক কারণ আছে। তারপরে যে ভাবনাটা সে ভাবছিল, তার গুরুত্বও কম নয়। সেটা হ’চ্ছে, একটা সম্পূর্ণ অনাত্মীয়াকে নিয়ে সহরের পরিবার-পল্লীর মধ্যে কোন্ সম্পর্ক নিয়েই বা বাস করবে। দু’ দিন পরেই হোক আর দশ দিন পরেই হোক, আসল সম্পর্কটা যখন লোকে জানতে পারবে, তখন ভার হ’য়ে উঠবে লোকের কাছে মুখ দেখান। তারা নিজের কাছে যত পবিত্রই হোক, কিন্তু লোক তো আর তা বুঝবে না। অসৎ চিন্তাই করবে তারা।

অথচ ওই রকম ধরণের কিছু একটা ব্যবস্থা না করলেও আর চলে না। না চলার প্রথম এবং প্রধান কারণ, বসুমতী কোনো অবস্থায় পড়ে লজ্জা বা কষ্ট পাবে এটা সে বুকে সইতে পারে না। তার একবার মনে হচ্ছিল,—না হয় সে বসুমতীর কাছে গিয়ে তাঁর নিমুদা বলে পরিচয় দিয়ে তারই কাছ থেকে পরামর্শ নেয় যে, এমতাবস্থায় কি করা কর্ত্তব্য। কিন্তু সে-কাজ এখন কঠিনতম। যত শীঘ্র সম্ভব একটা কিছু বন্দোবস্ত করবার জন্য সে বসে বসে মতলব আঁটতে লাগল।

“আদাব, বাবু; ভাল আছেন—” বিহারী ভাষায় কথা কয়টি বলে এক বৃদ্ধ নিমাইয়ের সামনে এসে হাজির হ’ল।

নিমাই চমকে উঠে বৃদ্ধের প্রতি তাকাল: “আরে! রামদহিন্!

কি খবর? তারপর, তোমার পা একেবারে ভালো হ'য়ে গিয়েছে তো?"

এই রামদহিন্ হোচ্ছে—সেই ষ্ট্রাণ্ড রোডে মোট মাথায় করে সে পড়ে গিয়ে পা ভেঙ্গে ফেলেছিল। নিমাই মেডিকেল হাসপাতালে ভর্তি করে দেওয়ায় তার পা প্রায় সম্পূর্ণ সেরে গিয়েছে;—সে আজ অনেক দিনের কথা।

"হ্যাঁ বাবু—" বৃদ্ধ কৃতজ্ঞভরে বলতে লাগল তার নিজস্ব ভাষায়,—"আপনার দয়াতেই সে-যাত্রায় বেঁচে গিয়েছিলাম—" বলে হাতজোড় করে বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে রইল।

"অমন কথা বোলো না, রামদহিন্, যাঁর দয়া করবার তিনিই করছেন। যাক্; এখানে তোমার বাড়ী নাকি? কি কর এখানে?"

"হ্যাঁ, বাবু, মাইল দু'এক তফাতে একটা গ্রামে আমার বাড়ী—" বলে হাত দিয়ে রামদহিন্ দেখিয়ে দিলে তার কোনদিকে বাড়ী; পরে বললে,—"একটা টোঙা কিনে চালাচ্ছি বাবু, তা' থেকেই দিন গুজরান করি—"

"তা' বেশ—" বলে নিমাই আরও কিছু রামদহিনের সঙ্গে নানা বিষয়ে গল্প করল। তার ইচ্ছে হচ্ছিল রামদহিন্‌কে জিজ্ঞাসা করতে যে, তার বাড়ী যখন সহরের দু' মাইল তফাতে একটা গ্রামে, তখন ঐ গ্রামে কোনো বাড়ী ভাড়া পাওয়া যায় কি না।

"অচ্ছা রামদহিন্—" নিমাই বাধিত স্বরে জিজ্ঞাসা করল,—

"তোমাদের গ্রামে কোনো বাড়ী ভাড়া পাওয়া যায় ?—এই বাস করে থাকবার মতো ?" বলে সে চেয়ে রইল বৃদ্ধের দিকে।

নিমাইয়ের কথা শুনে রামদহিন্ কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলল,—"বাড়ী ভাড়া পাওয়া যায় না ; তবে আমি আপনাকে একটা বাড়ী ঠিক করে দিতে পারি—" বলে সে বর্ণনা করতে লাগল বাড়ীটা কার কি বৃত্তান্ত ইত্যাদি।

নিমাই যেন গহিন্ জলে ডুবতে ডুবতে ডাঙ্গায় উঠল। বিদায় কালীন রামদহিন্ নিমাইকে জানিয়ে গেল, সব ঠিক ঠাক করে আগামী কাল সে জানিয়ে যাবে।

মাঠের মাঝখানে ছোট্ট একটী পল্লী। মাত্র সাত আট ঘর কৃষকের বাস। রামদহিন্ যে-বাড়ীটা ঠিক করেছিল, সেটির মালিক বর্ত্তমানে কলিকাতা নগরীতে প্রাসাদোপম বাড়ীতে বাস করেন বলে তাঁর পিতৃপুরুষের বাস্তু-ভিটেটির কথা একেবারে ভুলে গিয়েছেন বললেই হয়।

বাড়ীটি উত্তর-মুখী এক তালা কোঠা ঘর। পূর্ব্ব দক্ষিণ পশ্চিম দিকে পরস্পরের সহিত সংলগ্ন এক একটী কুঠুরী। তিন দিকেই খাপ্‌রায় ছাওয়া পর্‌-চালা আছে। পূর্ব্ব-দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম বারান্দার কোণে—উঠানের দিকে—দুটি থামের উপর পর্‌-চালাগুলি নির্ভর করে আছে। থাম দুটি দেখলে মনে হ'বে প্রত্যেকটি তিনটি থাম একত্রিত করা। উঠানটুকু দৈর্ঘে-প্রস্থে পাঁচ ছয়

হাতের বেশী হ'বে না। পশ্চিম দিকের কুঠরীর উত্তর প্রান্তর আর পূর্ব্বদিকের কুঠরীর উত্তর—একটী নাতি-উচ্চ প্রাচীর দ্বারা সংলগ্ন। এই প্রাচীরের মাঝখানে প্রবেশ দ্বার। উত্তর মুখী ঘরটিই অপর দুটির অপেক্ষা দৈর্ঘে-প্রস্থে বড়। ঘরে প্রবেশ দ্বারের দু'দিকে দু'টি জানালা; জানালা দুটি কপাটের মতোই লম্বা চওড়া নীচে থেকে উপরের বাজু পর্য্যন্ত লোহার গরাদ খাড়াই ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। ঘরের দক্ষিণ দিকের দেওয়ালেও দুটি জানালা। এ জানলা দুটি উত্তর দিকে দু'টির চেয়ে অপেক্ষাকৃত ছোট। পশ্চিম দিকের জানালাটি লম্বা প্রায় এক মানুষ-সমান, কিন্তু চওড়া খুব কম। ঘরের দরজা জানালার অসামঞ্জস্য দেখলে একজন এই কথাটাই ভাববে যে, বাড়ীটি যখন নির্ম্মিত হ'য়েছিল,—তখন বাড়ীর মালিকের সৌন্দর্য্য-জ্ঞান তীক্ষ্ণ ছিল না বটে, তবে শরীর রক্ষার জন্য আলো বাতাস যে প্রচুর পরিমাণে প্রয়োজন—এ জ্ঞানটি ছিল তার টন্ টনে। তাই বাজারে যেমন দরজা জানলা চোখে পড়েছিল তেমনই কিনে এনেছিলেন।—ঘরের দরজা জানাগুলি অলকাতরা মাখান।

বাড়ীর দক্ষিণ দিকে প্রায় দু'মাইল দূরে—শ'তিনেক কি চার সারি সারি তাল গাছ ছাড়া চার পাঁচ মাইলের মধ্যে আর কিছু দেখা যায় না। সারবন্দী তালগাছগুলো দেখলে মনে হ'বে, যেন আকাশের গায়ে কালো কালো ডোরা কেটে তার উপর সবুজ রঙের টুপি পরান। পশ্চিম দিকে মাইল খানেকের মধ্যে তিনটি বটগাছ

ত্রিভূজাকারে দাঁড়িয়ে আছে। একটী গাছ থেকে অপরটির দূরত্ব আধ মাইলের কম হ'বে না। এ ঘরে যে বাস করবে সে শুধু হাওয়া খেয়ে আর খোলা মাঠের প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখেই কিছুদিন কাটিয়ে দিতে পারবে। পূর্ব্বদিকে রামদহিনের বাড়ী; তারপরেই অপরাপর চাষীদের খাপ্‌রার ছাউনী কুঁড়ে ঘর। বাড়ীর সম্মুখে খানিকটা পতিত জমি; তারই উপর দিয়ে সরু একটী রাস্তা পশ্চিম দিক থেকে পূর্ব্বদিকে—প্রায় আধ মাইল দূরে গিয়ে একটা পাকা রাস্তার সঙ্গে মিশে গিয়েছে।

সে দিন সকালে নিমাই রামদহিন্‌কে পাঠিয়েছে বসুমতীকে আনবার জন্য। সাড়ে দশটা এগারটার আগে এসে পৌঁছুতে পারবে না জেনে, নিমাই রান্না করতে লাগল; কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি করে। কারণ, এবার বসুমতী তাকে চিনতে পারবেই। কেনন', মুখে সে দাড়ি গোঁফও নেই, আর চোখে কালার্ড চশমাও নেই। এই চিন্তায়, একটা অদ্ভূত অনুভূতিতে তাকে এক রকম অস্থির করে তুলেছিল। সে কেবলই ভাবতে লাগল যে কি করে সে বসুমতীর সামনে হাজির হ'বে! প্রথম কি কথাই বা বলবে। তারপর, একথাটাও সে ভাবল,—বসুমতী আদৌ চিনতে পারবে তো? সে একবার ঠিক করল, রান্না সেরে যা যা করবার ঝি'কে বলে, সে বাড়ী থেকে পালিয়ে যাবে। উনানের উপর কড়াতে ফুটন্ত তরকারীটা একবার খুন্‌তি দিয়ে নেড়ে দেয়, আবার তাড়াতাড়ি

করে রান্না ঘরের জানালা দিয়ে বড় রাস্তাটার দিকে সাগ্রহে তাকিয়ে থাকে—যদি আগে এসে পড়ে। তা' হলে?...সে ঠিক করে, তা' হ'লে তাড়াতাড়ি কিছুটা কালি মুখে মেখে, গেঞ্জিতে কাপড়ে হলুদের ছোপ লাগিয়ে মাথায় গামছাখানা বেঁধে মিস্টার সানিয়েলের নিযুক্ত রসুই ঠাকুর সেজে যাবে।... আবার ফিরে এসে উনানের কাছে বসে তরকারী নাড়তে সুরু করে দেয়। সামনে ছোট একটা টিপয়ের 'পর হাত ঘড়িটা রেখে দিয়েছে; ঘন ঘন দেখ্‌ছে ক'টা বেজে ক'মিনিট হল। অনমনস্ক ভাবে কিছুক্ষণ থাকার পর বসুমতী যেই মনের মধ্যে উদয় হ'চ্ছে, আর অমনি তার বুক ছ্যাঁত্ করে উঠছে। রান্না শেষ হ'লে সব গুছিয়ে ঠিক ঠাক করে রাখল। ঝি-কে ডেকে সব শিখিয়ে রাখল—বসুমতী এলে পরে যা' যা' করতে হ'বে। ঘড়িটা নিয়ে দেখলে; দেখলে দশটা বেজে গিয়েছে। ঘড়িটা একবার কাণের কাছে নিয়ে গেল—চলছে না বন্ধ হ'য়ে আছে জান্‌বার জন্য! না, ঘড়ি ঠিকই চলছে! দশটা বেজে পনের মিনিট হ'তেই সে পশ্চিম দিকের ঘরটায় ঢুকে দরজা জানালা সব বন্ধ করে দিলে, উত্তর দিকের জানালাটা আধখোলা করে ধরে দাঁড়িয়ে রইল প্রস্তর মূর্ত্তির মতো। সে কাণ পেতে শুনলে,—বক্ষস্পন্দনের শব্দ, টিপ-টিপ-টিপ।

ওই, ওই! দূরে—সহরের কোল ঘেঁষে রামদহিনের টোঙা আসছে নয়!...নিমাই জানালাটা একেবারে উন্মুক্ত করে পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের 'পর ভর দিয়ে উন্মুখ হ'য়ে দেখতে লাগল—হ্যাঁ,

সত্যিই তো ? দিলে সে ঝপাৎ করে জানালাটা বন্ধ করে, দাঁড়িয়ে রইল অন্ধকার ঘরে নিঃশ্বাস বন্ধ করে। কিছুক্ষণ পরে ধীরে ধীরে জানালাটা একটুখানি ফাঁক করে দেখল; টোঙা এসে পড়েছে বড় রাস্তার মোড়ের মাথায়। দেখেই জানালাটা একেবারে বন্ধ করে দিয়ে ছিট্‌কিনি লাগিয়ে দিলে। তার বুক করছে—ধড়াস্ ধড়াস্ ধড়াস্।

খট্ খট্ খট্—ক্যাঁচ ক্যাঁচ ক্যাঁচ; খট্ খট্ খট্ ক্যাঁচ ক্যাঁচ ক্যাঁচ—এক্কা এসে দাঁড়াল বাড়ীর সামনে।

বসুমতী তার শিশু কন্যাকে কোলে নিয়ে স-সঙ্কোচে এদিক্ ওদিক তাকাতে তাকাতে বাড়ীর ভিতর এসে ঢুকল। শিশুর গায়ে একটি ফ্রক আর মাথায় এক রাশ কালো চুলের মাঝখানে মুখটি যেন একটী সদ্য প্রস্ফুটিত পদ্ম ফুল!

ঝি আর রামদহিন্ জিনিষ-পত্র নামাতে ব্যস্ত।

বসুমতী তার কন্যাকে কোলে করেই উঠানে দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে একবার তাকিয়ে নিলেন চারদিক। তার চোখ দুটো খুঁজছিল তার আশ্রয়দাতাকে বোধ হয়। কাউকে দেখতে না পেয়ে, মিস্টার সানিয়েল্ নেই কেন—এই কথাই বোধ হয় চিন্তা করতে লাগল।

নিমাই ঘরের মধ্যে পা টিপে টিপে এসে বাড়ীর ভিতর দিকের একটা জানালা খুব—খুব—ধীরে ধীরে ছিট্‌কিনিটা খুলল। তার পর নিঃশ্বাস বন্ধ করে ঈষৎ ফাঁক করল জানালাটা; তার চোখে পড়ল—শিশু কন্যাকে কোলে নিয়ে উঠানে দণ্ডায়মানা বসুমতী।

আহা, কি সুন্দর! নিমাই ভাবল,—কি সুন্দর এই বাঙালী হিন্দু ঘরের মাতৃমূর্ত্তি! স্বর্গের দেবী যেন ধরায় অবতীর্ণ হ'য়েছেন! ··· তার প্রাণ চাইল ছুটে গিয়ে বসুমতীকে সম্বর্দ্ধনা করতে। কিন্তু, সে ভাবল,—কিন্তু সে কাজ তো সহজ নয়! কে যেন তার পা দুটো মাটীতে পুঁতে রেখেছে!

রামদহিন্ ট্রাঙ্ক বিছানাপত্র রেখে চলে গেল। ঝি এসে বসুমতীর কোল থেকে মেয়েটিকে নিয়ে স্নান করবার জন্য তাড়া দিলে। সে সব ঠিক করেই রেখেছিল। ঝি বসুমতীকে বড় ঘরটায় নিয়ে গিয়ে জানিয়ে দিলে যে, এই ঘর তার; বাবু তাই ঠিক করেছে। বসুমতী ঘরের ভিতর ঢুকে চারদিক ধীরে ধীরে চোখ বুলিয়ে নিলে। ঘর সাজানো গুছান।···সে ঝি-কে চুপি চুপি কি জিজ্ঞাসা করলে। ঝি কোনো উত্তর না দিয়ে মুখ টিপে শুধু হাঁসতে লাগল। বসুমতী জিজ্ঞাসা করেছিল যে, বাবু কোথায়। কিন্তু ঝি-কে বাবু আগে থেকেই নিষেধ করে রেখেছিল।

নিমাই বেওকুবের মতো অন্ধকার ঘরে একবার বসছে একবার উঠে পায়চারী করছে নিঃশব্দে। সে নিজেকে ভারি বোকা বলে মনে করল। ভাবল,—দ্বারে দাঁড়িয়ে থেকে বসুমতীকে সম্বর্দ্ধনা করলেই ভালো হতো। তা' না করে এ যা' সে করে বসেছে, তাতে ব্যাপারটা আরো হ'য়ে উঠেছে জটিল! এখন কপাট খুলে বাইরে বেরুনোই তো দায় হয়ে উঠেছে! তার নিজের

নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য গালে মুখে চড়াতে ইচ্ছা গেল। সে জানালার কাছে এসে কাণ পেতে শুনতে লাগল বসুমতী কোনো কথা বলছে কিনা।⋯লজ্জায়, একটা অজানা আশঙ্কায় তার গায়ের রক্ত প্রায় ঠাণ্ডা হ'য়ে এসেছিল। কিন্তু যখন সে দেখল যে বসুমতীর স্নান হ'য়ে গিয়েছে, এবার ভাত দিতে হ'বে, তখন তার গা দিয়ে কল্ কল্ করে ঘাম বেরুতে লাগল।⋯আর তো হয় না! সে ভাবল, এবার সাহস করে বেরুতেই হ'বে—জয় মা কালী বলে! সে জানালা খুলে দেখল ঝি মেয়েটির মাথায় তেল দিয়ে ওদিকে নিয়ে চলে গেল। নিমাই তখন আস্তে আস্তে কপাট খুলে ঘর থেকে বেরুল। পা টিপে টিপে, বড় ঘরটার দ্বার গোড়ায় এসে চুপটি করে দাঁড়িয়ে রইল।

বসুমতী ঘরের ভিতর আয়নার সামনের দাঁড়িয়ে ভিজে চুলগুলো গামছা দিয়ে ঝাড়ছে।

নিমাই কথা বলবার জন্য মুখটা ফাঁক করল, কিন্তু কোনো স্বর বেরুল না; খুব আস্তে সে গলা ঝেড়ে নিলে। তার আপাদমস্তকের রক্তগুলো তোলপার করতে সুরু করেছে!

"আমি বারেন্দোর বামুন—রেঁধেছি, খাবেন কি? না রাঁধবার যোগাড় করে দিতে বোলবো ঝি'-কে—" কোনো রকমে কথাগুলো বলে জড়সর হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল নিমাই।

বসুমতী কথাগুলো শুনেই হাতের চিরুনীটা রেখে দিয়ে কাণ খাড়া করে দাঁড়াল। সে ভাবল,—যেন তার পরিচিত স্বর!

কিন্তু কার? কোন্‌দিক থেকে কে বোললে?—তার বুকটাও খুব জোরে জোরে স্পন্দিত হ'তে লাগল। পিছু ফিরে পা টিপে টিপে ঘরের বাইরে এসে নিমাইকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সে চমকে উঠল! কিছুক্ষণ সে তার প্রতি অভিভূতের মতো রইল তাকিয়ে।

"একি!" বিস্ময়ে কাঠ হ'য়ে গিয়ে অস্ফুট স্বরে বললে,—"নি—মু—দা!"

"না, মিষ্টার সানিয়েল—" মাথা নীচু করে নিমাই বললে; তার স্বরে অভিমান।

"নিমুদা তুমি—?" এক অস্বাভাবিক স্বরে বললে বসুমতী; তার দু' চোখ থেকে ঝর্ ঝর্ করে অশ্রু গড়িয়ে পড়তেই ত্বরিতে পিছু ফিরে ঘরের ভিতর ঢুকে গেল।

নিমাই পাথরের মূর্ত্তির মতো দাঁড়িয়ে রইল- তার সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে ঘাম ঝরছে; তার বুকে কে যেন মুগুরের আঘাত করছে ঘন ঘন। একটা অব্যক্ত যন্ত্রণায় সে অস্থির হ'য়ে উঠলেও পা তুলবার ক্ষমতা তার নেই।

ঘর থেকে চোখের জল মুছে প্রকৃতিস্থ হ'য়ে বসুমতী বেড়িয়ে এল।

"নিমুদা তুমি—" বসুমতী সকৃতজ্ঞ ভাবে বলতে লাগল,—"তাই তো বলি, কে আমাকে এত যত্ন করছে—" বলে সে গলায় আঁচল দিয়ে নিমাইয়ের পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলে; পরে

উঠে নিমাইকে এক চোখ দেখে নিয়ে ধীরে ধীরে দৃষ্টিটা নামিয়ে নিয়ে বললে,—"তা' তুমি এতদিন বলনি কেন ?"

নিমাই সে প্রশ্নের কোনো জবাব না দিয়ে পূর্ব্বে মতোই দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ ; পরে ধীরে ধীরে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বসুমতীর দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বললে,—"চল, খাবে চল ; বারোটা বেজে গিয়েছে—" বলে রান্না ঘরের দিকে পা বাড়াল।

—পঁচিশ—

বসুমতীর কন্যাটির নাম অযাচিতা।

কন্যার নাম-করন মা নিজেই করেছে ; কেন, তা' নিজেই ভালো করে জানেনা। অযাচিতার ডাক নাম 'চিতা', বয়স তার সবেমাত্র দেড় বৎসর ; কিন্তু সে নানা রকম কথায় হার মানিয়ে দিতে পারে—যে তার চেয়ে আরো দেড় বৎসর আগে পৃথিবীটাকে দেখেছে।

বসুমতী শিখিয়েছে তার মেয়েকে নিমাইকে 'বাবু' বলে ডাকতে। সে এই সিদ্ধান্তটি করেছে নিজের দুর্ব্বলতা বশতঃ।··· কিন্তু চিতা যখন নিমাইকে 'বাবু' কখনো কখনো 'বাবা' বলে ডাকে—তখন নিমাইয়ের মুখ লাল হ'য়ে উঠলেও বসুমতী সেখানে, অন্ততঃ

বাহ্যিক, বেশ দৃঢ়তা দেখায়। এমন মনোভাব দেখায়, যেন—এর মধ্যে লজ্জা বা ওই রকমই কোনো কিছু করার কারণই নেই। নিমাই বসুমতীর সিদ্ধান্ত মাথায় পেতে নিয়েছে। তার প্রধান কারণ হ'চ্ছে বসুমতীর রাশ আগের চাইতে বেশ একটু ভারি হ'য়েছে বলে—তার প্রতি নিমাইয়ের প্রচ্ছন্ন ভালবাসাটা ভয়-মিশ্রিত হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। অবশ্য সেজন্য বসুমতীর প্রতি ভালোবাসার উগ্রতাটা কিছু মাত্র কমেনি। কিন্তু এখানে একটা কথা হ'চ্ছে,—চিতাকে দিয়ে নিমাইকে 'বাবু' ডাকানোর মধ্যে বসুমতীর এই ইচ্ছা ছিল যে, সকলের মধ্যে—অন্ততঃ এই পল্লীটির ভিতর জানিয়ে দেওয়া, সে এবং নিমাই স্বামী-স্ত্রী। পরে জানতে পারা যাবে এ রকম কোনো মনোভাব নিয়ে সে ও-সিদ্ধান্ত করেনি।

বসুমতীর এখানে আসবার প্রায় এক সপ্তাহ আগে নিমাই এই পল্লীটিতে এসে বাস করতে সুরু করেছিল। রামদহিন্ এর বহু আগেই তার ষ্ট্রাণ্ড রোডের দুর্ঘটনার কথা তার প্রতিবেশীদের কাছে বর্ণনা করেছিল; এবং যার অনুগ্রহে সে-যাত্রায় সে রক্ষা পেয়েছিল, সে এখানে এসেছে শুনে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা নিমাইকে দেখে তার দীর্ঘ জীবনের কামনা করেছিল তারা এবং সে তাদের মধ্যে বাস করবে শুনে তাদের আনন্দ আর ধরেনি। রামদহিন্ যেমন জিজ্ঞাসা করেনি, আর নিমাইও বলেনি যে, বসুমতী তার কে হয়। তাই বসুমতী এখানে আসতেই ঝি রাতনা পল্লীটির মধ্যে

'বাঙালী বাবুর বোহু এসেছে' এ কথাটি রাষ্ট্র করতে বেশী দেরী করেনি।

এক এক করে পল্লীটির বুড়ি-বউ-ঝি সকলেই নিমাইয়ের বাসায় এসেছে বাঙালী বাবুর বোহু দেখবার জন্য। এসে প্রায় সকলেই যখন বসুমতীর কাছে নিমাইয়ের মহত্বের কথা বলে এবং ওরকম স্বামীর স্ত্রী হতে পেরেছে বসুমতী, সেজন্য তারা সকলেই তার ভাগ্যের তারিফ করেছিল।

প্রতিবেশীদের এই ধরনের কথাবার্ত্তায় বসুমতী অন্তরে অন্তরে লজ্জিত হ'লেও তাদের কাছে আসল সম্পর্কটা লুকিয়ে রাখা বিবেচনার কাজ বলেই মনে করেছিল সে। কারণ, একদিকে এদের কাছে সত্য বলা যেমন নিরর্থক, অন্যদিকে তেমনি প্রতিবেশীদের কাছে যে শ্রদ্ধার আসন তারা পেয়েছিল, তা' থেকে চ্যুত হ'বার আশঙ্কা। অবশ্য নিমাই ও বসুমতীর আসল সম্পর্কটা লুকিয়ে রাখা বেশী দিন সম্ভব হ'তো না, যদি এই পল্লীটি বাঙালী পরিবার-পল্লী হ'ত; কারণ, বাঙালীর চেয়ের বিহারীরা, অন্ততঃ এই কৃষক শ্রেণীর লোকেরা, পরের চর্চ্চায় থাকা নিষ্প্রোয়জন বোলেই মনে করে। সেই জন্য তাদের পক্ষে শান্তিতে বাস করা সম্ভব হ'য়েছিল।

প্রায় মাস খানেক হ'য়ে গিয়েছে বসুমতী এখানে আসার পর। এই একমাস নিমাই ও বসুমতী পরস্পরের সঙ্গে বাইরে বাইরে হেসে কথাবার্ত্তা বললেও তাদের দু'জনেরই অন্তরের মধ্যে এমন

একটা দ্বন্দ্ব চলছিল যার জন্য তাদের কাজ ও কথাবার্ত্তার মধ্যে আন্তরিকতা মোটেই ছিল না।···সেদিন হঠাৎ বসুমতীর চেতনা হ'ল। নিমাই যখন দুপুর বেলায় বাড়ীতে ছিল না, তখন বসুমতী নিমাইয়ের ঘরে ঢুকে তার অবস্থা দেখে নিজের কাছে নিজে সে হ'ল ভারী লজ্জিত। দেখলে, ঘরের পাশে নিমাই যে তক্তপোষে শোয়, তার ওপর অগুছালো ময়লা বিছানা, অন্য পাশে কতকগুলো চেয়ার টেবিল এ ওর ঘারে-গর্দ্দানে হ'য়ে পড়ে আছে, এক রাশ দামী বই হেথায় হোথায় ছড়ানো, আলমারীটা ধূলোয় ভর্ত্তি, একটা মস্তবড় আয়না কাগজে মোড়া অবস্থায় দেওয়ালে ঠেকান। মেঝেয় নিমাইয়ের কতকগুলো ময়লা কাপড় জামা। ঘরের এরকম অবস্থা ইতি পূর্ব্বেও সে দেখেছে কিন্তু সে-দেখা শুধু চোখ বুলানো; চোখের ভিতর দিয়ে মাথা পর্য্যন্ত পৌঁছায়নি। কারণ, মানুষ যখন সকল সময় অন্তর্দ্বন্দ্বের মীমাংসায় নিজেকে ব্যস্ত রাখে, তখন সে যা-কিছু দেখে—তা' অন্তরে ছাপ পড়ে না দেখার মধ্য দিয়ে।···দেখেই সে দাঁত দিয়ে জীভ কাটল। পরে তার অত্যধিক স্বার্থপরতার জন্য নিজে নিজে গালে চড় মারতেও ইচ্ছা গেল। কেননা, বাড়ীর মধ্যে সব চেয়ে ভালো ঘরটায় ভালো খাটের ওপর বিছানায় সে শোয়। আর নিমাই শোয় একটা তক্তপোষে ময়লা বিছানায়। তৎক্ষণাৎ সে ঝি-কে দিয়ে দুটো লোক ডাকিয়ে আনলে এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই চেয়ার টেবিল আয়না আলমারা বই পত্তর সব ঝেড়ে মুছে বড় ঘরটায় মানান-সই করে সাজিয়ে

ফেললে। ঘরের পূবদিকে শোবার খাট, মাঝখানে নাতিউচ্চ গোল টেবিলটা পেতে তার দু পাশে বেতের চেয়ার দুটো, তারই অনতিদূরে—পশ্চিমদিকে—দক্ষিণ দিকের দেওয়ালে হুক্ ঠুকে বড় আয়নাখানা খাটানো হ'লো; আয়নার নীচেই বড় টেবিলটা আর তার সামনে আর্ম্মলেশ চেয়ারখানা রাখলে। আলমারী রাখলে—পশ্চিম দিকের এক কোণায়; প্রত্যেক বইখানা ঝেড়ে মুছে গুছিয়ে রাখলে তাতে; কাপড়-জামা-রাখা-আলনাটা উত্তর দিকের দেওয়াল গোড়ায় রেখে তার নীচে নিমাইয়ের কয়েক জোরা জুতো—বুট, কেড্‌স্, চটি প্রভৃতি বসুমতী স্বহস্তে ঝেড়েমুছে রাখলে। নিজের ব্যবস্থা করে নিলে নিমাই যে-ঘরটায় শুতো সেই ঘরটায়।

বিকেল বেলায় নিমাই যখন এলো,—বসুমতী তখন রান্না করছে। সে গায়ের কোটটা খুলতে খুলতেই ঘরে ঢুকছিল।

"নিমুদা, ওটা আমার ঘর; তোমার ব্যবস্থা করে দিয়েছি বড় ঘরে—" বলতে বলতে বেড়িয়ে এলো বসুমতী রান্নাঘর থেকে।

নিমাই সব দেখেই হক্ চকিয়ে গেল; তার গায়ের কোটটা আধখোলা ভাবে ঘর থেকে বেড়িয়ে এসে বললে, "কেন, বেশ তো ছিলো—"

"বেশ তো ছিল বৈকি—" মুচকি হাসি হাসতে হাসতে বসুমতী বললে,—"আমি না হয় চোখের মাথা খেয়েছি, তাই বলে তুমি মেয়েমানুষের এত আস্পদ্দা সহ্য কর কি কোরে—"

নিমাই বসুমতীর শেষ কথা কয়টার অন্তর্নিহিত অর্থ উপলব্ধি কোরতে পারল না; হাঁ করে তাকিয়ে রইল বসুমতীর মুখের দিকে। পরে বসুমতীর পিছু পিছু গিয়ে বড় ঘরটায় ঢুকল। ঘরের অবস্থা দেখে তার মন চাইল উচ্ছ্বসিত ভাবে বসুমতীকে ধন্যবাদ দিতে; কেননা সে জিনিষগুলো কিনে ছিল ঠিক এই ভাবে ঘর সাজাবার জন্যই।

"তা' হ'লে কালকেই তোমার জন্য একটা খাট কিনে আনব—" বলে নিমাই বসুমতীর দিকে তাকালে।

"না, না—টাকা খরচ কোরে আর খাট কিনতে হবে না—" তীব্র আপত্তি জানিয়ে বসুমতী ঘর থেকে বেড়িয়ে গেল।

নিমাই বাইরের জামা কাপড় বদলে হাত মুখ ধুয়ে এসে বৈকালিক জলপান সারল। পরে তার চামড়ার ব্যাগটা থেকে রুমালে বাঁধা কি কতকগুলো বা'র করে ছোট্ট টেবিলটায় রেখে চেয়ারে বসে সেভিংস্ ব্যাঙ্কের একটা পাশ বুকের পাতা উল্টাতে উল্টাতে অন্যমনস্ক ভাবে ডাকলে,—"বসু—"

"আসছি, এক্ষুণি—" বসু রান্নাঘর থেকে সাড়া দিলে; সে ডালে সাঁতলা দিচ্ছিল; ছোঁ—শব্দ করে ধোয়াটা তার নাকে যেতেই শেষের কথাটা আটকে গেল।

নিমাই বসে বসে রুমালটার বাঁধন খুলল। তার মধ্যে ছিল বসুর গহণাগুলো; এগুলো এতদিন নিমাই তার ব্যাঙ্কে জমা রেখেছিল, আজ সে ব্যাঙ্ক থেকে তুলে নিয়ে এসেছে।

"কি বলো—" আঁচলে জল হাত মুছতে মুছতে বসু ঘরে ঢুকে বলল।

নিমাই আপন মনেই গহণাগুলো ঘাঁটছিল; বসুকে একবার সামনে দেখেই থতমত খেয়ে গিয়ে বাধিতস্বরে বললে,— "এই নাও বসু, তোমার গহণা, আর তোমার সে-টাকা সেভিংস্‌ ব্যাঙ্কে রেখে দিয়েছি, এই তার পাশ-বুক—" বলে পাশ-বুকটা এগিয়ে দিলে।

বসু স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে নীচেকার ঠোঁটটা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে গহণাগুলোর প্রতি কয়েক মুহূর্ত্ত তাকিয়ে রইল, তারপরে নিমাইকে এক চোখ দেখে নিয়ে তাড়াতাড়ি করে গহণাগুলো বাঁধল রুমালটায়। সেগুলো নিয়ে আলনায় ঝোলান নিমাইয়ের কোট থেকে চাবি বাড় করল, করে নিমাইয়েরই বড় ট্রাঙ্কটা—যেটা টেবিলের এক পাশে একটা জল-চৌকির 'পর ছিল—খুলে তাতে রাখল। নিমাই হয়ত বুঝতে পারেনি—এই গহণাগুলো বসুর সামনে বা'র করে তাকে কি রকম দুঃখ দিলে।···বসু ট্রাঙ্কটা বন্ধ করে চাবির থোলো কোটের পকেটে রেখে নিমাইয়ের সামনে এলো; নিলে সে পাশ-বুকটা তুলে, নিয়েই কোনো কথা না বলে এক টান তারপর এক টান দিয়ে —একেবারে চার ফাঁক করে ফেল্লে।

"ওকি! ওকি করলে বসু—" ব্যস্তভাবে নিমাই বললে; বলে সে হতভম্বের মতো চেয়ে রইল বসুর প্রতি।

"কি করলাম দেখতে পেলে তো—" অভিমানের সুরে বললে বসু।

"ছেলেমানুষী করলে কেন, কতো হাঙ্গামার মধ্যে পড়তে হ'বে বল দেখি—" চিন্তিত ভাবে নিমাই বলল।

"হাঙ্গামায় পড়তে হয় তুমি পড়বে, নষ্ট হয় কিছু তোমার গেল; তুমি আমার সামনে ওসব বা'র করবার আগে চিন্তা করে দেখনি কেন একবার—"

"আমারই ভুল হ'য়েছে—" দোষটা নিমাই নিজের ঘাড়ে টেনে নিলে।

"সেটা আগে ভাবলে ভালো হ'ত—" বলে বসু ঘর থেকে বেড়িয়ে গেল।

অভিভূতের মতো বসে রইল নিমাই।

—ছাব্বিশ—

এই পুণ্যভূমি পাটলীপুত্র নগরীর অতীত কীর্ত্তি-কহিনীর যে-কয়টি স্মৃতিচিহ্ন আজও সজল নয়নে সেই পুণ্যাত্মাদের আগমনের আশায় পথ চেয়ে বসে আছে—তাদেরই অন্যতম—সহরের এক নির্জ্জন প্রান্তে একটি বাগান।……সদ্য নিদ্রোত্থিত রমনীর শ্লথ কবরী যেমন ধীরে ধীরে তার পৃষ্ঠদেশকে ঢেকে ফেলে, তেমনি এই বাগানের মধ্যে যে-সমস্ত ইমারতাদি ছিল, সে-সবেরা ধ্বংসাবশেষ ধীরে ধীরে

ধরণীর বক্ষে বিলীন হ'য়ে যাচ্ছে।—এই বিলীয়মান বাগানটি দেখবার জন্য বসু আর নিমাই এসেছিল সেদিন।

সহরের দক্ষিণ-প্রান্তে একটি পিচের রাস্তার দক্ষিণ পাশে—পূর্ব্বদিক থেকে পশ্চিম দিকে প্রায় এক মাইল ব্যাপী একটি নাতি-উচ্চ বাঁধের মতো দেখতে পাওয়া যাবে। বাঁধটি মাটির, তৃণাচ্ছাদিত। সেটির আবর্ত্তিত অগ্রভাগের উপর দিয়ে স্বচ্ছন্দে একটী লোক হাঁটতে পারে। পূর্ব্বোক্ত বাগানটিকে রক্ষা করবার উদ্দেশ্যেই এই বাঁধাটি নির্ম্মিত হ'য়েছে বোধ হয়। এর ঠিক মাঝখানে বাগানের প্রবেশ পথ। প্রবেশ পথের দু' পাশে—বাঁধটির উভয় মুখ এমন খাঁজ কাটা কাটা ভাবে শান দিয়ে বাঁধন, যেন বাঁধটির উপর উঠবার সিঁড়ি তৈরী করে দিয়েছে। এই প্রবেশ দ্বারের দক্ষিণ দিকে মুখ করে দাঁড়ালে প্রথমেই চোখে পড়বে একটী পশুশালার ভগ্নাবস্থা।…তারপর ভিতরে ঢুকে পাশে তাকালে দেখতে পাওয়া যাবে বাগানের আদি সীমানা-যে প্রাচীর দ্বারা নির্দ্দিস্ট ছিল, তাদের অবলুপ্ত প্রায় অস্তিত্ব।

যে-ধূলিময় পথটি দিয়ে বাগানের ভিতর যেতে হয় সেটি প্রায় বিশ গজ দক্ষিণ দিকে সোজা গিয়ে ধনুকাকারে বেঁকে পূব দিকে কিছু দূর গিয়ে একটী পতিত জমির সঙ্গে মিশে গিয়েছে। প্রবেশ দ্বারের অব্যবহিত পরেই দু' পাশে কল্কে ফুলের গাছ,—তার মাঝে পল্লবহীন শুষ্ক ফল ভারাক্রান্ত শিড়িশ গাছটা সবুজদের মধ্যে বেওকুব বৃদ্ধের মতো জড়সর হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে।…

ঝাউ গাছ দুটির মস্তক আকাশের অর্দ্ধপথ অতিক্রম করেছে; তাদের দেখলে মনে হ'বে বাগানের রক্ষী হিসাবে পাঠান-প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে আছে যেন! গাছ দুটির বিরামহীন সাঁই সাঁই শব্দ শুনলে মনে হবে যেন বলছে ওরা,—'নাই নাই সে-পথিক নাই—'

এখন, রাস্তাটা যেখানে বেঁকে পূব দিকে চলে গিয়েছে তার মাথার উপর প্রায় বিঘে দুই পতিত জমি; জমিটির দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে সোদাল-শিমুল, কয়েৎ-বেল কামিনী ফুল এবং আরো বহু বন-বৃক্ষ।···তাদের মধ্যে আগামী বসন্তের মহড়া চলেছে; তাই কোনো কোনো গাছের পাতা একেবারে হলুদ হ'য়ে গিয়েছে। যে-গাছটির পাতা হলুদ রঙ হ'য়ে গিয়েছে, তাদের মধ্যে এখনও যে-সমস্ত পাতা কৃষ্ণাভ-সবুজ—তারা ঝড়ে পড়বার আগে রঙ বদলাবে কিনা কে জানে?···একটা গাছ একেবারে নেড়া মাথায় দাঁড়িয়ে আছে। তাকে উপেক্ষা করে পাশের গাছটা হাসছে—বসন্ত-বাতাসের যাদু স্পর্শে সকলের আগে তার সর্ব্বাঙ্গে কচি পাতা পিল্ পিল্ করে বেড়িয়েছে বলে।···রক্তবর্ণ পুষ্পাচ্ছাদিত বৃদ্ধ শিমুল বৃক্ষটি যদি সকলের অভিভাবকত্বের দাবী করে; তবে সেটা একেবারে অন্যায় কাজ হ'বে বলে মনে হয় না।

পথটি—যেটা ঝাউ ফলে ভর্ত্তি হ'য়ে আছে—বেয়ে পূব দিকে অগ্রসর হ'লে চোখে পড়বে অনতিদূরে বিরাট একটা অট্টালিকার প্রায়োবলুপ্ত ইঁট আর চূণ-বালির জমাট বাঁধা অংশ স্তূপীকৃত হ'য়ে

আছে।… পথের দু' পাশে ফাঁকা জমি, কেবল মাঝে মাঝে সবুজ পল্লবে পল্লবিত জাম আর করেঞ্জা গাছ। তাদের মধ্যে দুটি ছোট ছোট কুঁয়া; কুঁয়া দুটির চার পাশ শান বাঁধান বটে, কিন্তু নূতনের মতো এখনও সাদা ধব ধব করছে কি করে—তা' ভাবলে আশ্চর্য্য হ'তে হয়!

পথটি যেখানে পতিত জমির সঙ্গে মিশে গিয়েছে—সেইখান থেকে পূব-দক্ষিণ কোণাকোণি ভাবে কিছুদূর গেলে, আমবাগানের মধ্যে উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত প্রায় তিরিশ হাত লম্বা যে জিনিষটি দেখতে পাওয়া যাবে, সেটাকে মনে হবে একটা কবর বোলেই; কিন্তু আসলে সেটা কবর নয়, একটী বাঁধানো পথ—মাটির মায়ের বুকের ভিতর স্থান করে নিয়েছে। তার উপর স্বল্প জনপদ-দলিত পথ রেখাটি স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। এই পথটির প্রথম ভাগে বসু আর নিমাই এসে দাঁড়াল, তারা কিছুক্ষণ আগে রামদহিনের এক্কা থেকে নেমেছে। পাপাপাশি ভাবে ধীর গতিতে অগ্রসর হলো তারা,—পথটির মাথার উপর দিয়ে—দক্ষিণ প্রান্তে যে-স্তম্ভটি আছে, সেই দিকে।

স্তম্ভটি ঐতিহাসিক নিদর্শন। সেটির উচ্চতা প্রায় পাঁচিশ হাত, প্রস্থ পাঁচ ছয় হাতের বেশী হ'বে না। তার উত্তর দিকের দ্বার দিয়ে ঢুকে দক্ষিণ দিকে বেড়িয়ে যাওয়া যায়। মন্দিরের বা অলিন্দের প্রবেশ দ্বারের মতোই স্তম্ভটির প্রবেশ-পথের ধরন; প্রায় আট-নয় হাত উঁচু, চওড়া কিন্তু দেড় হাতের বেশী নয়।

আবার এর উত্তর-দক্ষিণ দিকের প্রবেশ দ্বার দুটির মতোই পূব পশ্চিম দিকেও দুটি পথ আছে; এ দুটির উচ্চতা কিন্তু চার হাত কি পাঁচ হাত, চওড়া এক হাতের কিছু বেশী।…শেওলায় স্তম্ভটির রঙ হ'য়ে গিয়েছে কালাটে; তার নীচের দিকে মাঝে মাঝে চূণ বালি খসে গিয়েছে। ভূমিকম্পের ঝাঁকুনিতে—উত্তর দক্ষিণ প্রবেশ দ্বারের মাথা থেকে পূর্ব্বদিকে আড় ভাবে ফেটে গিয়ে ঈষৎ হেলে পড়েছে পশ্চিম দিকে। তার মাথায় জল দাঁড়াবার সম্ভাবনা আছে কিনা, তা' নীচে থেকে বোঝবার উপায় নেই; কিন্তু জল-নিকাশের একটা ধাতু নির্ম্মিত নালী আছে। এই নালিটির গোড়ায়—দেওয়ালে—সবে মাত্র মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে একটি বাচ্চা বট গাছ। স্তম্ভের পূব দিকে—বোধ হয় এরই একটা অংশের—ধ্বংসস্তূপ মাটির মধ্যে নিমজ্জিত; কেবল মাঝে মাঝে দু'-এক খণ্ড গাঁথুনি উঁকি মারছে।…পশ্চিম দিকে দেওয়ালের নীচে বেশ বড় গোচের একটা ইঁন্দারা; তার ভিতরে চার পাশে শেওলা গাছে ভর্ত্তি। প্রায় আট দশ হাত নীচে কৃষ্ণবর্ণ বদ্ধ-জলে বুজ্‌কুরি উঠছে। ইন্দারাটা দেখবার জন্য সেইদিকে এগুলো বসু আর নিমাই। উঁকি মেরে দেখেই নিমাই পিছিয়ে এলো। বসু চুপ করে দাঁড়িয়ে পড়েছিল; এখন সে দেখবার জন্য পা টিপে টিপে এগিয়ে গিয়ে ভয়ে ভয়ে উঁকি মারতে লাগল। তার ভয় দেখে, নিমাই মুচকি হাঁসি হেঁসে বললে,—"দোবো, ঠেলে ফেলে—"

"এঁ ম্যা গো—" নিমাইয়ের কথায় বসু সঙ্কুচিত হ'য়ে গিয়ে প্রায় পাঁচ হাত পিছু হ'টে গেল ত্বরিতে। পিছু হটে এসে এক দৃষ্টে নিমাইয়ের মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল; পরে কান্না-অভিমান-মিশ্রিত স্বরে সে বললে,—"দাওনা, দাও; দিয়ে আপদ চুকিয়ে ঝাড়া হাত-পা হও।—কেউ দেখতে আসবে না, এই ইন্দেরায় ঢুবিয়ে মেরে ফেল্লে—"

বসুর কথায় নিমাইয়ের বুকে লাগল আঘাত। তার হাঁসি ভরা মুখে হঠাৎ একটা বেদনার ছায়া নেমে এলো ধীরে ধীরে। সে আর কোনো কথা না বলে আকাশ দেখতে দেখতে শিস্ দিতে লাগল।

স্তম্ভের কিছু উত্তর দিকে একটা চূণ-বালির জমাট বাঁধা অংশের উপর নিমাই এসে বসল। বসু তার সামনে অনতিদূরে প্রবণ ভূমিটায় আঁচল বিছিয়ে নিয়ে নিশ্চিন্ত মনে শুয়ে পড়ল। নিমাইও পা ছড়িয়ে বসে পড়ে, চূণ বালির জমাট বাঁধা অংশটায় হেলান দিয়ে তাকিয়ে রইল তার পশ্চিমে কিছুদূরে ঘন সন্নিবদ্ধ আম গাছগুলোর দিকে; নব-মুকুলিত মুকুল ও ঝড়া-শুকনো-পাতার-সৌগন্ধ সে নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে গ্রহণ করতে লাগল।····বাসন্তিক অপরাহ্নের প্রাণ মাতানো মৃদ মন্দ সমীরণে তার মাথার চুলগুলো ফুর্ ফুর্ করে উড়ছে; চোখের মধ্যেও বাতাস ঢুকে ক্রমশঃ ছোট হ'য়ে যাচ্ছে সে দুটো যেন।···সে এক দৃষ্টে চেয়ে রইল—আম্র-পল্লবের মধ্য দিয়ে সূর্য্যদেব ধীরে ধীরে অস্তাচলের দিকে অগ্রসর হ'চ্ছেন, সেই দিকে;

দেখলে মনে হয় যেন আম গাছের শাখায় নিঃশব্দে একটা ফুলছরি জ্বলছে। সূর্য্যের প্রত্যেক রশ্মিটি এত স্পট যে, এক একটী করে গোনা যায় যেন! আবার প্রতি রশ্মিটির সাত-রঙা রঙ দেখলে রাম-ধনুকের কথা মনে করিয়ে দেয়।...হঠাৎ, আমগাছের ফাঁক দিয়ে অস্তগামী সূর্য্যের এমন একটা দৃশ্য হয় তো দেখা গেল, যেটাকে ভালো করে দেখে নেবার জন্য চোখের পলক ফেললে আগের মতোটি আর দেখা যাবে না।....আগের মতো আর দেখা যাবে না! ভেবে, মাথা উঁচু নীচু এপাশ ওপাশ করেও হতাশ হ'য়ে ক্ষুণ্ন মনে বসে থাকতে হ'বে। আবার হয় তো কিছুক্ষণ পরে মনোরম একটী দৃশ্য চোখে পড়ে আগেকার দৃশ্য দেখতে না পাওয়ার জন্য মনঃকষ্টটা অন্তর্হিত হ'য়ে মুখে হাসি ফোটায়!

প্রায় চারশ' গজ লম্বা ভাবে দু'দিকের সারবন্দী কলুমে আম গাছগুলো এমন পরস্পরের সঙ্গে সন্নিবদ্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে আছে, যেন কোনো এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আসবে বলে তারা তরবারীতে তরবারী ঠেকিয়ে মুখোমুখী ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। ওঃ—দূরে, পশ্চিম দিকের শেষ প্রান্তের ঠিক মাঝখানে, একটা আমগাছ এমন ভাবে দাঁড়িয়ে আছে যেন সে কম্যাণ্ডার!...আম বাগানটার ভিতর অন্ধকার। কিন্তু তার মাঝে মাঝে সূর্যের রশ্মি আছে; এটা বেশ স্পষ্ট বোঝ যায়—যখন সেই রশ্মির মধ্যে একটা ছোট্ট পোকা এসে পড়ছে উড়তে উড়তে। পোকাটা সেই রশ্মিতে কয়েকবার ঘুরপাক খেয়ে যখন আবার ছায়ার মধ্যে চলে যাচ্ছে,

তখন তাকে আর দেখা যায় না।···দূরে—বাগানের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে একখণ্ড তৃণভূমি। সেই তৃণভূমিতে সবুজ ঘাসগুলোর সরু শিষের মাথায় বেনা ফুলের মতো সাদা সাদা ফুল: সেগুলি অস্তারুণ রাগে রঞ্জিত।···ঘাসের শিষগুলো বাতাসে দুলছে মৃদু মৃদু। দিনান্তের ম্লান-রশ্মি-রঞ্জিত-তৃণভূমির উপর অসংখ্য ফড়ি, নানা রকম পোকা নিঃশব্দে উড়ে বেড়াচ্ছে।···নিমাই চোখে এই সমস্ত দেখছিল, আর কাণ পেতে শুনছিল—বাগানটার কোনোখানে একটা কোকিল আপন মনে ডাকছে—কু-কু-কু-কু-উ-ও, কু-উ-ও; আবার অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে একটা অশান্ত পাপিয়ার অবিরাম স্বর—'চোখ গেল' 'চোখ গেল' 'চোখ গেল'। নির্জ্জন নিস্তব্ধ বাগিচায় বসে এই কোলিলের 'কু-উ-ও', আর দূরান্তরের পাপিয়ার 'চোখ গেল' সু-সামঞ্জস্য স্বর শুনলে সত্যিই আত্মহারা হ'য়ে পড়তে হয়।····শুধু তাই নয়; তার মধ্যে আবার টুনটুনি, নীলকণ্ঠ, কুকো পাখী প্রভৃতি অগুনতি পাখীগুলো আপন মনে এমন ভাবে ডেকে যাচ্ছে, যেন একটী গানের আসর; বাদ্য-যন্ত্রগুলি এক সুর লয় তানে বাঁধা। তার মাঝ থেকে একটা বেরসিক পাখী—যেটার লেজ থেকে গলা পর্যন্ত হলুদে রং, গলা মুখ মিশ কালো, ঠোঁঠ লাল—গাছের এক শাখা থেকে অন্য শাখায় উড়তে উড়তে অসামঞ্জস্য ভাবে আপন মনে ডেকে যাচ্ছে—ককি-কুকি-কোক, ককি-কুকি-কোক।····নীলকণ্ঠ পাখীটা এতক্ষণ বেশ ডাকছিল; হঠাৎ একটা চাষাড়ে স্বরে—ট্যা ট্যা ট্যা—এ্যা-এ্যা,

ট্যাক্ ট্যাক্ ট্যাক্ শব্দ করতে করতে পাখা গুটিয়ে খাড়াই ভাবে উর্দ্ধে উঠে গেল, আবার পাখা মেলে দিয়ে নেমে পড়ল শান্ত ভাবে। হঠাৎ···একটা বাজ পাখীর আচম্বিত আগমনে অন্যান্য পাখীগুলো তীক্ষ্ণ স্বরে—কিঁ কিঁ কিঁ—শব্দ করতে করতে পল্লবান্তরালে আশ্রয় করে নিলে—যেন গানের আসর ভঙ্গ হ'য়ে গেল!

পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণ থেকে উত্তর-পশ্চিম কোণ পর্য্যন্ত গাছের তলা দিয়ে আকাশ দেখা যায়; দেখে মনে হয় যেন একটা মোটা সাদা রশি দিয়ে বাগানটাকে বাঁধবার চেষ্টা করা হ'য়েছে। পূব দিকটা কিন্তু একেবারে খোলা। বহু—বহুদূর পর্য্যন্ত দেখা যায়। দিগন্তে আকাশ গলে ধূম্রাকারে সারবন্দি তাল গাছগুলোকে ঢেকে ফেলছে যেন। পূব-দক্ষিণ কোণে—বাগানের গাছের ফাঁক দিয়ে—বহুদূরে অবস্থিত একটা ছোট পল্লী দেখা যায়। পল্লীটির সমস্ত ঘরগুলি খাপ্‌রার ছাওয়া; দু-একটা ঘরের দেঁওয়াল চূণ-কাম করা বলে পল্লীটির মাঝে মাঝে যে নারকেল গাছগুলো আছে তার মাথার সবুজ রঙ, মাঝে মেটে, নীচে সাদা রঙ বেশ মানিয়েছে—!

বন্ধু ঘুমিয়ে পড়েছে কিনা নিমাই বুঝতে পারলে না। সে তার একটা বাহুর উর্দ্ধভাগ দিয়ে চোখ ঢেকে আছে। সেমিজটা একটু ফাঁক হ'য়ে আছে বলে দেখা যায় তার বুকের মাঝখানে হারটা একান্ত ভাবে লুটিয়ে পড়ে চিক্ চিক্ করছে।···হঠাৎ একটা কাঠবিড়ালি বন্ধুকে জড় পদার্থ মনে করে নির্ভয়ে তার বুকের মধ্যে চড়ে বসতেই, "হেই—" বলে ধেড়েমেড়ে উঠে বসল বন্ধু:

"আ—গেল রে, আস্পদ্দা দেখ—" বসু আশ্চর্য্য হ'য়ে গেল জন্তুটার অসীম সাহসিকতায়! কাঠবিড়ালিটা তাড়া খেয়ে পুচ্ছোৎক্ষেপ সহকারে চির্‌ক্‌ চির্‌ক্‌ চির্‌ক শব্দ করতে এমন ভাবে গেল, যেন সে বসুকে বলে গেল—"যা যা যা, এটা তোদের জায়গা নয়; আমাদের রাজত্ব এটা, আমরা থোরাই কেয়ার করি তোদের—"

কাঠবিড়ালিটা কিছুদূর গিয়ে একটা বকুল ফল দু'হাত দিয়ে ধরে কাটতে লাগল—কাট্‌ কাট্‌ কাট্‌। সেটা ফুরিয়ে যেতেই তার দু' হাত দিয়ে মাটি আঁচড়ে পিঁচড়ে আবার কি একটা বা'র করলে; সেটাকে শেষ করে দু' হাত দিয়ে বার কয়েক মুখ চুল্‌কে লাফাতে লফাতে বেল গাছটায় উঠে গেল।

"নিমুদা, একটা গান গাওনা; বেশ লাগছে, সুন্দর—" বসু অনুরোধ করলে নিমাইকে গান গাইতে।

নিমাই অন্যমনস্কভাবে তাকিয়ে ছিল—পূবদিকে মাঠের মাঝখানে কৃষকরা রবি শস্য তুলছে; নিঃশব্দে ছিন্ন মলিন বসনের মধ্যে কালো চামড়ার মানুষগুলো চলাচল করছে—কারুর মাথায় ছোলা গাছের বোঝা, কেউ ঝুঁকে কমর বেঁকিয়ে মটর গাছের বোঝা বাঁধছে; অরহর গাছের বোঝা-মাথায় লোকগুলো চলে গিয়েছে প্রায় তাদের ঘরের কাছাকাছি।

নিমাইয়ের কাণে বসুর অনুরোধ পৌঁছেছিল; সে মুখ না ফিরিয়ে বা কোনো কথা না বোলে আপন মনে একখানা গান গাইলে।

নিমাই যে-গান গাইলে, তার মর্ম্মকথা হ'চ্ছে অন্তর যাকে পেতে চায় আপন করে, সে কাছে থেকেও বুঝতে পারে না কেনো অন্তরের ভাষা, ব্যথা?

"ও—কি গান হোলো, তাই শুনি একবার?" গানের অর্থ বন্ধু বুঝতে পেরে মুখ টিপে হাঁসতে হাঁসতে চাইলে।

"আমার প্রাণ যে গান গাইতে বোললে—" উদাস ভাবে উত্তর দিলে নিমাই; পরে মুখ ফিরিয়ে শান্ত দৃষ্টিতে বন্ধুর দিকে একবার তাকালে; একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে,—"এবার তুমি একটা গাও; তোমার প্রাণ যে-গান গাইতে বলে, সেই-গান—"

বন্ধু নিঃশব্দ হাসি মুখে নিয়ে গা আড়ামোড়া ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে বলল,—"নাঃ, আমি গান সব ভুলে গিয়েছি—" বলে আবার শুয়ে পড়ল।

নিমাই আর দ্বিতীয় বার অনুরোধ করলে না। সে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে নীচেয়—ঘাসের বনে! দেখল, নানা রঙ বে-রঙের ও আকারের অসংখ্য পোকামাকড় ঘুরে বেড়াচ্ছে।···একটা পোকা দেখে সে আশ্চর্য্য হ'য় গেল;—যেটা দেখতে আকারে কাছিমের মতো, যদিও নিতান্তই ছোট। তার উপরকার খোলাটা হল্‌দে, তার মাঝে কালো কালো ফোঁটা, নিম্নাংশ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, মুখটা নীলাভ। নিমাই ভাবল,—একে এত সুন্দর করে সৃষ্টি করবার সার্থকতা কি? তার হাতে যে-ঘাসের শিষটা ছিল, সেটা মাটীতে ঠেকাতেই পোকাটা উঠল তার 'পর। নিমাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আশ্চর্য্য

হ'য়ে দেখতে লাগল পোকাটাকে। চোখের খুব কাছে যেই নিয়ে এসেছে, অমনি পোকাটা ভোঁ শব্দ করে উড়ে গেল। নিমাই অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করল,—'ও বাবা! ওর মধ্যে আবার পাখাও ছিল?' সে ঠোঁট ফাঁক করে সাশ্চর্য্যে চেয়ে রইল সেই দিকে, যেদিকে পোকাটা উড়ে গেল।... আবার, সে যেই ডান দিকে ফিরেছে—দেখতে পেলে একটা উচ্চিংড়ের-গর্ত্তো-পোকা প্রায় সমজাতীয় একটা পোকা শিকার করে নিয়ে সগর্ব্বে তথা সশব্যস্তে নিজের গুহাভিমুখে চলেছে। মজার কথা যে শিকারটা তারপক্ষে কিছু মাত্রায় ভারবোধ হওয়ায় কিছুদূর ঘাড়ে করে নিয়ে যায় আবার সেটাকে নামিয়ে রেখে এগিয়ে গিয়ে দেখে আসে—তার আবসস্থানের পথে ঠিক ভাবে যাচ্ছে না পথ ভুল করেছে। হাত পনের দূরত্ব এই ভাবে তিন চার বার করে অবশেষে স্তম্ভের দেওয়াল গোড়ায়—যেখানে তার বাসা—সেইখানে গিয়ে হাজির হল। গুহাদ্বার যথেষ্ট প্রশস্ত নয় বলে শিকারটি নামিয়ে মুখ দিয়ে কামড়ে ধরে পিছু হাঁটতে হাঁটতে গুহান্তরালে তিনি অর্ন্তধ্যান হলেন!

নিমাই ভাবল,—দিনান্তে এই নির্জ্জন মাঠের মধ্যে বাগানটিতে বসে স্তব্ধ প্রকৃতির প্রাঞ্জল মূর্ত্তি প্রশান্ত দৃষ্টিতে অবলোকন করলে সম্মোহিত হয়ে পড়তে হয় যেন! তখন কেবলই বলতে প্রাণ চায়;—কি সুন্দর এই প্রকৃতি! সেই সময় সৃষ্টির গূঢ় রহস্যও স্বতই যেন হৃদয়ঙ্গম হয়! নিঃশ্বাস বন্ধ করে কাণ পেতে থাকলে

পাছের ভাষাও যেন বুঝতে পারা যায়। রুদ্ধ-দ্বার-কক্ষে কুণ্ডলীয়-মান ধূম যেমন নির্গমনের জন্য পথ খুঁজে বেড়ায়, তেমনি আকাশে বাতাসে ধরণী বক্ষে একটা অব্যক্ত ভাব ভাষা খুঁজে বেড়াচ্ছে যেন! কি যেন বলতে চায়! যেন বলে,—দেখ; দেখ ওই অসংখ্য পোকা-মাকড়। দেখে বোঝবার চেস্টা কর এই অলীক কাহিনীর সার কথা। ওদের দেখে পরিচিত হ' জীব জগতের সঙ্গে!····
তখন নিবিষ্ট মনে পোকামাকড়গুলোর কার্য্যকলাপ ও চলাচল দেখলে এবং মানুষের সব কিছুর সঙ্গে তুলনা করলে উভয় জাতির মধ্যে এক রতিও পার্থক্য দেখা যায় না। একস্থানে এক কণা শস্য নিয়ে কতকগুলো পোকা পরস্পরের সঙ্গে কামড়াকামড়ি করছে; আবার অন্য স্থানে আহারান্বেষণে কতকগুলো পোকা ঘাসের উপর উঠছে নামছে, কোনো কোনো স্থানে আবার দুটো পোকা মিলে বংশবৃদ্ধির মহৎ কার্য্যে ব্যস্ত। এদের, প্রত্যেকের স্বর আলাদা বেশ স্পষ্ট বোঝা যায়—চিঁ, ক্রি, ক্রিক্, চির্‌ক্···

ওই যে ছোট পোকাটা, নিমাই ভাবল, যেটা একটা লম্বা থলেতে কিছু ভর্ত্তি করে দু'-মুখ মুঠি বাঁধলে যেমন দেখায়—সেই রকম দেখতে, ওটার নাম কি?···ওটা ঝুরি পোকা কি মুড়ি পোকা, কি টুরি পোকা তা মানুষ কি করে জানবে! যদি এই তিন নামের একটা নামে পোকাটার নাম-করণ করা যায়, তবে সেটা কোন্ যুক্তির বলে সমর্থিত হ'বে? আর মানুষ ওদের নাম-করণ করবার কে? ওদের চেয়ে মানুষ-যে অধম জাত নয়,

ভাই-বা কে বোলবে ? এ জগতে জীব হ'য়ে সকলেই জন্মেছে,—মৃত্যু হ'লেই তবে মুক্তি। তাই, এই ক্ষণজীবী পোকাগুলোই হয় তো মানুষের চেয়ে পুণ্যবান। কেননা, ওদের পায়ের চাপে কোনো জীব হত্যা হয় না। কিন্তু উন্মত্ত মানুষ দর্পভরে ধরণীর বক্ষ মারিয়ে অন্ধবৎ কত শত সহস্র জীবের প্রাণনাশ করে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে।....যে-জীবগুলি মানুষের পায়ের চাপে মরে গেল, তারা পেল মুক্তি; আর মূঢ় মানুষ জীবহত্যা-জনিত-পাপের বোঝা মাথায় করে দীর্ঘ-জীবন নিয়ে পৃথিবীর জ্বালা-যন্ত্রণা ভোগ করতে থাকে।....

"কি গো সন্নোসী ঠাকুর বাড়ী টারী যাওয়া হ'বে, না রাতটা এই বাগানেই কাটাবে বলে ঠিক করেছো—" নিমাইয়ের তন্ময়তা দেখে বসু উঠে বসে মুখ টিপে টিপে হাঁসছিল; এতক্ষণ পরে কথাগুলো বললে।

"বাড়ী আর কবে পেলাম বসু; চিরদিনই বাড়ী-হারা, ছন্নছারা—" একটা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে নিমাই বললে; বলে শিশুর মতো সরল দৃষ্টিতে সে চেয়ে রইল বসুর প্রতি।

"বুঝেছি; এখন উঠে পড়ো দেখি—" সহাস্যে কথাগুলো বলতে বলতে উঠে পড়ল বসু; উঠে গায়ের কুটো-কাটাগুলো ঝেড়ে আঁচলখানা গায়ে জড়ালে।

বাগানের পশ্চিম প্রান্তে রামদহিন্ তখনও খোন্তার সাহায্যে ঘাস তুলছে। ঘোড়াটা চড়ছে তার পাশেই; বাহকহীন একাটা জড় পদার্থের ধর্ম্ম প্রচার করছে যেন!

সন্ধ্যার শান্ত ছায়া ধীরে ধীরে নেমে, একটা ঝিল্লীর ঘুমপারানিয়া গানে বাগানের গাছ পালাগুলোকে যেন তন্দ্রাভিভূত করে তুলল। তেঁতুল গাছটা অনেকক্ষণ আগেই ঘুমিয়ে পড়েছে। কিছুদূরে—রেল লাইনের উত্তর পাশে—বাঁশ বাগানটায় শালিক, কাক, ময়না শালিকি প্রভৃতির কলরবে মুখরিত।···ওদিকের ইঁটের পাঁজা থেকে নিঃশব্দে পুঞ্জীভূত ধূম নির্গত হ'য়ে ধূসর সন্ধ্যাকে ধূম্রজালের আবরণে আবরিত করছে।···পূবদিকে তাল গাছগুলোর মাথার 'পর বসে পূর্ণচন্দ্রখানা হাঁসছে ম্লান হাঁসি।···

এক্কার উপর বসে নিমাই উঠে বসতেই ধীরে ধীরে বেড়িয়ে গেল;—খট্ খট্ খট্, ক্যাঁচ ক্যাঁচ কাঁচ—

—সাতাশ—

প্রায় এক বৎসর গত হয়ে গিয়েছে। চয়নের শত অনুরোধ সত্ত্বেও নিমাই এই প্রবাসে চোখ কাণ বুজে বসে আছে, তার সঙ্গে দেখা করবার নামও করে না। চিঠির পর চিঠি আসে যায়; তাতে নিমাই দেখায় কাজ থেকে অবসর না পাওয়ার অজুহাত। অথচ ইচ্ছা করলে সে ছুটী নিতে পারে যতদিনের ইচ্ছা ততদিনের। কিন্তু তা' সে করতে পারে না; না পারার ওই একটী মাত্র কারণ

হ'চ্ছে, বসুকে যেদিন থেকে সে কাছে পেয়েছে, সে ভুলে গিয়েছে সেইদিন থেকে যে,—জগতে বিয়ে বলে কোনো জিনিষের অস্তিত্ব আছে।…তার প্রাণ মন চায় তাকে, যাকে সে প্রথম দেখে সকলের অগোচরে বুক-ভরে ভালোবেসেছে, সে ছাড়া তার বুক মরুভূমি। তাতে শত-সহস্র কলসী জল ঢাললেও তার অনন্ত পিপাসা মিটবে না। মূহুর্ত্তের জন্য যদি সে অন্যের প্রতি মন নিয়ে যায়, তবে তখনই তার অন্তরে যে ভালোবাসার ভ্রমর ঘুমিয়ে আছে, জেগে ওঠে স-গুঞ্জরণে। উঠে তাকে আত্মহারা করে দেয় ভুলিয়ে দেয় তাকে সব কিছুকে। না ; এ-হৃদয় আর কাউকে সে দিতে পারে না। দিলে, মনুষ্য-দেহের প্রয়োজন মিটতে পারে হয় তো, কিন্তু তাতে প্রেমের অমর্য্যাদা করা হবে। সত্যকে প্রতারণা করা হ'বে। এরূপ অমানুষিক কাজ সে করতে পারে না। সে জানে বসুকে পাবার সকল আশা বাতাসে বিলীন হ'য়ে গিয়েছে ; বসুর সিঁথির সিঁদুর তাকে করে দিয়েছে সর্ব্বহারা। সে হৃত-সর্ব্বস্ব, তবু সে বসে থাকবে জীবনের শেষ মূহুর্ত্ত পর্য্যন্ত বসুর মুখপানে চেয়ে।

অন্যপক্ষে, বসুমতী তার নিরুদ্দিষ্ট স্বামীর জন্য খোঁজ খবর করা তো দূরের কথা, একটা দিনও তার নাম করেনি নিমাইয়ের সামনে। সে ঠাট্টার ছলেও নিমাইকে বিয়ে করতে বলে না কেন, তা' সেই জানে। অথচ দু' জনেই আপন আপন সাথীহারা হ'য়ে সামঞ্জস্য রেখে সংসার পেতে শান্তিতে বাস করছে। এরা এখন দুজনকে

তুজনে এমন ভালবাসে, যেন ভালবাসার মধ্যে শুধু ভালোবাসা ছাড়া আর কিছু থাকতে পারে, এ চিন্তা ওদের মগজে আসেই না। শুধু 'ভালোবাসার খাতিরেই ভালোবাসে। যেন তুজনেই সবল, সমশক্তি সম্পন্ন। কেউ কাউকে টেনে কাছে আনতে পার না ;— এনে বুকের মধ্যে চেপে ধরে ক্ষণিক সুখানুভূতিকে ততটা বড় করে দেখতে চায় না, যতটা দেখে পরস্পর পরস্পরের প্রতি গভীর প্রেম থাকা সত্ত্বেও দূরে দূরে থেকে প্রেমের পবিত্রতা বজায় রাখাকে, প্রেমকে নিঃস্বার্থ ভাবে দেখাকে।...একজন তার শক্তির প্রাবল্যে অপরের তুর্ব্বলতাকে চোখের সামনে তুলে ধরে তুর্ব্বলকে লজ্জিত করাকে তারা আন্তরিক ঘৃণা করে যেন।....

সেদিন তুপুর বেলায় নিমাই তার ঘরে বসে চয়নের একখানা চিঠির জবাব কি দেবে তাই চিন্তা করতে লাগল। চিঠি খানার জবাব দেওয়া একটু কঠিন বলেই মনে হ'ল তার। কেননা, অপরাপর চিঠিতে চয়নের অভিমানের পরিমানই বেশী থাকে ; কিন্তু এ-চিঠিখানায় অভিমান তুঃখ এসব তো আছেই, উপরন্তু রাগের মাত্রা যেন বেশী। সে যেন নিমাইয়ের কাছ থেকে একটা খোলা জবাব চায়। যেন সে ভেবে নিয়েছে যে, নিমাই তাকে নিয়ে পুতুল খেলা করছে।...কিন্তু চয়নকে চটাতে চায় না নিমাই মনে প্রাণে ; তার প্রাণে আঘাত দিতেও নিমাইয়ের হৃদয় দ্রবীভূত হ'য়ে আসে। সে কলমটা ঠোঁটে চেপে ধরে চেয়ে রইল খোলা জানালা দিয়ে দক্ষিণ দিকের দিগন্ত বিস্তৃত মাঠটার দিকে।

মাঠটায় রৌদ্রের প্লাবন বয়ে যাচ্ছে যেন; ধরণীর বক্ষ ফুরে বেরুচ্ছে একটা বর্ণ-হীন জিনিষ—লিক্ লিক্ লিক্ করে। নীলাকাশের কোল ঘেঁসে অগুনতি শকুন ভেসে বেড়াচ্ছে পাখা মেলে। দূরে—পশ্চিমদিকের বট গাছটার শীর্ষে একটা চিল বসে অবিরাম চীৎকার করছে—চি-হি-রি-রি রি।···পশ্চিমদিকের জানালাটা দিয়ে হু হু করে বাতাস ঢুকে আগামী শীতের বার্ত্তা জানিয়ে দিচ্ছে।

নিমাই আর চিন্তা না করেই কলম দু'তিন কালিতেই চিঠির জবাব শেষ করে লেফাফায় পুরে ফেললে। জামার পকেট থেকে একটা সিগারেট এনে ধরালে; ধরিয়ে টানতে লাগল অর্দ্ধশায়িত ভাবে বিছানায় শুয়ে।

বসু কি করতে এসে ঢুকল নিমাইয়ের ঘরে। ঢুকে নিমাইকে সিগারেট টানতে দেখে সরোষে মুখখানা ঘুরিয়ে নিয়ে বার কয়েক ফোঁস্ ফোঁস শব্দ করলে। সে রেগে গস্ গস্ করতে করতে সারা ঘরটায় অস্বস্তিকর ভাবে ঘুরপাক খেতে লাগল। পরে বড় টেবিলটার সামনে দাঁড়িয়ে কি একটা ঘাঁটতে লাগল। বার কয়েক নিমাইকে অপাঙ্গে দেখে নিয়ে মুখটা বিকৃতি করে শ্লেষভরে বললে,—"আবার সিগরেট খাওয়া ধরা হ'য়েছে কবে থেকে—" বলে নাক মুখ ঘৃণায় কুঞ্চিত করে আগের মতো দাঁড়িয়ে রইল।

"কেন, খেলামই বা—" নিমাই মৃদু হাঁসি হেঁসে জবাব দিলে,—

"আমার তো এমন কেউ নেই, যে-নাকি নাকের কাছে নাক নিয়ে এলে পরে গন্ধ পাবে—"

"আহা, ধাঁচা দেখলে বাঁচি না—" কট মট করে নিমাইকে একবার দেখে নিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে বললে বস্থ,—"বুকের চুলগুলো না থাকলে হাড় পাঁজড়া ক'খানা একটা একটা করে গোণা যেতো, তার উপুর আবার সিগরেটের ধোঁয়া গিলছে—" বলে আবার বার দুই ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দ করলে; যেন তার নাকের ভেতর সিগরেটের ধোঁয়া ঢুকেছে।

"না, না—আমি ধোঁয়া গিলছি না—" বস্থর রাগত ভাব দেখে নিমাই ভরকে গিয়ে আশ্বস্ত করলে তাকে,—" টেনে টেনে ফেলে দিচ্ছি ধোঁয়াগুলো—"

"তাই-বা ও বাহাদুরী দেখবে কে—" বলে নিমাইয়ের দিকে একবার চকিতে তাকিয়েই ঘার ফিরিয়ে নিলে।

"বস্থ।" বস্থ কতখানি রেগে গিয়েছে ধরতে না পেরে বেওকুবের মতো রসিকতা করলে নিমাই; করে দাঁত বা'র করে নিঃশব্দে হাসতে লাগল।

"বস্থ দস্তর মতো ঘেন্না করে—" সগর্জ্জনে জলদ কথাগুলো বস্থ বললে,— "এর পর থেকে যদি খেতে হয় ওই কাগজ দিয়ে ঘোড়ার গোবর পাকানো গ্যাঁজা মেজাগুলো, তবে বাইরে থেকে খেয়ে আসবে বোলে দিচ্ছি—" বলে বিনা প্রয়োজনে ত্রস্তপদে আলমারীটার দিকে গেল।

"না বসু—" বসু নিতান্তই রেগে গিয়েছে বুঝতে পেরে ভয় পেয়ে গেল বেচারা নিমাই ; তাই অসহায় ভাবে বললে,—"আমি সিগরেট খাইনা ; কাল একজন অফার করেছিলেন, ফিরিয়ে দিয়ে মনক্ষুণ্ণ করব ভদ্রলোকের, তাই হাত পেতে নিয়েছিলেন—" বলে বিছানা থেকে নেমে সিগারেটটা জানালা গলিয়ে ফেলে দিয়ে এল।

বসু এক টুক্‌রো হাঁসি আঁচল দিয়ে ঢাকা দিয়ে বললে,—আন্তরিক ধন্যবাদ দিয়ে ফিরিয়ে দিলে মনক্ষুণ্ণ করা হয় না—"

এবার থেকে তাই করবো ; কথাটা মুখে না বললেও, নিমাই যে-ভাবে সন্ত্রস্ত ভাবে বসুর দিকে একবার তাকাল—তাতেই ওই কথাগুলো ব্যক্ত হ'ল যেন। বিছানায় সামান্য ছাই পড়েছিল, এক টু'ক্‌রো কাগজ দিয়ে সেগুলোও ধীরে ধীরে তুলে নিয়ে ফেলে দিয়ে এলো। এসে বসুর দিকে পিছন করে পাশ বালিশটা বুকে টেনে নিয়ে শুয়ে পড়ল।

নিমাইয়ের অবস্থা দেখে বসুর প্রাণ করুণায় ভরে উঠেছিল। কিন্তু সে আর কনো কথা না বলে হাঁসতে হাঁসতে 'বিজয়িনী' বেশে ঘর থেকে বেড়িয়ে গেল।

এইখানে এসে মানুষকে দাঁড়িয়ে পড়তে হয়! শুধু তাই নয়; বন্ধ হ'য়ে যায় লাভ-ক্ষতির সমস্ত হিসাব নিকাশ!…মানুষের জীবনের প্রতিটি ঘটনার মধ্যে এমন একটী অর্থ নিহিত আছে, যা লক্ষ্য করলে এই জিনিষটাই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়—প্রত্যেক মানুষের গতিবিধি অদৃশ্যের অন্তরাল থেকে এমন এক অনমনীয় শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় যে, যার প্রমীতিতে শুধু বিস্ময়ে পাথর হ'য়ে যেতে হয়। আর এই ঘটনার পূর্ব্বাবস্থা কি ভাবে সৃষ্টি হয় সেটা যদি কেউ অনুধ্যান করে,—তবে সে বিস্ময়বিমূঢ় হ'য়ে এই কথাটাই ভাববে,—না পায়ের দৌড় কমিয়ে শুধু দেখে যাই; দেখা ছাড়া কিছু করবার হাত নেই মানুষের!

নিমাইও নিশ্চয়ই জানত না যে,—তার আজকের এই ট্রেণ ফেল করার মধ্যে এমন একটী ঘটনা তাকে দেখতে হ'বে, যা না-কি তার জীবন কাহিনীর একটা অধ্যায় বললেও অত্যুক্তি হ'বে না।

বি. এন. আর. লাইনের একটা বড় গোচের ষ্টেশনে তাকে ট্রেণ ধরতে হ'বে; সেই ট্রেণে আসানসোল গিয়ে পাটনা যেতে হ'বে। ষ্টেশন থেকে যখন সে এক মাইল দূরে, তখন ট্রেণ আসবার সিগ্ন্যাল পড়ল। নিমাইয়ের এক হাতে চামড়ার ব্যাগ অপর হাতে ছড়িটা নিয়ে দৌড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে যখন সে ষ্টেশনে এসে পৌঁছুল, তখন ট্রেণ এসে গিয়েছে প্লাটফর্ম্মে। ব্যস্ত সমস্ত

হ'য়ে কাউণ্টারে উঁকি মেরে দেখলে মাষ্টার মশাই টুপি মাথায় দিয়ে ঘর থেকে বেড়িয়ে পড়েছেন। বার কয়েক ডাকাডাকি করতেই, সরকারী-চাকুরী-গর্বিত টিকিট বাবু তাচ্ছিল্য ভাবে জানাল যে, তার টিকিট পাওয়ার আর কোনো আশা নেই; তা' ছাড়া পেলেও ওভার-ব্রিজ পাড় হ'তেই গাড়ী ছেড়ে দেবে। এই কথা শুনেই সে মাষ্টার বাবুর উদ্দেশ্যে ছুটল। গিয়ে তাঁকে জানালে যে, গার্ড সাহেবকে বলে বন্দোবস্ত করে দিতে—এই গাড়ীতে যাবার জন্য; নচেৎ তার যথেষ্ট ক্ষতি হ'বে। মাষ্টার বাবু নিমাইয়ের ব্যাকুলতা দেখে তার কথা মতো কাজ করলেন। নিমাই ছুটে গিয়ে ট্রেণে উঠতেই তার হাত থেকে ছরিগাছটা নীচেয় পড়ে গেল, যেতেই সে নেমে সেটাকে কুড়িয়ে নিলে; নেবার পর তার খেয়াল হ'ল—ব্যাগ! ব্যাগ কই? ভাবতেই তার স্মরণ হ'ল কাউণ্টারে টিকিট কিনতে গিয়ে তার ওপর রেখে তাড়াতাড়ি চলে এসেছে!—আর ওই ব্যাগে তার প্রায় সর্ব্বস্ব আছে বললেও অত্যুক্তি হয় না। ছুটল সে ব্যাগ আনতে। ভাগ্যক্রমে সে ব্যাগটা পেলেঃ সেটা ষ্টেশনের চা-ভ্যাণ্ডর অনুগ্রহ করে যত্ন নিয়েছিলেন।···ব্যাগ নিয়ে পিছু ফিরতেই দেখলে ট্রেণ তখন চলতে সুরু করেছে। প্লাটফর্ম্মে যখন এলো, ট্রেণ তখন ডিস্‌ট্যাণ্ট সিগ্‌ন্যালের কাছে চলে গিয়েছে। হাঁ-কোরে চেয়ে রইল সেইদিকে।····সিগ্‌ন্যালটা আপ্ হয়ে যেতেই লাল আলোটা জ্বল্ জ্বল্ করে উঠল। তখন সন্ধ্যা হ'য়ে গিয়েছে কিনা।

প্লাটফর্ম্মের এক নির্জ্জন স্থানে কতকগুলো পাটের বাণ্ডিল, লাগেজ স্তূপাকার করা ছিল, সেইখানে গিয়ে নিমাই বসল। তার কোলের মধ্যে ব্যাগ, আর ছরিগাছটা তার উপর রেখে একটা পাটের বাণ্ডিলে হেলান দিয়ে মুদ্রিত নয়নে উর্দ্ধমুখে পরবর্ত্তী ট্রেণের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। আড়াই ঘণ্টা পরে ট্রেণ।

বাহুক্ষণ অতীত হ'য়ে গিয়েছে।

হঠাৎ···নিমাইয়ের কাণে একটা পুরুষ ও নারীর কথোপকথনের শব্দ পৌঁছুতেই সে শুধু চোখ দুটো খুলে আগের মতোই পড়ে রইল। যাঁরা কথা বলছেন, তারা নিমাইয়ের একেবার পিছুতেও না আবার এক পাশেও না—কোণকোণি ভাবে দাঁড়িয়েই কথা বলছে; তারা যে-সমস্ত বিষয়ে আলোচনা করতে লাগল, তাতে নিমাইয়ের সন্দেহ রইল না যে, 'তারা স্বামী-স্ত্রী। যে-ধারায় তারা কথাবার্ত্তা চালাচ্ছে, সে কথাবার্ত্তা কিছুতেই চালাত না, যদি তারা জানতে পারত যে, তাদের কাছে-পিঠে বাইরের তৃতীয় ব্যক্তি আছে। নিগাই ভয়নক অস্বস্তিকর আবহাওয়ার মধ্যে পড়ে গেল; কেন না, অপরের কথাবার্ত্তায় আড়িপাতার অপরাধে নিজেকে সে অপরাধী মনে করল। কিন্তু তখন উঠে অন্যত্র যেতেও পারে না; কারণ উঠলেই তারা জানতে পারবে যে, তাদের আগেকার কথাবার্ত্তা তৃতীয় ব্যক্তি শুনে নিয়েছে। সে মহামুস্‌কিলেই পড়ে গেল। বসে রইল সে জড়সর হ'য়ে। পাটের একটা মস্ত বড় গাঁটে তাকে আড়াল করে রেখেছে। কিন্তু একটু ঘাড়টা ঝুঁকিয়ে

পাশ ফেরালে লোক দুটিকে দেখা যায় নিমাই তার অজ্ঞাতসারেই একবার ঘাড় ফিরিয়ে চোখ মুখ রগ কুঞ্চিত করে ভাবতে লাগল ভদ্রলোকটিকে যেন সে ইতিপূর্ব্বে দেখেছে। কিন্তু কোথায় তা' তার স্মৃতি পাতি পাতি করে খুঁজেও ঠিক করে উঠতে পারল না।...

ভদ্রলোকটির স্ত্রীই বেশী কথা বলছে। মহিলাটি নিমাইয়ের দিকে পিছু ফিরে থাকয় তাঁর মুখ দেখতে পেল না সে, কিন্তু ভদ্রলোটির মুখ স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়; কেননা, ওদিকের কেরসিনের বাতির স্বল্পালোক এসে তাঁর মুখে পড়েছে। তাঁরা মুখোমুখী হ'য়ে কথা বলছেন।

"চাকরীর কথা বলবো আর কোন মুখে ; তুমি সামনে গেলেই সকলে মুখ ফিরিয়ে নেয়, সেটা লক্ষ্য কোরেছো ?" মহিলাটি বললেন ঘৃণা ভরে।

"কেন, এরকম হবার মানে—" বলে ভদ্রলোকটি একটা শুক্‌নো ঢোঁক গিললেন।—তাঁর অত্যধিক ফর্সা মুখখানার উপর উঁচু কপাল, তার উপর ব্যাক ব্রাস চুল, চোখ দুটো কেঠেরাগত, গাল থুবড়ে গিয়েছে—এহেন মুখে যে-ভাবটা ফুটে উঠেছে তাতে যেন তিনি মহিলাটির কথার অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝতে পেরেও আপাতত না-বোঝবার ভাল করছেন।

"কেন ?...চিন্তা করে দেখো, 'কেনো'র উত্তর নিজেই খুঁজে পাবে—"

আরও কয়েকটা কি কথা হ'লো, নিমাই তা' শুনতে পেলে না :

কারণ, কথাগুলো হাওয়ায় অন্যদিকে উড়ে গেল। তবে, সে বুঝতে পারল ব্যাপারটা এমন অবস্থায় এসে পৌঁচেছে, যার জন্য মহিলাটি হ'য়ে পড়েছেন অত্যধিক উত্তেজিত।

"তুমি যাবে।...." মহিলাটি উত্তেজিত ভাবে বলতে লাগলেন,—"আজ না হয় কাল যেন তোমায় বাড়ীতে আর কেউ না দেখে-" এবং আরো কতকগুলো কড়া কড়া গালাগালির মতো কি বললেন তা' বাতাসের বেয়াদপির জন্য নিমাই শুনতে পেলে না।.. পরে শুনতে পেলে,—"আমি বাপ ভাইদের দাসী-বাঁদীগিরি কোরে এজীবনটা কাটিয়ে দিতে পারবো, তবু তোমার রক্তে সন্তান নিয়ে আমি সংসার করতে পারবো না। বাবা পাপ কোরলে সন্তানদের তার ফল ভোগ কোরতে হয়। তাই, সে-সন্তান আমার পাপের ভোগে তিল তিল কোরে মরবে, তা' আমি মা হোয়ে দেখতে পারবো না—"

নিমাই অস্থির হ'য়ে উঠল; উস্. খুস্ করে সে চেয়ে দেখল স্ত্রী-হস্তে অপমানিত ভদ্রলোকটি দাঁড়িয়ে আছেন পাথরের মূর্ত্তির মতো। তাঁর মুখটা যেন মসীলিপ্ত। মনের ভাবটাও পালাই পালাই।

"কিন্তু কোরলাম কি আমি—" ভদ্রলোকটির প্রাণহীন দেহটার মুখ থেকে কথা ক'টি বেরুল ক্ষীণভাবে।।

"কি কোরেছো ?...খুঁজে পেলে না এখনো ?...লোকে সজ্ঞানে পাপ কোরলে তা' মনের মধ্যে দগ্ দগ্ করে মরবার আগে

মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত। আর তুমি ভুলে গিয়েছো।··· মনুষ্যত্বহীন হোলে মানুষ যে-রকম হয়, তুমিও তো তাই—" বলে মহিলাটি সরোষে হাঁপাতে লাগলেন। তা' দেখে নিমাইয়ের মনে হোলো, তিনি নিশ্চয়ই উন্মাদ হ'য়ে গিয়েছেন; নইলে স্ত্রী হোয়ে স্বামীকে কেউ এরকম ভাষায় কথা বোলতে পারে না। তিনি তাঁর ব্লাউসের মধ্যে লুকোনো একখানা চিঠি ব'র কোরলেন, কোরে সেখানা এক হাতে নিয়ে কিছু তফাতে ধরে বললেন,—"এ হাতের লেখা চেন?"

"কই দেখি—" সাগ্রহে ভদ্রলোক হাত বড়ালেন।

"না; তোমার হাতে আমি দিতে পারবো না এচিঠি—" বলে খামে পুড়ে ফেললেন চিঠিখানা। পরে জিজ্ঞাসা কোরলেন,—"রেবতী দত্ত নামে কোনো মেয়েকে চেন?"

মহিলাটি যে-নাম উচ্চারণ কোরলেন, তা' শুনেই ভদ্রলোক এমন ভাবে চমকে উঠলেন, যেন তাঁর পিছুতে কে এক ঘা চাবুক বসিয়ে দিলে!

"চেনো নিশ্চয়ই; তা' তোমার মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে।···· তিনি মা'কে বাবা'কে আমাকে পিসিমা'কে প্রত্যেককে এক একখানা কোরে আলাদা চিঠি দিয়ে তোমার সমস্ত কীর্ত্তি জানিয়ে দিয়েছেন—" দৃঢ় ভাবে মহিলাটি বোললেন।

ভদ্রলোকের অবস্থা হ'য়ে গিয়েছে খুনী আসামীর মতো; মনে হয় যেন কাঁপছেন, ঘেমেও গিয়েছেন বোধ হয়। বির বির করে

কি উচ্চারণ করলেন তা' শুনতে পেলে না নিমাই ; তখন তার সমস্ত নীতিজ্ঞান ছুটে গিয়েছে ; উৎকর্ণ হ'য়ে সে শুনতে লাগল স্বামী-স্ত্রীর অশ্রুতপূর্ব্ব আলাপ! মহিলাটি কি বললেন, সেটা হাওয়াতে উড়িয়ে নিয়ে গেল।···নিমাই একটা কাণ টেনে ধরে কিছুটা বাড়িয়ে দিলে। কিন্তু এদিকে ট্রেণের সময় হ'য়ে গিয়েছে বলে প্লাটফর্ম্মে লোকজন আসতে সুরু করেছে ; তা' দেখে স্বামী-স্ত্রী কিছুদূরে সরে গেল—নিমাইয়ের কিন্তু সেদিকে খেয়াল নেই। সে কাণ টেনে ধরে তেমনি ভাবেই বসে রইল। দূর থেকে মহিলাটির দৃঢ় কণ্ঠের স্বর এসে ঢুকলো তার কাণে—

"গোপাল রায়ের মেয়ে, নাম বসুমতী রায় ; এবার বোধ হয় চিনতে পেরেছো—"

ওই কথা শুনেই নিমাই তরাক্ করে উঠে পড়লো। নীচে পড়ে গেল তার ব্যাগ আর ছড়িটা, সে ছুটো কুড়িয়ে নিয়ে খাড়া হোয়ে দাঁড়াতেই ট্রেণের সার্চ্চলাইট তার চোখ ধাঁধিয়ে দিলে। সগর্জ্জনে ট্রেণ এসে দাঁড়াল প্লাটফর্ম্মে। তখন লোকজনের ভীড়ের মাঝে অদৃশ্য হ'য়ে গেল স্বামী-স্ত্রীতে।···মহিলাটির মুখ থেকে 'বসুমতী রায়' নামটি শুনেই নিমাইয়ের স্মরণ হ'লো, ভদ্রলোকটিকে সে দেখেছে কোলকাতার সাদার্ণ এভিনিউ-এ বসুর সঙ্গে বেড়াতে।···সে ত্রস্তভাবে এদিক ওদিক খানিক ঘুরল, তাঁদের ভালো করে দেখে নেবার জন্য ; কিন্তু তার চোখে তাঁরা

আর পড়ল না। হতাশ হ'য়ে উঠে পড়ল সে ট্রেণে। উঠে উন্মুখ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল সে, জানালা দিয়ে মাথাটা গলিয়ে।

—উনত্রিশ—

শীতের অপরাহ্ন বেলা। চারটে বেজে গিয়েছে তখন। নিমাই বিছানায় শুয়ে আছে—পা থেকে গলা পর্য্যন্ত লেপমুড়ি দিয়ে; মুখটা একখানা বই দিয়ে ঢাকা, ঘুমুচ্ছে কি না, তা বোঝা যায় না।

বসু এসে ঘরে ঢুকলো। তার হাতে একখানা বড় চিরুনী, একটা ছোট্ট শ্বেত পাথরের বাটিতে তেল, চুল বাঁধবার ছুটে প্রভৃতি। আর অন্য হাতটা দিয়ে তার রাশিকৃত এলো চুলগুলো ঘাড়টা একটু কাত করে চিড়ছে। সে ঘরে ঢুকে দাঁড়িয়ে নিমাইয়ের দিকে একবার তাকাল, ভেবে নিলে যে নিমাই ঘুমুচ্ছে। ধীরে ধীরে গেল বড় আয়নাখানার সামনে। টেবিলটার উপর রাখল চুল বাঁধবার সরঞ্জাম।···আয়নার সামনে গেলে সকলেই যা' করে, সেও তাই করল—অর্থাৎ দাঁত জিভ্ প্রভৃতি দেখে নিলে। গায়ে আঁচলটা জড়ান ছিল, সেটাকে পিঠের দিক থেকে তুলে

গলায়-কাপড়-দেবার-মতো-করে তার বুকটা ঢাকলে। তারপরে সে বাটী থেকে তেল নিয়ে চুলগুলোয় মাখাতে লাগল—সেগুলো সামনের দিকে এনে। তেল মাখানো শেষ হ'য়ে গেলে আঁচড়াতে সুরু করলে চুলগুলো। আঁচড়াবার সময় চুলের গোড়ায় যখন টান লাগছে, তখন মুহূর্ত্তের জন্য চোখ মুখ কুঞ্চিত করছে ব্যথা-ভরে। মাঝে মাঝে আঁচড়ানো চুলগুলো বুকের মধ্যে ফেলে, চিরুনী থেকে ছিন্ন কুন্তলগুলি খুলে নিয়ে টেবিলের উপর রাখছে।···· তারপরে ছুটে দিয়ে চুলের গোড়া বাঁধতে লাগল। ছুটের এক প্রান্তর সে দাঁত দিয়ে চেপে ধরে আছে, মুখখানা ঈষৎ বাঁ দিকে বঁকান, চোখ দুটো কিন্তু ঠিক আয়নার 'পর নিবদ্ধ।

সত্যই····কেশ-প্রসাধনে-রত আপন-ভোলা নারীর অপরূপ মূর্ত্তি অবলোকন করলে নয়ন মুগ্ধ হ'য়ে যায়!···দেখা যাচ্ছে, বন্ধুর অনাবৃত অবন্ধুর পৃষ্ঠদেশে দু'টি তিল উজ্জ্বল উপগ্রহের মতো জ্বল্ জ্বল্ করছে!···তার যৌবনশ্রী-মণ্ডিত পয়োধরের পার্শ্বদেশ দেখলে মনে হয়, যেন যুগ-যুগান্তের উদয়াস্তারুণের আরক্তিমাভ বিন্দু বিন্দু ভাবে সঞ্চারিত হ'য়ে এক অবর্ণনীয় সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করেছে!···হাত দুটি ঊর্দ্ধে অত্যধিক প্রসারিত করার জন্য মাঝে মাঝে চ্যুত হ'য়ে যাচ্ছে তার স্তনাগ্রচূড়ার অবরণ;····শরতের ভাসমান মেঘখণ্ডের মধ্য দিয়ে যেমন পূর্ণচন্দ্র উঁকি ঝুঁকি মারে, এও দেখাচ্ছে ঠিক সেই রকম।····তার বুকে হারগাছটা এমন ভাবে লুটিয়ে আছে, যেন শত সহস্র বৎসরের সাধানার ফলে ও

পেয়েছে ওইস্থান। বসুর কৃশ-কটি থেকে উর্দ্ধোদরের মাংসস্তরগুলি যেন স্বচ্ছ শান্ত সরোবরে মৃদুমন্দ সমীরণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ বইছে !·······

দূরে—বহু দূরে, বিহারী-কৃষক-পল্লীর ওধারে সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে,—দেখলে মনে হ'বে ঈষন্নীলিমাযুক্ত পীতাভ-পটভূমিকার নীচে কে যেন আগুন গুলে ঢেলে দিয়েছে! 'সেই গলিত সুবর্ণাভ পশ্চিম দিকের জানালা দিয়ে এসে বসুর সর্ব্বাঙ্গে পড়েছে লুটিয়ে। পড়ে তাকে ক'রে তুলেছে—হর্ম্মণ্য-দেশীয় শ্রেষ্ঠ শিল্পীর হাতে-গড়া প্রবালের এক নারী মূর্ত্তি !····পরনের দেশী তাঁতের শাড়ীর ভিতর দিয়ে বসুর নিম্নাঙ্গের যে-রূপ ফুটে বেরুচ্ছে তা' দেখলে মনে হ'বে, যেন একটা তাপোজ্জ্বল লৌহ-গোলাকে নীল বসন দিয়ে ঢাকার জন্য চারদিক দিয়ে ফিন্‌কুটি ছুটছে !····

বসুর চুল বাঁধা শেষ হ'য়ে গেলে চেয়ারের হাতল থেকে তোয়ালেখানা নিয়ে মুখ ঘাড় কাণের গোড়াগুলো মুছলে। তারপর কপালে ছোট্ট একটী টিপ, সিঁথিতে সিঁদুর, হাতের লোহায় সিন্দুর মাখালো। পরে দু' পাশের বাহুমূল পর পর ঈষৎ কাত করে কাপড়খানা ফেলে দিলে পিঠের 'পরে।···

···ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বসু দেখতে লাগল তার চেহারাখানা আয়নার মধ্য দিয়ে। অজ্ঞাতসারে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল তার। সে-দীর্ঘনিঃশ্বাসের অর্থ মনস্তত্ত্ব পাঠশালার শিশু পোড়ো যে, সেও বুঝতে পারে।····ওরকম হয়। নারীর দেহে যখন রূপ যৌবনের

বন্যা আসে, তখন প্রাণতমের প্রদপ্রান্তে নিজেকে উৎসর্গ করে, তার শ্রী-সাধনার সার্থকতা খোঁজে। পুরুষ বুকভরা স্বাস্থ্য যখন পায়, তখন প্রিয়জনদের দেখিয়ে তার শরীর চর্চ্চার শ্রম সফল হ'ল বলে মনে করে!···নচেৎ সব বৃথা।—মানুষ সব কিছুর সার্থকতা খোঁজে! আশ্চর্য্য, মানুষের এই সার্থকতা-বোধ! সে যখন গান গায়, তখন চায় যে—তার পাশে কোনো একান্ত আপন-জন বসে শুনুক।···একখানা বই পড়লে যতক্ষণ না তার কথা অপরজনকে বলবে, ততক্ষণ তা' সার্থক হ'বে না!···

নিমাই ঘুমোয়নি। দিনে সে ঘুমোয় না কখনও, এ কথাটা বসু জেনেও আজ ভুলে গিয়েছিল বোধ হয়। নইলে সে কখনই এ ঘরে চুল বাঁধতে আসত না। না আসলে একটু আগে যে-সুন্দর জিনিষ চোখ ভরে দেখেছে, তা সে দেখতে পেত না।

বসু এতক্ষণ চেয়ারে বসে আলতা পরছিল পায়ে। তা' দেখে নিমাই ভাবল,—বাঙ্গালী হিন্দু ঘরের এয়োদের জন্য এই আলতা-সিন্দুর কোন্ ঋষি কত দিনের সাধনার ফলে আবিষ্কার করেছিল?

শেষ হোতেই বসু উঠে দাঁড়াল। ঘর থেকে বেড়িয়ে যাবার জন্য পিছু ফিরতেই তার চোখ গিয়ে পড়ল নিমাইয়ের 'পর। সে জেগে আছে দেখে আঁচলখানা দিয়ে ঠোঁট দুটো ঢেকে, কিছুক্ষণ চেয়ে রইল এক দৃষ্টে নিমাইয়ের দিকে।

"জেগে ছিলে—?" দৃঢ় কণ্ঠে বসু জিজ্ঞেস করলে।

"হ্যাঁ—" ভয়ে ভয়ে উত্তর দিলে নিমাই।

"দেখছিলে বুঝি—"

নিমাই সত্যি কথা বলবে, না অস্বীকার করবে তাই ভাবতে লাগল।

"লোভ সামালানো যায় না, নয়—?" বলে নিমাইয়ের প্রতি কটাক্ষপাত করে ঝটিতে ঘর থেকে বেড়িয়ে গেল বসু।

অসৎ কর্ম্মে রত বালককে অভিভাবক যেমন শাসন করে, সেই রকম বসু তার চোখের ভাষা দিয়ে নিমাইকে কড়া শাসন করে গেল যেন।

আশ্চর্য্য এই নারী জাত! নিমাই ভাবল,—এদের চোখের এক কোণে ধ্বংসের প্রলয়-নাচন, অন্য কোণে পালনের অপরিমেয় ক্ষমা! স্রষ্টা এদের যে-শক্তি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, তা' যদি উপলব্ধি করতে পারে এরা!

"নিমু বাবু—" বাইরে থেকে ডেকে ঘরে ঢুকল বসু; তার এক হাতে ছোট দুটো রেকাবিতে ঘি-মাখানো চাল ভাজা, একটা লঙ্কা আর একটু হালুয়া, অন্য হাতে জলের গেলাস। ঘরে ঢুকেই, নিমাইকে তখনো শুয়ে থাকতে দেখে—আগে কি বলতে যাচ্ছিল তা' থামিয়ে বললে,—"আচ্ছা বলিহারি যাই ছেলে বাবা, এখনো কুঁড়েমি করে পোড়ে আছে—" খাবারের রেকাবি দুটো ছোটো গোল টেবিলটার 'পর রাখতে রাখতে বললে বসু,—"সত্যি তোমাকে যদি বউ-ছেলে নিয়ে ঘর কোরতে হোতো তবে কি কোরতে বল দেখি—" বলে মুখ টিপে টিপে হাসতে লাগল বসু।

"কেনো—" উঠে বসে গা থেকে লেপটা সরাতে সরাতে চাপা হাঁসিটা গালের এক পাশে কোনো রকমে রেখে বোললে নিমাই,—"ছেলে না থাক মেয়ে আছে, মেয়ের মা আছে, সবই তো আছে—"

বস্তু চিন্তা না করে কথা বলে ঠকে গেল। সে মুখ টিপে হাঁসতে হাসতে বললে,—''তা' বটে; যেমন জগতে সব কিছু আছে, কিন্তু ভিতরে যাবার যার শক্তি আছে, সে গিয়ে দেখে কিচ্ছু নেই, সেই রকম আর কি—"

নিমাই বাইরে থেকে মুখ ধুয়ে এলো। এসে টেবিলের পূব দিকের চেয়ারটায় বসে জলযোগ করতে লাগল। বস্তু দাঁত দিয়ে একটা মুড়ির মতো চাল ভাজা কুট্ কুট্ করে কাটতে কাটতে অন্যামনস্ক ভাবে বাইরের দিকে চেয়ে আছে। ইতিমধ্যে নিমাই ভুলে গোটা লঙ্কাটা চিবিয়ে ফেলেছে; ফেলে চোখের জলে নাকের জলে হয় ঢক্ ঢক্ করে তার জল গেলাসটা শেষ করে ফেললে। কিন্তু তাতে তার মুখের ঝাল গেল না বলে বস্তুর জল গেলাসটা নিয়েই চুমুক দিতে স্থুরু করে দিলে—

"এই, এই, এই—আমার এঁটো—" চমকে বস্তু বোলে উঠল।

নিমাই তখন জল গেলাসটা নিঃশেষ করে ফেলেছে; ফেলে গেলাসটা টেবিলে রেখে জল-ভরা চোখ বিস্ফারিত করে বস্তুর দিকে তাকিয়ে উচ্চারণ করলে,—"হুঃ—বাব্বাঃ—"

'খেলে তো? খেলে আমার এঁটো?" চাপা হাসি মুখে রেখে বসু বললে।

নিমাই অবশ্য জানতো না যে, বসু জল গেলাসটা এঁটো করেছে; জানলে খেতো কি-না সেই জানে। সে কি বলতে যাচ্ছিল এমন সময় বাইরে থেকে ঝি বসুকে উদ্দেশ করে বললে যে উনুনে আঁচ উঠে গিয়েছে।—শুনে বসু তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেড়িয়ে গেল।

—ত্রিশ—

মানুষ তো মানুষ নয়, তারের একটা বাদ্য-যন্ত্র; একটু ত্রুটি হ'লেই বেসুরো বাজতে সুরু করবে। সেই বেসুরো প্রকাশ পায়, যখন কোনো কিছু একটা অঘটন ঘটিয়ে জীবনকে সাময়িক ভাবে অশান্তিময় করে তোলে।

সেদিন বসুর কি হ'য়েছিল, সে-ই জানে। চিতাকে ধরে ঘা কতক অচ্ছা করে পিটে দিলে। একে সে তার মেয়েকে এমন চোখের শাসনে রেখেছে যে, শিশু সাহস করে না মা বলে ডাকতে পর্য্যন্ত। তাকে অহেতুক প্রহার করার জন্য নিমাইয়ের কোমল অন্তঃকরণে আঘাত লাগল,—তাই ঘর থেকে বেড়িয়ে এসে

বলেছিল: "মা যে এত নির্দ্দয় হোতে পারে, তা' বসু তোমাকে দেখবার আগে আমার ধারণার অতীত ছিল—"

বসু নিমাইয়ের মুখের উপর জবাব দিতে ছাড়েনি, তাই সরোষে বলে ছিল,—"তুমি কি জানবে, যার গায়ের জ্বালা সেই জানে—" বলে মুখখানা হাঁড়ি-পানা করে সমস্ত দিন নিমাইয়ের সঙ্গে কথা বলে নি।

বসুর গায়ের জ্বালা কি যে হ'তে পারে নিমাই তা বুঝতে না পেরে চুপ করে গিয়েছিল। বুঝবার চেষ্টাও করেনি; হয় তো সে জানত যে, নারীর মনস্তত্ত্ব বোঝবার অপেক্ষায় এক লাফে এভারেষ্ট পর্ব্বত অতিক্রম করা সহজ।

মাঘের অপরাহ্ন বেলা। নিমাই চাদরে সর্ব্বাঙ্গে ঢেকে বেতের চেয়ারটায় বসে বই পড়ছে। তার অনতিদূরে চিতা খেলা করছে তার খেলনা নিয়ে। এমন সময় বসু ব্যস্ত-সমস্ত হ'য়ে ঘরে ঢুকল, ঢুকে তার আঁচলের চাবির থোলো থেকে একটা চাবি বেছে নিমাইয়ের ট্রাঙ্কটা খুললে; ভিতর থেকে একখানা দশ টাকার নোট নিয়ে আঁচলে বাঁধল। বসুর অবস্থা দেখে চিতা হাঁ করে চেয়েছিল তার মায়ের দিকে। সে বোধ হয় বুঝতে পেরেছিল তার মা কোথাও যাচ্ছে। তাই শিশু সকাল বেলার লাঞ্ছনা ভুলে গিয়ে বসু যখন ঘর থেকে বেড়িয়ে যাচ্ছিল তখন সরলান্তকরনে সে জানতে চাইলে,—"মা, তুমি টুটায় যাচ্ছো—"

বসু তার মেয়ের কথা শুনে থমকে দাঁড়াল; দাঁড়িয়ে শিশুটির

প্রতি এমন একটা দৃষ্টিবাণ নিক্ষেপ করলে তাতে ব্যাচারা হরিতাহতের মতো হয়ে নিমাইয়ের কোলে গিয়ে মুখ লুকালে। নিমাই বই থেকে চোখ তুলে দেখলে যে, বসু গায়ে চাদর জড়িয়ে একটা পুঁটলি হাতে করে বাড়ী থেকে বেড়িয়ে গেল। সে কোথায় গেল, কখন আসবে কিচ্ছুটি বলে গেল না নিমাইকে।

কিছুক্ষণ পরে ঝি এসে নিমাইকে জানালে যে, তার মা অর্থাৎ বসু পাড়ার কয়েকটি মহিলার সঙ্গে গয়া গিয়েছে। নিমাইয়ের মনে একটু দুঃখ হ'ল বসু তাকে কিছু বলে না যাওয়াতে।

চিতা তার পায়ের তলায় বসে খেলা করছিল, নিমাই তাকে বললে,—"চল চিতা, আমরা বেড়িয়ে আসি—"

"টুটা—" শিশু ঘাড় না তুলেই অন্যমনস্ক ভাবে জিজ্ঞাসা করলে।

"অনেক দূরে, সহরে—"

সহরের যে-বিহারী হোটেলটায় নিমাই আগে থাকত, সে চিতাকে নিয়ে বেড়িয়ে পড়ল সেই হোটেলের উদ্দেশ্যে। এই মতলব নিয়ে যে, বসু না আসা পর্য্যন্ত সে আসবে না।

দারুণ শীতের গম্ভীর রাত্রি।

নিমাইয়ের হঠকারিতার জন্য নিদ্রাদেবী আজ বোধ হয় তাকে ভুলে আছেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা অতীত হ'য়ে চলেছে, তবু তার চক্ষুর দু'টি পল্লব এক হবার নাম নেই। সে ডুবে আছে তার

মজ্জাগত এলোমেলো চিন্তায়। রাত্রি নিঃশ্বাস বন্ধ করে স্তব্ধ হ'য়ে আছে।···শব্দ বলে জিনিষটা চিরতরে বিদায় নিয়েছে যেন! যদি কোথাও একটা তৃণখণ্ড পতিত হয়, তবে তা' বজ্র পতনের মতো শব্দ হবে।

হঠাৎ····এই নিঃশব্দের একঘেয়ে কাণ ঝালাপালা করা বিরাট শব্দ নিমাইয়ের কাণে পৌঁছুলো! এই শব্দ, কাণ পেতে সে কিছুক্ষণ শুনে, আকাশে-বাতাসে সর্ব্বত্রই যে প্রাণ-কণিকায় পরিপূর্ণ, এই সিদ্ধান্তে সে উপনীত হ'ল। সেই প্রাণ-পুঞ্জই এক-ঘেয়ে-ডাক ডেকে যাচ্ছে খুব ক্ষীণভাবে—চিঁ-ইঁ-ইঁ-ইঁ ইঁ···।···· আরো শুনলে সে, স্বীয় দেহভ্যান্তরের নানা রকম শব্দ।···বহুদূর থেকে মাঝে মাঝে সারমেয়-স্বর বাতাসে ভেসে আসছে।···কখনও কখনও কাকরির কর্কশ শব্দে নিবীড় রাত্রির নীরবতা হ'য়ে যাচ্ছে চিড়ে দু'ফাঁক।···

নিমাই মুখ চোখ লেপে ঢেকে দেখতে লাগল পুঞ্জীভূত অন্ধকারের অপরূপ রূপ!···দেখে সে ভাবল,—এই পুঞ্জীভূত অন্ধকার নিবিষ্ট চিত্তে স্থির দৃষ্টিতে অবলোকন করলে বস্তুর বৈচিত্রতা স্বতই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যেন! এই অন্ধকার এক পাশে, আর অন্য পাশে দিবালোক রেখে ধ্যান করলে জীবনের মূল কথা আপনা আপনি উদ্ঘাটিত হয়ে পড়ে যেন।····আলো অন্ধকার! বস্তুর, সব কিছুর দুই দিক! এই আলো-অন্ধকারের মধ্য দিয়ে মাথা গলাতে গলাতে মানুষের জীবন চলেছে।····অনিবার্য্য ভাবে আলোর পশ্চাদ্ধাবন

করছে অন্ধকার!···মানুষ যখন এই আলোতে থাকে, নিমাই ভাবল, তখন যদি সে অন্ধকারের জন্য নিজেকে প্রস্তুত না রাখে—তবে ঘোর তমসাময় রাত্রিতে আঘাতের পর আঘাত এসে তার জীবন কি বিষময়ই না করে তোলে! কিন্তু সে যদি এই অন্ধকারের জন্য আগে থেকে নিজেকে প্রস্তুত রাখে, তবে রাত্রির অন্ধকারে দুর্গম পথ অতিক্রম করতে করতে পায়ে আঘাত হয় তো পায়, কিন্তু সে নিশ্চিত ভাবে আবার এগিয়ে যায় উদয়াচলের দিকে।···জীবনে জোয়ার-ভাঁটা, আলো-অন্ধকার প্রভৃতির অনিবার্য্য পরিণতি অস্বীকার করে, অবিমিশ্র সুখ-কল্পনায় মানুষ নিজেকে ডুবিয়ে রাখার জন্য তার বুক ক্ষণে ক্ষণে ভেঙ্গে কি ভাবে চূর্ণ-বিচূর্ণ না হয়!··· বাঁকীপুর ফাঁড়ীর ঘড়ীতে তিনটে বাজার শব্দ শুনে নিমাই বিছানা থেকে উঠে পড়ল।···প্রায় মিনিট পাঁচেক পরে তিন মাইল দূরে অবস্থিত হাই কোর্টের ঘড়ির আওয়াজ তার কাণে এসে পৌঁছুল খুব ক্ষীণভাবে—ঢ-ন-ন-নং, ঢ-ন-ন-নং, ঢ-ন-ন-নং···

জানালাটা এক দিক খোলাছিল, অন্যদিক খুলে দিয়ে নিমাই বাইরের দিকে তাকাল। স্তব্ধ প্রকৃতি ও শান্ত শর্ব্বরীর অপূর্ব্ব মিতালি!···দেখলে সে,—সব মানুষ ঘুমুচ্ছে।···মানুষ কত অসহায়!—নিমাই ভাবল, রাত্রির এই সুষুপ্ত মানুষগুলোর পাশে দিনের জাগ্রত মানুষগুলোকে পাশাপাশি রেখে বিচার করলে বোঝা যায়,—প্রকৃতির এই করুণাস্পদগুলো কত মূঢ়! এরাই দিনের বেলায় পরস্পরে কামড়াকামড়ি ছুটোছুটি লাফালাফি

করবে!···এদের এই সমস্ত ক্রিয়া-কালাপের মূলে রয়েছে একটি মাত্র কারণ,—স্ব স্ব অস্তিত্ব লোপের আশঙ্কা—অর্থাৎ মৃত্যু! এই মৃত্যু-ভয়ে ভীত অসহায় মানুষ স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষার জন্য মরিয়া হ'য়ে দিগ্বিদিক ছুটোছুটী কোরে সেই মৃত্যুকে কত কাছেই না টেনে আনে!····

যার আগমনে,—নিমাই আরো ভাবল, এই ঘুমুন্ত-জীবগুলো জেগে উঠবে,—সেই সর্ব্বশক্তিমান্ মহাদ্যুতিম মাথার ওপর থাকা সত্ত্বেও মানুষ মানুষের প্রতি কত অত্যাচার, অন্যায়, মিথ্যাচারই না করে!···মানুষের এই সমস্ত ব্যবহারের ফলাফল নির্জ্জন নিশীথে গৃহের এক কোণে বসে চিন্তা করলে সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হ'য়ে ওঠে যেন! মানুষের অনন্তঃ দুঃখ, যন্ত্রণার কারণ যেন স্বতঃই চোখের সম্মুখে হ'য়ে ওঠে প্রতিভাত!··· সেই সর্ব্বশক্তিমান্ সম্বন্ধে মানুষ কত···কত···কত অজ্ঞ! তাঁর চোখে প্রতিটি জীব সমান। অথচ এই লোভী পাপী, মূঢ় মানুষ কত অসাম্যের সৃষ্টিই না করেছে! আবার এই অর্থ-গৃধ্নু মানুষরাই শিক্ষার গরিমা দেখায়, সভ্যতার বড়াই করে—সত্যের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে!··· সভ্যতা, নিমাই নিশ্চিত করলে নিজেকে, মানুষের দুস্তোষনীয় প্রবৃত্তিকে পার্থিব সম্পদ দিয়ে শান্ত করার হাস্যকর প্রচেষ্টার নাম সভ্যতা। উৎকট মোহ-গ্রস্ত, প্রাণহীন নরনারীর আত্মঘাতী ও পতঙ্গ-বৃত্তির নাম দেওয়া হ'য়েছে সভ্যতা!

বাঁধভাঙ্গা জল যেমনি চকিতে দিগ্বিদিক ছড়িয়ে পড়ে, পাঞ্জাব

মেলখানা আসতেই সুপ্তীমগ্ন সহরটায় শব্দের বন্যা বয়ে গেল যেন! গা আড়ামোড়া ভেঙ্গে নিমাই আর একবার লেপের তলায় লুকালো।

সকাল বেলায় উঠে নিমাই দেখল কন্ কনে শীতের উপর টিপি টিপি বৃষ্টি পড়তে সুরু করেছে। গত রাত্রির অনিদ্রার জন্য মন-মেজাজ ট্যাব্ ট্যাব্ করছে তার, তাই একখানা চেয়ার বারান্দায় বা'র করে চিতাকে কোলের মধ্যে নিয়ে চুপ করে বসে বসে দেখতে লাগল—প্রাকৃতিক দুর্য্যোগের জন্য একটা পথিকও পথে নেই। সামনের বড় পিচের রাস্তাটা, যেটা প্রায় দু' শ' গজ দক্ষিণ দিকে গিয়ে ডান দিকে ধনুকাকারে বেঁকে পাঁচ ছ' শ' গজ যাবার পর পুনরায় পূর্ব্বোক্ত ভাবে বেঁকে সোজা দক্ষিণ দিকে চলে গিয়েছে।—প্রথম বাঁকের মুখ থেকে লম্বের মতো খাড়া একটা পথ পশ্চিম দিকে গিয়েছে চলে। দ্বিতীয় বাঁকের মাঝা মাঝি ধনুকে তীর যোজনার মতো হ'য়ে একখানা পথ পড়ে আছে। পিচের পথগুলোতে টিপি টিপি বৃষ্টি পড়ে চক্ চক্ করছে; তাদের দু' পাশে ধূলোর রাস্তা।···অন্ধকার ও জ্যোৎস্না পরস্পর পরস্পরকে যেমন প্রত্যক্ষীভূত করে তোলে, তেমনি দু' পাশে স্বল্প-সিক্ত ধূলি পথের মাঝখানে পিচের রাস্তাটা জ্বল্ জ্বল্ করছে!···

······তাল নারকেল ইউক্যালিপট্যাস্ বেল নিম খেজুর প্রভৃতি গাছের মাঝে মাঝে কোঠা ঘর-বাড়ীগুলো বৃষ্টিতে বিবর্ণ হ'য়ে গিয়ে,

বাড়ীর গায়ের শেওলা-মলিন-চূণ লাল হলুদে প্রভৃতি রং ফ্যাট্ ফ্যাট্ করে ফুটে উঠেছে। খাপরার ঘরের খাপরাগুলো ভিজে তাদের দারিদ্র্য লোক-চোক্ষে তুলে ধরেছে যেন!···শেওলা-ধরা কালাটে খাপরাগুলোর মাঝে মাঝে নূতনগুলো হয়ত মনে মনে হাঁসছে এই ভেবে যে, তাদের ওই টক্ টকে লাল রঙ চিরদিনই থাকবে!··· তাল গাছগুলো এক পাশ ভিজেছে অন্য দিক শুকনো; যে-দিকটা ভিজেছে সেদিকটা ঘোর কালো, আর শুকনো দিকটা সাদা ধপ্ ধপ্ করছে।···এক মাথা চুল আর লম্বা দাড়ি নিয়ে কেউ যদি একটা ডুব দিয়ে ওঠে, তবে তাকে যেমন দেখতে হয়— খেজুর গাছগুলো দেখাচ্ছে সেই রকম।···জুজুর-ভয়ে-ভীত-শিশুর মতো ক্ষীণাঙ্গী ইউক্যালিপট্যাস্ গাছগুলো ভয়ে জড়সড় হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে।···ওদিকের ভিজে বেল গাছটা দেখলে মনে হ'বে যেন ওটা অন্ধকারের আকাশ, আর তার মাঝে বেলগুলো ফুটে উঠেছে নক্ষত্রের মতো!···এই কন্ কনে শীতে পল্লবলেশহীন, নগ্ন কৃষ্ণচূড়া গাছগুলো অসহায় ভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজছে; প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ কি ভাবে চোখ-নাক-মুখ বন্ধ করে সহ্য করতে হয়, সেই শিক্ষা দিচ্ছে ওরা; যেন···

পথের এক পাশে একটা ফেটিন গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে। গাড়ীখানা জীর্ণ; ভেতরে বসবার গদিগুলো ছিঁড়ে নারকেল ছোবরা বেড়িয়ে পড়েছে।···এই ফেটিন-রূপী জড়-পদার্থটার সঙ্গে ঘোড়াটা এমন নিশ্চল ভাবে দাঁড়িয়ে আছে, যেন ওটা একটা

প্রাণহীন কাঠের ঘোড়া। ···ঘোড়াটা জানে,—এবং জানে মানুষের চাইতে ভাল ভাবেই, - যে, ওর অষ্টপৃষ্ঠে যে-ভাবে বাঁধা আছে, তাতে ও পালাবার চেষ্টা করলে, চাবুকের চোটে দৈহিক ক্ষত, কিম্বা ঘাড় মুখ গুঁজে খানায় নালায় পড়া ছাড়া আর বিশেষ কিছু লাভ হ'বে না। সেই জন্য ও ভেবে রেখেছে যে চালক এসে যেদিকে লাগাম টানবে, সেইদিকে পা বাড়ানোই সব চেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ।·········

প্রায় দশটা তখন বাজে। বৃষ্টি থেমে গিয়েছে। লোকজন, গাড়ী-ঘোড়া চলতে সুরু করেছে পথ দিয়ে।

"বগল্‌সে, বগল্‌সে—এ—এপ্‌—" যুগপৎ পা ঠুকে ও মাথার ওপর ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে একটা চালক তার এক্কাখানা তীর বেগে বা'র কোরে নিয়ে গেল—অন্য একটা রুগ্ন অশ্ব-দ্বারা-বাহিত, বৃদ্ধ-চালক-দ্বারা-চালিত জীর্ণতম এক্কাকে উপেক্ষা করে!······আবাহমান কাল ধরে পৃথিবীর গতির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করবার জন্য মানুষ যে আপ্রাণ চেষ্টা করছে, চালকটা তারই পরিচয় দিয়ে গেল বটে, কিন্তু ও বলে গেল সেই একটী কথা ;—যে, 'আমি বড়' 'আমার নীচে তোমরা সব থাকবে'। তা' তোমরা আমার সগোত্র হ'লেও!······ওঃ, নিমাই ভাবল, স্রষ্টা মানুষের মগজে এমন একটা চীজ ঢুকিয়ে দিয়েছেন, যার জন্য তাকে করে রেখেছে—হিংস্র, ধূর্ত্ত, লোভী এই তিন দস্তুর জন্তুর যে-কোনোটির চেয়ে নিকৃষ্ট !···

নিমাই লক্ষ্য করেনি ; তার পিছুতে বসু এসে দাঁড়িয়ে আছে। বসু সকালের ট্রেণে গয়া থেকে এসেছে। বাড়ীতে নিমাই নেই দেখে এবং সে হোটেলে এসেছে, ঝি-এর কাছে জানতে পেরে বরাবর রামদহিনের এক্কা করে বসু এসেছে নিমাইয়ের অভিমান ভঙ্গ করতে।

"চল—"

ধ্যানমগ্ন নিমাই একবারে পিছুতে বসুর গলার স্বর শুনে চমকে উঠ্‌ল।

"একি! তুমি এখানে কখন এলে—" নিমাই চিত্তাকে কোল থেকে নামিয়ে ধেড়েমেড়ে উঠে দাঁড়াল ; যেন গত কাল বিকেল থেকে ওর দেহ হ'তে প্রাণশক্তিটা উড়ে গিয়েছিল, আজ এই একুণি এসে ঢুকলো।

"পাঁচ মিনিট ধরে দাঁড়িয়ে আছি, সেদিকে খেয়াল নেই—" নিমাইয়ের প্রশ্ন এড়িয়ে বসু বলে মুখ টিপে টিপে হাঁসতে লাগল।

চিত্তা ভ্যাবা চ্যাকা মেরে গিয়ে ফ্রকের একদিকটা তুলে কাত হ'য়ে তার মায়ের মুখের দিকে অসহায় চাউনী চেয়ে বললে,— "মা তুমি টুটা গিচলে—"

"জমের দক্ষিণ দোরে—" বলে বসু মেয়েকে কোলে নিয়ে একটা চুমু খেলে।

বসু চিত্তার চুমু খেলে, নিমাই যেন কৃতার্থ হ'ল। সে দাঁড়িয়ে

দাঁড়িয়ে হাতে হাত ঘষতে লাগল। তার অন্তরের আনন্দটুকু চোখ মুখ দিয়ে ঝড়ে পড়তে লাগল যেন।....

"তা ষ্টোভটা জ্বেলে এক মুঠো ফুটিয়ে খেয়ে রাত কাটানো যেতো না বুঝি—" বসু তার মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে নিমাইকে উদ্দ্যেশ করে বললে।

"তা'—" বাধিত স্বরে নিমাই উত্তর দিলে,—"আমি তো জানতাম না যে, তুমি আজকেই আসবে—"

বসু চিতাকে কোলে করে যাবার জন্য পা বাড়াতেই নিমাই বললে,—"ওকে কোলে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে পারবে না তুমি, আমাকে দাও—"

বসু বিরুক্তি না করে চিতাকে নামিয়ে দিলে; নিমাই তাকে বুকে করে যাবার জন্য পা বাড়ালে সামনের দিকে।

—একত্রিশ—

প্রায় দেড় বৎসর অতীত হ'য়ে গিয়েছে। ভাদ্র মাসের এক ধূসর অপরাহ্নে এই ক্ষুদ্র কৃষক পল্লীটিতে ছোট্ট অথচ মর্ম্মস্পর্শী একটী ঘটনা ঘটে গিয়েছে সকলের অগোচরে।

প্রতিদিনের মতো সেদিনেও চিতা পাড়ার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে

খেলা করছিল—পল্লীটির অনতিদূরে একটী পতিত জমিতে।—এমন সময় একটী ফেরীওয়ালা—গায়ের রং তামাটে, তৈলহীন মাথার চুলগুলো কটা, কোঠর-প্রবিষ্ট চক্ষু, চটাল কপাল, গাল বসে গিয়ে হাড় দুটো অস্বাভাবিক রকম উঁচু হ'য়ে উঠেছে, নগ্ন পদ, মলিন বসন পরনে, ছিন্ন একটী জামা গায়ে, লম্বা চেহারাখানা দারিদ্র্যের ভারে ঈষৎ সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে—এসে তার সুটকেশটা, যেটায় করে সে ফট্‌কি নাট্‌কি বিক্রি করে, নামিয়ে সকল ছেলেমেয়েদের ছেড়ে চিন্তাকে একটী নয়নাভিরাম খেলনা দিলে, দিয়ে বললে স্নেহভরে,—"খুকী আমার কোলে একবার আসবে—" বোলে সে কোল বাড়াল।

চিন্তা বার কয়েক ভয়ে ভয়ে তাকাল ফেরীওয়ালটার দিকে; কিন্তু ফেরিওয়ালাটি—যদিও তার চেহারাটা শিশুদের কাছে আশঙ্কার উদ্রেক করে—অবু নম্রতা ও খেলনাট দিয়ে তার মন থেকে সব ভয় মুছে দিতে সমর্থ হয়েছিল বলে শিশু সরল মনে ফেরীওয়ালার কোলে উঠতে ইতঃস্বতঃ করলে না। অন্যান্য ছেলেমেয়েরা খেলা বন্ধ করে দেখলে, কিন্তু বাংলা ভাষা বুঝতে না পেরে পুনরায় যে যার খেলায় দিলে মন।

"খুকী তোমার নাম কি—?" ফেরীওয়ালাটি জিজ্ঞাসা করলে চিন্তাকে শান্ত ভাবে।

"অদাত্তিতা—" চার বছর সাড়ে চার বছর বয়স হলেও চিন্তা নিজের 'অযাচিতা' নামটা স্পষ্ট ভাবে উচ্চারণ করতে পারে না।

"অদাতিতা ? সে আবার কি ?" ম্লান হাঁসি হেঁসে ফেরীওয়ালিটি বললে।

চিতাকে বুকের মধ্যে চেপে ধরে তার মুখের প্রতি অনিমেষ নেত্রে ফেরীওয়ালিটি চেয়ে আছে কেন, তা' শিশু হৃদয়ঙ্গম করতে পারলে না।....কিছুদূরে—বড় রাস্তায়—সাইকেলে নিমাইকে আসতে দেখে, 'বাবু আসতে বাবু আসতে'—বলে চিতা কোল থেকে নামার চেষ্টা করল।

"উনি তোমার বাবা ?" ফেরীওয়ালাটি অর্থ সূচক ভাবে কথা কয়টি বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, চিতার মুখে একটা চুমু খেয়ে ধীরে ধীরে নামিয়ে দিলে, দিয়ে এমন ভাবে গা ঢাকা দিলে, যাতে আর কেউ তাকে দেখতে না পায়।

চিতা ছুটে গিয়ে পথের ধারে দাঁড়াল। নিমাই কাছে এসেই নেমে পড়ল সাইকেল থেকে। নেমে এক হাতে সাইকেল অন্য হাতে চিতাকে বুকে তুলে নিয়ে বাড়ীর দিকে হাঁটতে লাগল।

হরবর করে বকে খেলনাটা দেখিয়ে চিতা নিমাইকে বোঝাবার চেষ্টা করল ঘটনাটা। নিমাই কিন্তু বোঝবার চেষ্টা করলে না। সে জানে ফুটন্ত গোলাপের মতো এই ছোট্ট মেয়েটিকে যে দেখবে, সে ওকে ভালো না বেসে পারবে না। স্নেহপরায়ণ হ'য়ে কেউ যদি একটা জিনিষ দেয়ও, তবে সেটা বড় কথা নয়।

ফেরীওয়ালাটি মাঠের মধ্যে একটা তাল গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখছিল ; নিমাই চিতাকে নিয়ে বাড়ীর ভিতর ঢুকে পড়তেই

সে একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করে অস্ফুট ভাবে উচ্চারণ করলে কি একটা কথা। পরে সে পা বাড়াল সহরের দিকে।

মাস খানেক পরে। মেঘলা দিনের অপরাহ্ন বেলা।

বন্দু পাড়ায় বেড়াতে গিয়েছে। নিমাই ঘরের মধ্যে কি করছিল। এমন সময় ছোট্ট চাঁদনীওয়ালা একটা এক্কা এসে দাঁড়াল বাড়ীর দ্বার গোড়ায় —

"বাংগালী বাবু—"

নিমাই পরিচিত স্বর শুনে তাড়াতাড়ি বাড়ীর বাইরে এলো: "কি রে, জবাহর, ব্যাপার কি?" পাটনা সহরের সেই বিহারী হোটেলের চাকর জবাহরকে দেখে নিমাই সাশ্চর্য্যে প্রশ্ন করলে।

জবাহর তার দেহাতী ভাষায় ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললে। সে যা বললে তা হোচ্ছে যে,—কোনো এক বাঙালী ভদ্রলোক মরনাপন্ন অবস্থায় হোটেলের নীচেয় বাসের অযোগ্য একটা ঘরে পড়ে আছে। তিনি নিমাইকে দেখতে চান। এবং দেখে বলতে চান তাঁর শেষ বক্তব্য; সে ভদ্রলোক নাকি নিমাইকে চেনে।

মানবতার খাতিরে হোটেলের ম্যানেজার যখন একবার উঁকি মেরে দেখতে গিয়েছিলেন, সেই সময় ভদ্রলোক অনুনয় বিনয় করে বলে নিমাইকে খবর দিয়ে আনবার জন্য। ম্যানেজার সাহেব ভদ্রলোকের সঙ্গীন অবস্থা দেখে একেবারে একটা এক্কা ভাড়া করে জবাহরকে পাঠিয়ে দিয়েছেলেন, পাছে আসতে দেরী

হয়; কেননা, ম্যানেজার জানতেন যে—নিমাই যেখানে থাকে সেখানে সব সময় কোনো যানবাহন পাওয়া যায় না। আর সত্বর না আসলে মুমূর্ষু ভদ্রলোকটির শেষ আশা পূরণ নাও হ'তে পারে।

জবাহরের কথা মতো চালকটা খুব জোরে চালাল তার গাড়ী। নিমাই আর জবাহর দুজনে পাশাপাশি বসেছে। গাড়ীখানা যখন উঁচু নীচুতে পড়ছে তখন তাদের গায়ে লাগছে একটা জোর ঝাঁকুনী। এম্নিতেই দুলছে তাদের সর্ব্বাঙ্গ; তাদের মাথা দুটো অনবরত নড়ে যাচ্ছে। মাথার ওপর গাড়ীর ছাউনীটা আড়াআড়ি ভাবে নড়ছে—ক্যাঁচ-ক্যাঁচ ক্যাঁচ····।···নিমাই তখনও ঠিক করে উঠতে পারেনি ভদ্রলোক কে হ'তে পারেন। তার এমন কেউ চেনা পরিচিত নেই, যে-নাকি ওই রকম অসহায় অবস্থায় পড়ে থাকতে পারে। সে দু'হাতে চোখ ঢেকে মাথা নীচু কোরে চিন্তা করতে লাগল।

"মাস তিনেক হ'ল এসেছে—" জবাহর তার দেহাতী ভাষায় বলতে লাগল: "চাকরী খুঁজতে এসেছিল। আগে এক টাকা ভারা দিয়ে নীচেয় একটা ঘরে থাকত। চাকরী বাকরী যখন জুটল না, তখন সে-ঘর ছেড়ে দিয়ে রাস্তার ধারে দশ আনা ভাড়ার ঘরটা নিলে। পেট চালান যখন দায় হ'য়ে উঠল, তখন একটা সুটকেশে করে ফটকি নাটকি ফেরী করতে সুরু করলে। মাসখানেক মাস দেড়েক সে-কাজ করে তাতেও যখন পেট চালানো সম্ভব হ'ল

না—তখন সেটা ছেড়ে দিয়ে বসে রইল দিন কতক—” বলে জবাহর থামল কিছুক্ষণের জন্য।

নিমাই এক দৃষ্টে জবাহরের দিকে তাকিয়ে আছে। সে ভাবছে এখনও যে,—একেবারে এত দুরবস্থায় পড়তে পারে, এমন লোকের সঙ্গে তার পরিচয় আছে বলে তার মনে হয় না।

“কারুর সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলে না—” জবাহর আবার আরম্ভ করল,—“আপন মনে সব সময় গুম্ হ'য়ে বসে থাকতো। ক'দিন শুধু ছাতু খেয়ে কাটালে, তাও দেখেছি।…আমরা সবাই ভেবে রেখেছিলাম তাকে পাগল বলে।…তারপর হঠাৎ একদিন দেখা গেল মাথার চুল ছিলে ফেলে কালো হাপ প্যাণ্ট আর একটা লাল ফতুয়া পড়ে সাইকেল রিক্সা চালাচ্ছে। সেদিন আমাদের আর সন্দেহ রইল না যে, সে পাগল ছাড়া আর কিছু। সাপ্তাখানেক পরে একদিন রাত্রি বেলায় মাথা ভেঙ্গে রক্তারক্তি হ'য় বাসায় এল; তখন এমন অবস্থা যে, মুখ দিয়ে কথা বেরোয় না। আমরা ভাবলাম,—বদমায়েসি করতে গিয়ে এই অবস্থা হোয়েছে। কিন্তু পরে জানা গেল যে,—সওয়ারী নিয়ে যখন রিক্সা চালাচ্ছিল, তখন অপর একটা গাড়ীর সঙ্গে ধাক্কা লেগে উল্টে যায় তার রিক্সা। তাতে গাড়ীতে-বসা বাবু দু'টো ধূলোয় পড়ে তাদের জামা কাপড় নষ্ট হ'য়ে গিয়েছিল বলে ব্যাচারাকে মার-ধোর করে আধমরা করে ফেলে। তার উপর যার রিক্সা তার কাছে

যখন গাড়ীখানা পৌঁছে দিতে যায় তখন মালিকের দরোয়ানের সঙ্গে দু' এক কথা নিয়ে বচসা হওয়াতে লাঠি দিয়ে মেরে হাড়গোড় ভেঙ্গে দিয়েছিল ; সেই যে রাত্রি বেলায় মার-ধোর খেয়ে এসে শুয়েছে, তারপর থেকে আর উঠ্‌তে পারেনি—"

জবাহরের বর্ণনায় নিমাইয়ের সর্ব্বাঙ্গ শিউরে উঠল। সে ভাবল, কে এই হতভাগ্য !······

হোটেলে নিমাই এসে যখন পৌঁছুলে, তখনও ঘণ্টাখানেক বেলা আছে। হোটেলের ম্যানেজার আর দু' একটী বিহারী ভদ্রলোক মুমূর্ষু ভদ্রলোকটীর বিষয়েই কথাবার্ত্তা বলছিলেন। একাখানা দাঁড়াতেই ব্যস্তভাবে ম্যানেজার বললেন,—"তুরন্তে উতারিয়ে বাংগালী দাদা ; খতম হোনেকো অউর দের নোহি হ্যায়—" বলে নিমাইকে সঙ্গে করে ভদ্রলোকের কুঠ্‌রীর দিকে পা বাড়িয়েই জবাহরকে উদ্দেশ করে বললেন,—"রে জওআরা—একঠো কুরশীয়া আওর লান্‌টেনিয়াঠো বাড়হায়কে লে আও হো জলদি—"

হোটেলের পূর্ব্ব দক্ষিণ কোণে রাস্তার ধারে অন্ধকারময় ছোট্ট একটী কুঠ্‌রী। কুঠ্‌রীর নীচেয়ই নর্দ্দমা, তাতে বদ্ধ কালাটে জলে মশার বাচ্ছাগুলো গিজ্‌ গিজ্‌ করছে। তার উপর কুঠ্‌রীর সংলগ্ন পূর্ব্বদিকে যে খাটা-পায়খানা দু'টী আছে, তার নালী দিয়ে মূত্র ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মলকণা গড়িয়ে এসে তাতে জমা হয়ে আছে। নর্দ্দমা ডিঙিয়ে রাস্তার দিকে বুকসই দেওয়াল দিয়ে ঘেরা সরু

যুড়।

বারান্দাটায় ওঠার পর পূর্ব্ব দিকে পা দুতিন বাড়ালেই বাঁ দিকে একেবারে কোণে কুঠরীর প্রবেশ দ্বার। গ্রীষ্মকালেও এ ঘর দিয়ে জল ওঠে, তার ওপর বর্ষাকাল। ঘরের মেঝেতে জল যেন থক্ থক্ করছে। তার উপর পায়খানা হ'তে আগত মুড়ির মতো পোকা-গুলো কিল্ বিল্ করে বেড়াচ্ছে ইতঃস্তুতঃ।…ঘরের চারদিকের দেওয়ালের অর্দ্ধ পথ পর্য্যন্ত জল উঠেছে। দক্ষিণ দিকের প্রবেশ দ্বারটি বন্ধ করে দিয়ে ভেতরে থাকলে অন্ধকূপের চেহারা অনুমান করা অতীব সহজ। এই ঘরে পশ্চিম পাশে একটা জীর্ণতম খাট—যেটার একদিকের পায়া ভেঙ্গে গিয়েছে বলে ইঁটের ঠেক্না দেওয়া আছে—খড় বিছিয়ে তার ওপর একটা ধূসর রঙের বিলিতি কম্বল এবং নগ্ন তৈলসিক্ত বালিসে মাথা দিয়ে, গলা পর্য্যন্ত ময়লা চাদরে ঢেকে একটী মুমূর্ষু ব্যক্তি নাভিশ্বাস ছাড়ছে। আসন্ন মৃত্যুর বিভীষিকায় তার মুখটা ঢেকে ফেলেছে; দেখলে মনে হ'বে যেন একটা জীবন্ত প্রেতমূর্ত্তি!…তার মুখ চোখ কপাল মাত্র একটী চামড়া দিয়ে ঢাকা আছে। ভেতরের মাংসগুলো বহু পূর্ব্বেই ব্যাধির বীজাণুতে খুবলে খুবলে খেয়ে নিয়েছে।

ঘরে ঢুকবার আগেই ম্যানেজার নিমাইকে নাকে রুমাল দিতে ইসারা করলেন। জবাহর লণ্ঠণ নিয়ে আগে আগে ঢুকল ঘরে।…ভেতরে পা বাড়িয়েই একটা নারকীয় দুর্গন্ধ নিমাইয়ের নাকে যেতেই প্রাণপণে ঠোঁট দুটো চেপে ধরে বমনোদ্বেগটা থামিয়ে নিলে।…কাছে আলো ধরলে জবাহর; নিমাই দেখল মুমূর্ষু

হতভাগ্যটিকে। কিন্তু কখনও সে তাকে দেখেছে বলে ঠাওর. করতে পারলে না। সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিরীক্ষণ করতে লাগল।

…টের পেয়ে রোগীটি তার কোঠর প্রবিষ্ট চোখের অসহায়, হৃদয় বিদারক একটা চাহনী নিমাইয়ের মুখের দিকে নিক্ষেপ করলে। কথা বলার শক্তি তার বিলুপ্ত হ'য়েছে অনেক আগেই; সে চেষ্টা করলো হাত বড়িয়ে বালিশের তলা থেকে কিছু একটা দেবার, কিন্তু শক্তিহীন হাতটি নেতিয়ে পড়লো তার পাশে।….

নিমাই কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে তখনও! তার মুখের দিকে নির্ব্বাক হ'য়ে তাকিয়ে আছে—জবাহর আর ম্যানেজার। রোগীটির হাত লুটিয়ে পড়তেই নিমাই অনুমান করে নিলে যে, তার বালিশের তলায় কিছু আছে। সে বালিশটা একটু তুলতেই দেখতে পেলে একখানা লেফাফা। বা'র করলে সেটা। সে-লেফাফার ভেতর আর একখানা লেফাফা আটা দিয়ে বন্ধ করা; আর একখানা দীর্ঘ লিপিকা।

রোগীর শেষ অবস্থা।….

ম্যানেজার ছুটলো জল আনতে।

জবাহর আলো ধরে দাঁড়িয়ে আছে।

নিমাই কম্পিত হস্তে চিঠিখানা খুলল। কয়েক পত্র পড়েই সে চমকে উঠলো বেত্রাহতের মতো। নিঃশ্বাস বন্ধ করে সে

চিঠিখানা পড়তে লাগল। মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে রোগীর দিকে—তার কপাল চক্ষু কুঞ্চিত হ'য়ে উঠেছে।

মুমূর্ষু ব্যক্তিটির নাম ভোলানাথ ভাদুড়ী। সেই লোক, যাকে নিমাই দেখেছে কোলকাতার সাদার্ন এভিনিউ-এ বসুমতীর সঙ্গে বেড়াতে, বি. এন. আর. রেল ষ্টেশনে স্ত্রী-হস্তে লাঞ্ছিত হ'তে।...এই লোকটিই এক মাস আগে অযাচিতাকে খেলনা দিয়ে কোলে তুলে নিয়ে চুমু খেয়েছিল। এই ভোলানাথ ভাদুড়ীই বসুমতীর কন্যা অযাচিতার জন্মদাতা।

সে চিঠিতে অনেক কিছু লিখেছে। তার জীবনের সংক্ষিপ্ত সার। কৃতকর্মের ফলাফল। কালেক্টারী ঘাটে নিমাই বসুকে গঙ্গা স্নান করাতে যেদিন নিয়ে গিয়েছিল সেও স্নান করতে গিয়েছিল, সেই সময় তাদের দেখে গা ঢাকা দেয়। তারপর পশ্চাদানুসরণ করে নিমাইয়ের বাসা দেখে আসে ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কিছু। দ্বিতীয় আটা-দিয়ে-বন্ধ-করা-লেফাফাটি বসুকে দিতে অনুরোধ করেছে নিমাইকে।—একবার দু' বার তিনবার নিমাই পড়ল চিঠিখানা। তার গায়ের রক্ত চলাচল বন্ধ হ'য়ে গিয়েছে বোধ হয়।

ঘর্-র্-র্-র্, ঘর্-র্-র্-র্, ঘর্-র্-র্-র্...

ভোলানাথ ভাদুড়ীর প্রাণ বায়ু বহির্গত হ'য়ে গেল!

একি! এক বিন্দু জলও পেলে না যে!...নিমাই চমকে উঠল। কি-একটা কথা বলবার জন্য তার নিজের কাছেই

অপরিচিত একটা বিকট চীৎকার করল,—"ও মশাই শুনুন—" বলে মুখে জল দেবার জন্য ব্যস্ত হ'য়ে উঠল। ..

নিমাইয়ের এই অস্বাভাবিক স্বরে মৃত ভোলানাথ ভাদুড়ী তার ঘোলাটে চোখ দুটো পাকিয়ে শেষ বারের মতো একবার তাকালে।.... আর নেই, চলে গিয়েছে!....

হ'ল না! নিমাই কি কথা বলতে যাচ্ছিল, তা আর সে পারলে না বলতে।...ছুটছে...ছুটছে...ছুটছে ভোলানাথ ভাদুড়ীর আত্মাটা অলক্ষ্যের পানে উদ্দাম গতিতে ছুটছে।....নিমাইয়ের আত্মাটাও যেন করছে তার পশ্চাদ্ধাবন।—"ও মশাই শুনুন—ও মশাই, ও মশাই শুনুন—" চীৎকার করে ডাকতে ডাকতে পিছু পিছু ছুটছে তার আত্মাটা।....নাঃ, পারলে না সে ধরতে। মৃত-ব্যক্তির আত্মার গতির কাছে জীবন্ত আত্মা হার মানলে!...নিমাইয়ের আত্মাটা যেন দাঁড়িয়ে পড়েছে। দেখছে সে,—একটা মৃত আত্মা চোখের পলকে লক্ষ কোটি মাইল বেগে ছুটছে।....শত সহস্র বৎসর, লক্ষ কোটি বৎসর, অনাদ্যন্ত কালের মধ্যে তার সঙ্গে আর দেখা হ'বে না; পারবে না নিমাই আর কোনো দিন বলতে তার অ-বলা কথাটা বলতে...

নিমাই প্রকৃতিস্থ হ'য়ে মৃত-ভোলানাথ ভাদুড়ীর মুখটার প্রতি একবার তাকিয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ভাবল,—মানুষ স্বর্গ দেখে আকাশের উপরে আর নরক দেখে পায়ের নীচে; কিন্তু চোখের সামনে স্বর্গ-নরক ভাসছে—তা' কেউ দেখতে পায় না।—নিমাই

আরো ভাবল,—উদ্দাম যৌবনে সুখান্বেষণে শঠতা, প্রবঞ্চনা, উচ্ছৃঙ্খলতার আশ্রয় নিয়ে এই যুবক অনন্তের পটে যে-কালির দাগ রেখে গেল, তা' সাত সমুদ্রের জল দিয়ে ধুলেও মুছবে না !···

সৎকার করবার উদ্দেশে হোটেলের ম্যানেজারের সঙ্গে পরামর্শ করবার জন্য ঘর থেকে বেড়িয়ে এল নিমাই।

•

রানীঘাট শ্মশানে ভোলানাথ ভাদুড়ীর নশ্বর দেহটা বুভুক্ষু বৈশ্বানরের মুখে হাঁসি ফোটাচ্ছে ! নিমাই আর জবাহর ছাড়া আর আর শব-বাহকরা কে কোথায় আছে দেখা যায় না। অনতি দূরে জবাহর একটা বাঁশের 'পর ভর দিয়ে অন্য হাত কাঁকালে রেখে নির্নিমেষ-নেত্রে চেয়ে আছে প্রজ্বলিত চিতাগ্নির দিকে। নিমাই ঘাটের পাশে ল্যাম্প পোষ্টটায় হেলান দিয়ে ধূলি-আসনের 'পর বসে সম্মুখে ভাদরের ভরা-গাঙ্গিনীর অসংখ্য উর্ম্মিমালা উচ্ছল ভাবে, নেচে নেচে, হাততালি দিয়ে বেয়ে চলেছে সাগরের দিকে—তাই দেখছে অপলক নেত্রে। কোটি কোটি তরঙ্গরাজির কুলু কুলু তান, নিশাচর পাখীর স-শব্দ ইতঃস্ততঃ বিচরণ গভীর রাত্রির নীরবতার টুঁটি টিপে ধরে আছে যেন।····এর মাঝেও শোনা যায়··· কাণ পেতে, নিঃশ্বাস বন্ধ করে থাকলে···অসংখ্য পিশাচের নিঃশব্দ নৃত্যের পদধ্বনি···মড়ার মাথা, শূন্য কলসী, অর্দ্ধদগ্ধ কাঠ নিয়ে পিশাচগুলো খেলা করছে যেন !····শাঁ-শাঁ-শাঁ-শাঁ····কাণের ভেতর হাওয়া ঢুকছে—যেন পিশাচ কুলের হাস্যধ্বনি—হিলিহিলি

কিলিকিলি!…ওই যে! ওই যে অসংখ্য নরকঙ্কালগুলো উন্মত্তবৎ নৃত্য করে বেড়াচ্ছে!…কেন?…কি বলছে ওরা?…যেন বলছে—জীবন আর তার জ্বালার মূল কথা…।…ফটাস্!… ভোলানাথ ভাদুড়ীর মাথাটা ফেটে চৌচির হ'য়ে গিয়ে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল!…পুড়ে ছাই হ'য়ে যাচ্ছে—বুদ্ধি সুবুদ্ধি কুবুদ্ধির ভাণ্ডারটা! আকাশ বাতাস ব্রহ্মাণ্ডময় ছড়িয়ে পড়ল—ফটাস্ শব্দটা…। ভোলানাথ ভাদুড়ী—ওই দূরে—দূরে—আকাশের উপরে উঠে গিয়ে বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দিচ্ছে চীৎকরে করে:— এ-জগতে হাঁসি-অশ্রু নাই, সুখ-দুঃখ, লাভ-ক্ষতি কিচ্ছু নাই; অভিমান অভিযোগ বিকারগ্রস্ত মনের লক্ষণ।…আছে শুধু একটা জিনিষ যা' অপরিসীম বিস্ময়ে হতবাক্ হ'য়ে দেখতে হয়,—তা' হোচ্ছে, আশা-আকাঙ্ক্ষা-ঈর্ষার আগুনে-বিদগ্ধ ভগ্ন মেরুদণ্ড সরীসৃপের মতো অসহায় মানুষের অবিরাম উত্থান পতন…

নিমাই ধীরে ধীরে একবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখলে,—চিতা প্রায় নিভ নিভ; জবাহর খোঁচাচ্ছে একদিকে।…বুক পকেট থেকে চিঠিগুলো বা'র করলে। যে-লোক পুড়ে ছাই হ'য়ে গিয়েছে, তার হাতের লেখাটা দেখতে লাগল অভিনিবেশ সহকারে।… চিঠিখানার যে-অংশটা সে বহুবার পড়েছে, সেটা আর একবার পড়লে: "মানুষ নরের মধ্যে নারায়ণ দেখতে না পেয়ে তাকে পূজা না করুক; কিন্তু তার প্রতি এমন ব্যবহার কেউ যেন না করে, যাতে তার দীর্ঘশ্বাস পরে।…ও-জিনিষ দেখতে পাওয়া যায় না,

কিন্তু ঘুণ পোকার মতো একেবারে সর্ব্বাঙ্গের হাড় ফোঁপ্‌ড়া করে দেয়।—এই কথাটাই আপনি বলে দেবেন যতগুলো লোকের সঙ্গে আপনার দেখা হয় ততগুলো লোককে।…”

মানুষ বুঝতে পারে, নিমাই ভাবলো—শেষ কালে, যখন আর কোনো হাত থাকে না।

পূর্ব্ব দিগ্বলয় নবারুণালোকে আরক্তিম। জবাহর কলসী কলসী জল ঢেলে চিতাগ্নি নির্ব্বান করে এসে নিমাইকে বাসায় ফেরবার জন্য ডাকলে! সে চমকে উঠে একবার চারদিক তাকালে। তার খেয়াল ছিল না যে, রাত্রি প্রভাত হ'য়েছে।…অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করলে—একি! দিনমান…

“ওমা! কোথায় ছিলে—” নিঃশব্দে নিমাই বাড়ীতে ঢুকতেই প্রতীক্ষারত বসু মুখ বিকৃতি করে এবং শ্লেষভরে বললে; সে রেগে চুড় হ'য়েছিল, কেননা গত কাল নিমাই যখন বাড়ী থেকে বেড়িয়ে গিয়েছিল তখন সে কাউকে কোনো কথা বলে যায় নি।—“চোখ দুটো কালশীটে মেরে কোটরে ঢুকে গিয়েছে, গাল দুটো গিয়েছে চুপ্‌সে, মাথার চুল রুক্ষু—” বলে বসু তাকিয়ে রইল একদৃষ্টে নিমাইয়ের পানে।

মানুষের কৃত কর্ম্মের ফলাফলের প্রত্যক্ষ পরিচয় পেয়ে নিমাইয়ের মন বেদনা ভারাক্রান্ত; বুকটা তার অহেতুক হু হু করে জ্বলছে, সেইজন্য তার মুখ দিয়ে কথা বেরুল না। সে মাত্র

একবার অসহায় ভাবে বসুর দিকে তাকাল। তাকে নির্ব্বাক থাকতে দেখে বসু পূর্ব্বের মতোই বললে,—"আবার বাইরে রাত কাটাতে সুরু করলে কেন?" বলে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল ত্বরিৎ পদে।

যেজন্য বাইরে রাত কাটিয়েছি—নিমাইয়ের চীৎকার করে বলতে ইচ্ছে গেল—তা' যদি তোমাকে বলি বসু, তবে হয় তো এখনই তুমি মূর্চ্ছা যাবে।...

নিমাই অজ্ঞাতসারে তার বুক-পকেটটা চেপে ধরলে; কেননা সে আগে থেকে ঠিক করে রেখেছিল যে ভোলানাথ ভাদুড়ী প্রদত্ত চিঠিগুলো রেখে দিতে; এমন ভাবে, যেন বসু কোনো দিনও টের না পায়। আর লেফাফায় আঁটা যে চিঠিখানা বসুকে দিতে বলে গিয়েছে, সেটাও লুকিয়ে রাখবার মনস্থ করেছিল সে। কেননা, বসু যার কথা বা যে-ঘটনার কথা প্রায় ভুলে এসেছে, নতুন করে সেটা ওর মনে জাগিয়ে দিয়ে পরবর্ত্তী জীবনকে দুঃখময় করে তোলা সমীচীন নয়। ওর বুক এখনও ভোগের আশায় পরিপূর্ণ।

কাপড় জামা পাল্টিয়ে নিমাই আয়নার কাছে দাঁড়িয়ে মাথা আঁচড়াচ্ছে, বসু জলখাবার নিয়ে ঘরে ঢুকলো। নিমাই চমকে উঠল অস্বাভাবিক রকম; কেবলই তার মনে হচ্ছে যে—তার সর্ব্বাঙ্গে গত কালকের ঘটনাটা যেন লেখা আছে, বসু দেখে ফেলছে। মানুষের মন কি সাংঘাতিক জিনিষ! নিমাই ভাবল—এত

কাছাকাছি থাকা সত্ত্বেও একটা শোকান্তকর ঘটনা স্বচ্ছন্দে তার মধ্যে লুকিয়ে আছে!....

বসু জলখাবার রেখে চলে গিয়েছে ঘর থেকে, নিমাই বেতের চেয়ারে বসে ধীরে ধীরে জলযোগ করতে করতে ভাবতে লাগল,—সত্যিই যদি বসুর বিয়ে হতো ভোলানাথ ভাদুড়ীর সঙ্গে, তবে বসুকে আজ হতে হতো বিধবা! এতক্ষণ হয়ত বুক চাপড়ে বসু কান্নাকাটি করতো; মাথা খুঁড়ে কপালই ফাটিয়ে ফেলতো হয় তো!

"বসু—" অন্যমনস্কভাবে নিমাই ডাকল—কেন, তা' সে-ই জানে।

বসু তৎক্ষণাৎ এলো তো না-ই, সাড়াও দিলে না। নিমাই আবার মন দিলে জলযোগে।

"কেন—" প্রায় পাঁচ মিনিট পরে বসু ঘরে ঢুকে শান্ত স্বরে বললে; তার পিটটা ভিজে চুলে ছাওয়া, হাতে একটা কাঁচের গেলাস, তাতে সরবৎ— এইটেই সে তৈরী করছিল এতক্ষণ ধরে।

"তুমি বুঝি আমাকে সন্দেহ করো—" কোমল-কণ্ঠে বলে নিমাই শান্ত দৃষ্টিতে বসুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। পরে বললে,—"না; কোরো না আমায় সন্দেহ—" বলে ধীরে ধীরে দৃষ্টিটা বসুর মুখ থেকে নিয়ে দক্ষিণ দিকের জানালা গলিয়ে বাইরে—বহু দূরে অবস্থিত—তাল গাছগুলোর মাথার 'পর নিবদ্ধ করলে।

"বাবুর বুঝি অভিমান হোলো?" বিদ্রূপভরে বলে মুখটা

আঁচল চাপা দিলে বসু: "দেখো, আঁখি ছল ছল—" মুখ থেকে আঁচলটা সরিয়ে নিয়ে বললে আবার,—"অভিভাবক কেউ থাকলে জিগ্যেস্ কোরতো না বুঝি? একটা রাত্তির কোথায় থাকা হ'য়েছিল না হ'য়েছিলে।" বলে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেড়িয়ে গেল বসু।

—বত্রিশ—

এক বোঝা শুক্‌নো পাট কাঠির হঠাৎ বাঁধন কেটে গেলে যেমন এলিয়ে পড়ে, ঠিক সেই রকম মানুষের মনের বাঁধন খুলে গেলে জীবনটা সঙ্গে সঙ্গে হ'য়ে ওঠে বিষময়!···বসে আরাম নেই, শুয়ে শান্তি নেই, আহার বিস্বাদ লাগে, আকাশ বাতাস সমস্ত জগতটাই যেন একেবারে দুঃখে ছেয়ে গিয়েছে; ভবিষ্যতের যত সমস্ত দুশ্চিন্তা এসে ঘাড়ের উপর চেপে বসে অন্তর্দাহকে বাড়িয়ে তোলে সহস্রগুণে: তখন বীণার রাগিণী ভাঙ্গা টিন পেটার শব্দ মনে হয়, পুরুষের কাছে নারী তখন আখের ছিপ্‌রে, নারীর কাছে পুরুষ কুইনিন মিক্সচার—এক কথায় পাগল করে তোলে!

কতকটা এই রকম ভাব হ'য়েছিল বসুর সেদিন দুপুর বেলা।··· নিমাই কাজে গিয়েছে, চিত্তাকে নিয়ে গিয়েছে ঝি। বাড়ীতে সে

একলা। শুয়ে বসে সে শান্তি পেল না; অন্তর তার জ্বলছে হু হু করে। এলোমেলো ভাবে এদিক সেদিক ঘুরলো কিছুক্ষণ; নিমাইয়ের ঘরে এসে বড় আয়নাখানার কাছে গিয়ে দেখে নিলে তার চেহারাখানা একবার; পরে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস মোচন করে পশ্চিম দিকে জানালার কাছে গিয়ে তার উপর দু'হাতের ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো—পাখা-মেলা-প্রজাপতির মতো। শরতের শান্ত সমীরনে তার মাথার অবিন্যস্ত চুলগুলো যদেচ্ছা ভাবে উড়ছে; মাঝে মাঝে কুঁচো চুলগুলো আছাড় খেয়ে পড়ছে তার মুখের 'পর, সেদিকে তার খেয়াল নেই; সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে। দেখছে সে,—অনতি দূর দিয়ে এক কাঁকাল ভাঙ্গা লোল চর্ম্মসার বৃদ্ধা ইন্ধনের বোঝা মাথায় নিয়ে চলেছে আপন মনে গান গাইতে গাইতে।···কিছুক্ষণ পরে এক সন্ন্যাসী উদাস ভাবে আড় বাঁশী বাজিয়ে চলেছে: বিবর্ণ ছিন্ন-গৈরিক-বসন সন্ন্যাসীর পরনে, মাথায় রুক্ষ কটা চুল, সারা অঙ্গ ধূলায় ধূসর; তার একদিকে ঝুলছে কাষ্ঠ কমুণ্ডলি।···জাগতিক যন্ত্রনা কি ভাবে এড়ানো যায়, সেই কথটাই যেন সে শুনিয়ে যাচ্ছে বাঁশীর সুরে। যেন বলছে, ওরে বেড়িয়ে আয়, বেড়িয়ে আয়।···ওরে অসহায় মানুষ সুখান্বেষণে মাথা খুঁড়ে মরিছস্ কেন সংসার মাঝে—বেড়িয়ে আয়। এসে পথে-পথে বনে-জঙ্গলে, পাহাড়-পর্ব্বতে ঘুরে বেড়া—আসল জিনিষটির সন্ধান পাবি।···সন্ন্যাসী গিয়ে বসল বহুদূরে অবস্থিত বটগাছটার মূলে।····

বসুর চোখ দিয়ে ঝর্ ঝর্ করে জল পড়লো কেন, তা সেই জানে।... ছুটে গিয়ে আছাড় খেয়ে পড়ল নিমাইয়ের বিছানাটার 'পর। সে আজ এই কথাটাই ভাবছে যে,—তার এই অনিশ্চিত অবাঞ্ছিত জীবনের অবসান হ'বে কবে?—যে-জীবনের বাঁধন দৃঢ় নয়, যেখানে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই—সেখানে একদিন, দুদিন—কিছুদিন চলতে পারে; কিন্তু অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য কি করে সম্ভব? মানুষের জীবনই হ'চ্ছে দেওয়া নেওয়ার ব্যাপার। আর এর মধ্যেই থাকে কর্ত্তব্য। এই পরস্পরের প্রতি কর্ত্তব্যই মানুষকে বয়ে নিয়ে যায় প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত। সংসারে বাঁধনহারা জীবন, জীবন নয়,—উল্কা। সকলের অগোচরে অছাড় খেয়ে পড়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হ'য়ে যাবে একদিন!

•

সন্ধ্যা বেলা রান্না শেষ হ'য়ে যেতেই বসু গিয়ে শুয়ে পড়ল তার বিছানায়। অন্যান্য দিন নিমাইয়ের সঙ্গে বসে বই পত্তর পড়ে কিংবা গল্প স্বল্প করে। কিন্তু আজ তার সে-শক্তি নেই।

নিমাই বসে বসে বই পড়ছিল। রাত্রি তখন প্রায় ন'টা বেজে গিয়েছে। পেটের ভিতর থেকে ক্ষুধার তাড়া আসতেই বই বন্ধ করে উঠে পড়ল সে। পা টিপে টিপে সে এলো বসুর ঘরের সামনে।

বসু কাঁদছে। শুনতে পেলে নিমাই। সে থ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। ডাকবে-কি-ডাকবে-না তাই সে চিন্তা করছে

লাগল—এক হাত দিয়ে কপাল খুঁটতে খুঁটতে। বেশ একটু বিচলিত হ'য়ে পড়ল সে। বসুর অসুখ বিসুখ করেছে কিনা এই কথা ভেবে! ব্যস্ত ভাবে নিঃশব্দে পায়চারী করলো বারান্দাটার এমাথা থেকে ও মাথা।···বসু আঁচলে নাক ঝারলো; সে শব্দ শুনে নিমাই দোরগোড়ায় থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো, বসুর কি হ'য়েছে জিজ্ঞাসা করবার জন্য।

"বসু, তোমার শরীর ভালো—" জিজ্ঞাসা করলে নিমাই ব্যথিত স্বরে।

বসু সাড়া না দিয়ে উঠবার চেষ্টা করতেই, নিমাই ব্যস্ত ভাবে বলে।উঠলো,—"থাক্, থাক্; তোমার উঠতে হবে না, আমি নিজেই নিয়ে খাচ্ছি—"

বসু নিমাইয়ের কথা শুনে আবার শুয়ে পড়লো। নিমাই চলে গেল রান্না ঘরের দিকে। নিজের জন্য আসন পেতে জল গড়িয়ে, সে বসল ভাত বাড়তে। বসে, পড়ে গেল সে মহামুস্কিলে। নিজের খাবার জন্য কতগুলো ভাত নেবে সে ঠিক করে উঠতে পারল না। সে ভাবল,—যাই; যাই না-হয় বসুকে জিগ্যেস করে আসি, কতগুলো ভাত নেবে। ভাত যদি বেশী হয়, আর তা' ফেলা যাচ্ছে যদি দেখে বসু কাল সকালে, তবে বকুনি খেতে হ'বে। আর যদি কম হয়, তবে মাঝ রাত্তিরে পাবে ক্ষুধা—ঘুম হ'বে না শেষ কালে!—

এমন সময় শুনতে পেলে সে বসুর পায়ের শব্দ। বসু

আসছে—তার সেমিজের ওপর কাপড়খানা বাগিয়ে পরতে পরতে ; পিছনে লুটচ্ছে তার লম্বা আঁচলখানা। বসু ঘরে ঢুকতেই নিমাই ত্রস্তে গিয়ে তার আসনে চুপ্‌টি করে বসে নতমুখে নাকের ডগাটা খুঁটতে লাগল।

বসু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাপড়খানা পরলে ; পরে রাশিকৃত এলো চুলগুলো খোঁপা বাঁধলে। তারপরে আঁচলখানা গায়ে জড়িয়ে হাত ধুয়ে ভাত বাড়তে বসল।

নিমাই ভাত খাচ্ছে বসু সামনা সামনি বসে আছে। খাওয়া যখন প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে, তখন বসু মুখ নীচু করে পায়ের নোখ খুঁট্‌তে খুঁট্‌তে ডাকল,—"নিমুদা—"

"উঁ—" সাড়া দিয়ে চেয়ে রইল বসুর মুখের দিকে।

"কিছুদিন ছুটী নাও না—"

"কেন—"

"বেশ দিন কতক দেশ বেড়িয়ে আসা যায় তাহালে—"

"কোথায় কোথায় যাবে বলো, সেই বুঝে ছুটীর দরখাস্ত কোরবো—"

এ-প্রশ্নের জবাব বসু দিতে পারলে না। তার মন যেন বোলতে চাইলো,—সমস্ত দেশটা, সমগ্র ভারতের প্রতি ঘরে ঘরে, বনে জঙ্গলে।

পূজোর ছুটীতে নিমাই বসুকে নিয়ে দেশ ভ্রমণে বের হ'লো। আগ্রা, অমৃতসর, অজন্তা দেখে তবে ফিরবে। তাদের সঙ্গে আছে বিশ্বাসী বন্ধু রামদহিন্।

পাটনা থেকে আগ্রা যাবার পথে—মাঝখানে এক তীর্থস্থানে নেমেছে তারা; একটা দিন সেখানে থেকে আবার রওনা হবে তাই ঠিক হলো। অবশ্য বসুর নির্দ্দেশ মতোই এখানে অবতরন করতে নিমাইকে বাধ্য হ'তে হয়েছে; নইলে তার মত মোটেই ছিল না এখানে নামবার। অত্যধিক যাত্রী সমাগমের জন্য তাদের আশ্রয় নিতে হ'য়েছে গাছতলায়।

সকাল বেলা। বসু রামদহিনকে সঙ্গে করে মন্দিরে পূজা দিতে গিয়েছে, নিমাই জিনিষ পত্তর আগলে বসে আছে; বসে আছে সে একটা গাঁটুলির 'পর হেলান দিয়ে অর্দ্ধশায়িত ভাবে—নিশ্চিন্ত মনে। এমন সময় একটা বেহারা এসে তাকে এক খণ্ড কাগজ দিলে। সেটা একটা চিঠি। চিঠিটায় চোখ বুলিয়েই নিমাই বেত্রাহতের মতো—চমকে খাড়া হ'য়ে বসলো। বসে স-শঙ্কিত ভাবে একবার চারদিক চেয়ে নিলে।

চিঠিটা দিয়েছে চয়ন; নিমাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে চায়। তার মামার সঙ্গে সেও এসেছে দেশ-ভ্রমণে। নিমাইদের সে লক্ষ্য করেছে অনেক আগেই। বসুকে সে চিন্‌তে তো পারেইনি,

উপরন্তু ও নিমাইয়ের কে যে হ'তে পারে তাও সে ঠিক করে উঠতে পারেনি। সে যতদূর জানতো—নিমাই তাকে জানিয়েছিল সব কথা—যে, নিমাইয়ের কোনো আত্মীয় স্বজন নেই; অন্ততঃ বোন বৌদি এসব তো নেই-ই।···চয়ন মনে মনে একথাটাও ভেবেছে—নিমাই তা' হলে তাকে ফাঁকি দিয়ে বিয়ে করেছে নাকি? এই ধারণার বশবর্ত্তী হ'য়ে তার মাথা দিয়ে চিন্তার ঝড় বেয়ে চলছে—কি হ'তে পারে! সম্ভব অসম্ভব ইত্যাদির চিন্তায় সে তার মন করে তুলল তোলপার। সে আগে থেকেই নিমাইয়ের প্রতি চটে ছিল। তার উপর এই অবস্থা দেখে সে মনের স্বাভাবিক অবস্থা ফেললে হারিয়ে। সুযোগ বুঝে সে ডেকে পাঠালে নিমাইকে। লোক পাঠিয়ে দিয়ে চয়ন কিছুদূরে একটা গাছের আড়ালে ইতঃস্ততঃ বিচরণ করতে লাগল অস্বস্তিকর ভাবে।

নিমাইয়ের মধ্যে নিমাই আর নেই। চয়ন যে-সমস্ত প্রশ্ন তাকে করতে পারে, তার প্রথম এবং প্রধান হচ্ছে—বস্তু তার কে? সে ভাবলো,—জীবনে মিথ্যা কথা বলা অভ্যাস না করে কি বোকামিই করেছে। বস্তুর সঙ্গে সত্যকারের সম্পর্কটাও বলা যায় না; না যাবার একমাত্র কারণ,—ওই সপ্তকাণ্ড রামায়ণ বর্ণনা করবার মতো তার শক্তি নাই, আর বাঞ্ছনীয় তো নয়-ই। মিথ্যা কথা বলতে গেলে অদৃশ্য লোক থেকে তার টুঁটিটা চেপে ধরে। তারপর দ্বিতীয় প্রশ্ন,—চয়ন যদি বিয়ের কথা পাড়ে এবং

খুড়া

অভাবনীয় রকম বিলম্বের যুক্তি সঙ্গত কারণগুলি যদি জিজ্ঞাসা করে সামনা সামনি, তবে বোবা সেজে বসে থাকা ছাড়া কোনো উত্তর দিতে পারবে না।

'চুরির দায়ে ধরা পড়া' গোচের হয়ে কম্পিত পদে শঙ্কিত চিত্তে সে চয়নের দিকে অগ্রসর হলো।

মানুষের অন্তরে যখন দ্বন্দ্ব চলতে থাকে—তখন তাকে কি অসহায় না করে তোলে! তখন তার নিজের মাথা ঘারের উপরও প্রভুত্ব করবার শক্তি থাকে না।···মাথা কি ভাবছে, মুখ কি বলছে, কাণ কি শুনছে—কিছুই ঠিক করবার শক্তি থাকে না। ঘড়ির স্প্রিং কেটে গেলে যেমন সমস্তগুলো কিছুক্ষণের জন্য আপনা আপনি গোলমেলে ভাবে ঘুরে যায়—এও ঠিক সেই রকম। আগে আগে চয়ন ও নিমাই পরস্পরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে হস্ত-চুম্বন বিনিময় করতো। কিন্তু এখন নিমাই চয়নের সামনে হাজির হয়ে দু' হাত জোড় করে মাথা নুইয়ে এমন ভাবে একটী নমস্কার করলে, যেন জজের সামনে খুনী আসামী!—

"আপনি—এই—তু—" জড়িয়ে ফেল্লে নিমাই কথাগুলো; সে কোনো রকমে মুখের মধ্যে হাঁসি টেনে এনে সম্বোধন করতে যাচ্ছিল চয়নকে 'আপনি' বলে; কিন্তু ইতিপূর্ব্বেই তারা পরস্পরে 'আপনি আজ্ঞে'র পর্য্যায় পার হ'য়ে গিয়ে 'তুমি আমি'-তে পৌঁছেছিল, সেটা মনের মধ্যে হঠাৎ উদয় হ'য়ে গেল।

"বেড়াতে বেড়িয়েছেন বুঝি—" চয়ন মনের ভাব আপাতত

চেপে রেখে, সাধারণ পরিচিতের মতো ভদ্রতার হাঁসি টেনে এনে জিজ্ঞাসা করলে।

"হ্যাঁ। তারপর—" হাতে হাতে ঘষতে ঘষতে দেঁতো হাঁসি হেঁসে চয়নের মুখের দিকে চেয়ে কি-যেন বলতে চাইলে নিমাই।

"কোথায় কোথায় যাবেন ঠিক করেছেন—" নিমাইয়ের কথা আটকে যেতেই চয়ন পুনরায় প্রশ্ন করলে।

"এখান থেকে বরাবর আগ্রা যাবো; তারপরে অমৃতসর, ওখান থেকে অজান্তা গুহা দেখে ফিরবো—" কিছুটা প্রকৃতিস্থ হ'য়ে স্বচ্ছন্দ্য ভাবে বললে নিমাই।

"ওঃ—" সহজ হাঁসি হেঁসে চয়ন বললে,—"ভালো ভালো জায়গায় যাচ্ছেন তো; সঙ্গে নেবেন নাকি?

"কোনো আপত্তি নেই—" হিমালয় পর্ব্বত-প্রমাণ আপত্তি অন্তরে চাপা রেখে নিমাই সম্মতি জানালে। যদিও আলাপ আলোচনার ধারাটাই তাদের কাণে বাজছে, তবু তারা আরো কিছুক্ষণ ধরে ভ্রমণ ব্যাপার নিয়ে গল্প করতে লাগল। নিমাইয়ের হৃৎস্পন্দন কিন্তু বেড়েই চলেছে;—এই বুঝি বেরুলো চয়নের মুখ থেকে আসল কথাটি!

"বাবু—মা দাকচে শীগিরি চলো—" বলতে বলতে চিতা ছুটে এসে নিমাইকে জড়িয়ে ধরলে।

চিতা নিমাইকে ডাকলে 'বাবু', চয়ন শুনল 'বাবা'।

চয়নের সামনে চিতার সম্বোধন শুনে, নিমাই যেন মূর্চ্ছা যাবার উপক্রম হ'লো। তার কাণ দিয়ে আগুন বেরুচ্ছে, দেহের সমস্ত রক্তগুলো জড়ো হ'য়েছে মুখের মধ্যে, নীচের ঠোঁটটা জোড়ে দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে আছে সে।

চয়ন ঠিক করে নিলে যে,—সে যা ধারণা করেছিল, তাই সত্য।...মেঝেয় খানিকটা স্পিরিট ছড়িয়ে দিয়ে তার এক প্রান্তে দেশালাই কাটি জ্বেলে দিলে যেমন চকিতে সমস্ত স্পিরিটটায় আগুন ধরে যায়, তেমনি চয়নের শিরার তাজা রক্তগুলো জ্বলে উঠলো। প্রস্তর মুর্ত্তির মতো দণ্ডায়মান নিমাইকে চয়ন তার জ্বলন্ত চোখের দৃষ্টি দিয়ে বার কয়েক আপাদমস্তক দেখে নিলে।

"মানে—?" চোখ মুখ সঙ্কুচিত করে চয়ন প্রশ্ন করলো নিমাইকে দৃঢ় স্বরে!

মানে? মানে এর খুঁজে পাবে না পৃথিবীর কোনো অভিধানে, চয়ন।...তবে মানুষের অলিখিত ইতিহাসে এরকম নজীর ঢের ঢের মেলে বটে।—কথাগুলো নিমাইয়ের বলতে ইচ্ছে হ'লো গলা ফাটিয়ে চীৎকার করে; কিন্তু সে বাক্‌শক্তিহীন।

"ও—তাই বুঝি—" চয়নের মাথার মণিকোঠা পর্য্যন্ত আগুন পৌঁছে গিয়েছে; তাই সে এক অদ্ভূত বিদ্রূপ স্বরে বলতে লাগলো,—"তাই বুঝি আমাকে নিয়ে পুতুল নাচ নাচানো হ'চ্ছিলো? ধাপ্পাবাজি কোরে?" কথাগুলো হাঁপাতে হাঁপাতে বলে কয়েক মুহূর্ত্ত চুপ করে থেকে পুনরায় সে নিমাইকে দেখে

নিলে বার কয়েক আপাদমস্তক।....দিলে, দিলে! চয়ন তার জ্বলন্ত দৃষ্টি দিয়ে ব্যাচারা নিরপরাধী নিমাইকে পুড়িয়ে ছাই করে দিলে! ...

"আপনি আচ্ছা বিশ্বাসঘাতক তো!" ঘৃণায় অস্বাভাবিক রকম মুখের ভাব করে; ততোধিক ঘৃণাভরে চয়ন নিমাইকে কষাঘাত করতে লাগল,—"আপনি এত নীচ, হীন, ঘৃণ্যেয়?..... একটা নারীর জীবনকে ছারখার করে দিতেও এতটুকু দ্বিধা জন্মেনি আপনার মনে? ছি ছি ছি।....গলায় দড়ি বেঁধে মরুন গে—" বলে ঝটিতি সেখান থেকে অদৃশ্য হ'য়ে গেল।

কতক্ষণ কি ভাবে নিমাই দাঁড়িয়ে ছিল, তা' তার স্মরণ হয় না। হতভম্ব শিশু চিত্তার দ্বিতীয় ডাকে তার চেতনা ফিরে আসতে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চিত্তার মাথায় হাত বুলতে লাগল; পরে তাকে বুকে তুলে নিয়ে পা বাড়িয়ে দিলে সামনের দিকে।

—চৌত্রিশ—

মাসখানেক পরে।

চয়ন তার চন্দননগর বাড়ীতে ফিরে এসেছে দেশ বেড়িয়ে। পাড়ার সমবয়সীরা এসে তাকে ওই সমস্ত দেশের গল্প বলতে বলে।

কিন্তু দু' একটী প্রশ্নের জবাব দেওয়া ছাড়া যে-সমস্ত দেশ সে দেখে এসেছে সে সমস্ত দেশের বর্ণনা করা তো দূরের কথা, তার ঠিক ঠিক স্মরণও হয় না কোথায় কোথায় গিয়েছে। কারণ নিমাইয়ের সঙ্গে পথে দেখা হওয়ার দিন থেকে এপর্য্যন্ত তার মনের মধ্যে তুমুল ঝড় অহর্নিশি চলেছে বয়ে।

স্নানাহার সে এক রকম করেছে ত্যাগ। কেবল বিছানায় শুয়ে বালিশে মুখ গুঁজে পড়ে থাকে; তার ঝি-মা কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করতে এলে, বুড়িকে এক রকম দেখিয়ে দেয় বিরক্তি ভাব।

সেদিন চয়ন ছাদের উপর আলসেতে ভর দিয়ে আপন মনে দাঁড়িয়ে আছে এমন সময় বুড়ি নিঃশব্দে এসে চয়নের ঘাড়ে একটা হাত রেখে সস্নেহে জিজ্ঞাসা করলে,—"হ্যাঁ-রে দিদি, কি হ'য়েছে না হ'য়েছে—আমাকে যদি না বোলবি তো বোলবি আর কাছে তাই শুনি—?"

"আমাকে কি তুমি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারতে চাও?···এরপর থেকে আমাকে জ্বালাতন কোরতে এলে তোমার পায়ে মাথা খুঁড়ে রক্তারক্তি কোরবো বোলে দিচ্ছি—" চয়ন জল-ভরা চোখ দুটো লুকিয়ে বিরক্তি ভাবে বলল।

অপরাধ হয়েছে বাছা, আর অসবো না—' বলে ক্ষুণ্ণ মনে বুড়ি চলে যেতে উদ্যত হলো।

"তাহালেই আমি বাঁচি—"

এটা স্বাভাবিক। মানুষ আপন মনে আশার আকাশস্পর্শী যে প্রাসাদ গড়ে তোলে, তা' যদি একটা ঝোরো হাওয়ায় ভেঙ্গে চুড়মাড় হ'য়ে যায়, তবে তা' রক্ত মাংসের দেহের পক্ষে সহ্য করা খুব সহজ নয়, আর নয় বলেই তাকে করে তোলে, অন্তত সাময়িক ভাবে, পাগল।

চয়ন নীচে নেমে এসে একখানা ছোট্ট চিঠি লিখলে নিমাইকে—

শ্রদ্ধাস্পদেষু, —

কেন, জানি না। বোধ হয় না জেনে শুনে আপনার মনে কষ্ট দেওয়ার জন্যই অহরাত্র বৃশ্চিক দংশনের জ্বালার মতো জ্বালা অনুভব করছি। এ ভাগ্যহীনাকে মনে প্রাণে ক্ষমা করে ধন্য কোরবেন কি? পত্রের আশায় উম্মুখ হ'য়ে রইলাম। ইতি—

চয়ন

চিঠিখানা তখনই রেজেষ্ট্রী করে পাঠাবার বন্দোবস্ত করে বেলা প্রায় দুটোর সময় স্নানাহার করল চয়ন। তার শুয়ে বসে কোথাও বেড়াতে গিয়ে শান্তি নেই। তাই কিছুক্ষণ ধরে অব্যবস্থিত ভাবে ঘোরা ফেরা করল উপরে। পরে কয়েকবার গা আড়ামোড়া ভেঙ্গে নিজে নিজেই কপালে হাত দিয়ে, নাড়ী পরীক্ষা করে সে অনুভব করল যে তার জ্বর আসছে। বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লো।

সন্ধ্যা হ'য়ে গিয়েছে। ঝি-মা ঘরে সন্ধ্যা দেখাতে এসে চয়নকে

শুয়ে থাকতে দেখে ব্যস্তভাবে বললে,—"ওরে চায়না, ভর-সন্ধে বেলা শুয়ে থাকতে নেই, ওঠ না—"

চয়ন ঝি-মায়ের ডাক শুনে বার কয়েক গলা কাঁপিয়ে হোঁ হোঁ শব্দ করে পাশ ফিরে শুলো। জ্বর খুব বেগে এসেছে।

"কি হোয়েছে রে—" বৃদ্ধা ঝি-মা নাতিনীর অবস্থা দেখে ব্যস্ত-ভাবে কাছে গিয়ে চয়নের কপালে হাত দিয়ে সবিস্ময়ে বললে,—"ওমা! গা যে পুড়ে যাচ্ছে চয়ন; আবার জ্বর কোরে বসলি—" বৃদ্ধা অতি মাত্রায় চিন্তিত হ'য়ে চয়নের গায়ে হাত দিয়ে পরীক্ষা করতে লাগল।

"আমার ! চিঠি এসেছে, চিঠি—" জ্বরের ঘোরে চয়ন বললে।

"কার চিঠি ? কই, চিঠি পত্তর তো কিছু আসেনি—"

"এলেই আমাকে দিয়ে যাবে তক্ষুনি—" বলে চয়ন জ্বরে হোঁস্ ফোঁস্ করতে লাগল।

"জানি না বাবা—" ঝি-মা বিরক্তি ভাবে বললে,—"সময়ে নাওয়া খাওয়া না করে এই বিপত্তি টেনে নিয়ে এলি, আবার কত দিনে সারবে ভগবানই জানে। দেখি, জগু ডাক্তারের কাছে লোক পাঠাই—" বলে বেড়িয়ে গেল।

চার দিন পরে এলো নিমাইয়ের চিঠি। এই চার দিন চয়নের অবস্থা একই ভাবে কেটেছে। চিঠিখানা হাতে পেয়েই তাড়াতাড়ি লেফাফা ছিঁড়ে ফেললে—

মাননীয়া চয়ন দেবী,—

আমার মতো বিশ্বাসঘাতকের কাছে আপনি ক্ষমা চেয়ে আমাকে লজ্জিত করেছেন। কেননা, আমিই দোষী; সত্যিই আমি অপনার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছি। তবে ঠিক আমি নই; আমার অবাধ্য মন। যাক্, সে সব অন্য কথা। ক্ষমা আমি অপনাকে নিশ্চয়ই কোরতাম, যদি সত্যি সত্যিই আপনি আমার কাছে কোনো ত্রুটি কোরতেন; আসলে আপনি যে আমার কাছে কোনো অপরাধ করেছেন তা তো আমার মনেই হয় না, সেই জন্য ক্ষমা করার কথা আসতেই পারে না।

এখন, আপনি বিশ্বাস করুন, আমি আপনার কাছে কৃতাঞ্জলি-পুটে এই নিবেদন জানাচ্ছি যে, আপনার জীবনে আমার মতো একজন ঘৃণ্যেয়, নীচের একদিন আবির্ভাব হ'য়েছিল—এই কথাটাই একেবারে মন থেকে মুছে ফেলুন।

আপনি মহীয়সী। তাই, এই আজন্মভাগ্যহীনকে আন্তরিক ক্ষমা করলে আমার পরবর্ত্তী জীবনটা হয়ত শান্তিতে কাটতেও পারে।

আমি চাই অপনার আমার মধ্যে পত্রালাপ এই খানেই হোক ইতি —

নিমাই সান্যাল

চিঠিখানা পড়া শেষ করেই ধড়াস্ করে বিছানায় শুয়ে কাটা-ছাগলের মতো ছট্ ফট্ করতে লাগল। খুব খনিকটা কেঁদে চোখ

মুখ লাল করে ছুটে বেড়িয়ে এলো বারান্দায়। ডাকলে,—"ঝি-মা শীগগীর একখানা টেলিগ্রাম ফর্ম আনিয়ে দাও—" বলে আবার গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে কাতরাতে লাগল।

পাশের বাড়ীর একটা ছেলে টেলিগ্রামের ফর্ম এনে দিতেই তার করলে—

Chayan Succumbing ; start at once.

"Jhi-ma"

এক শ' চার ডিগ্রী জ্বরে চয়ন যখন বে-হুঁস হ'য়ে পরে আছে, তখন নিমাই এলো।···চয়ন তার জ্বরের তারশে ঘোর লাল চোখ দুটো একবার মাত্র খুলে নিমাইকে কিছুক্ষণ দেখে নিয়ে মাত্র দুটি কথা সে বলেছিল জিভ দিয়ে শুক্‌নো ঠোঁট দুটো একবার চেটে নিয়ে: "ও, এসেছ—" ব্যাস্। এর পর সমস্ত দিন গিয়েছে, রাত্রিও প্রায় দ্বিতীয় প্রহরে অবতীর্ণ হ'তে চলল, এর মধ্যে চয়ন আর তৃতীয় কথা বলা তো দূরে কথা—চোখ মেলে তাকায়নি পর্য্যন্ত। তারে ঝি-মা জল-পটি দিতে দিতে একবার যখন উঠে গিয়েছিল নিমাইকে দিয়ে, সেই সময় চয়ন নিমাইয়ের হাতটা নিয়ে খুব জোরে তার মুখের মধ্যে চেপে ধরেছিল—প্রায় পাঁচ সাত মিনিট ধরে। তার সেটা স-জ্ঞানে কি অজ্ঞানে তা' একমাত্র সে-ই জানে। নিমাই হাত সরিয়ে নেবার চেষ্টা করেনি; চয়ন নিজেই ছেড়ে দিয়েছিল—তার গরম শুক্‌নো ঠোঁট দুটো দিয়ে একটা চাপ দেওয়ার পর।

নিঃশব্দ পল্লীটি শান্ত-শর্ব্বরীর আবরণে আচ্ছাদিত। স্রেফ, অনেক দূর থেকে—হারমোনিয়মে অপটু গলার সা-রে-গা-মা সুর সাধার শব্দ হেমন্তের ফিন্ ফিনে বাতাস ক্ষীণ ভাবে বয়ে নিয়ে আসছে।··· ঘর থেকে জানালার ভিতর দিয়ে দেখা যায়—শুক্লা চতুর্থীর এক ফালি রাঙা কুমড়োর মতো চাঁদখানা ধীরে ধীরে নীচে নেমে বহুদূরে অবস্থিত একটা ঝাঁপ্‌রি ঝুঁপ্‌রি আম গাছের অন্তরালে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। প্রায় দু'মাইল দূরে—দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে—চন্দননগর ষ্টেশনের বৈদ্যুতিক আলোর আভায় আকাশের অর্দ্ধপথ আলোকিত।···ঘরের এক পাশে পিল্‌সুজের 'পর প্রদীপটা জ্বলছে মূলা নক্ষত্রের মতো, তারই ম্লানালোকে ঘরটি গ্রিয়মান।···দেওয়ালে কয়েকটা টিক্‌টিকি আহারান্বেষনে ইতঃস্ততঃ ঘুরতে ঘুরতে শব্দ করছে—টিক্ টিক্ টিক্···

চয়নের জ্বর ছেড়ে এসেছে প্রায়—সে নিঝুম হ'য়ে শুয়ে আছে। তার কাছেই খাটের পাশে একটা চেয়ারে বসে আছে নিমাই। মাঝে মাঝে তার দু'টি চক্ষু হ'য়ে পড়ছে তন্দ্রাচ্ছন্ন।

"উঃ, বাবারে—বুকটা একেবারে ভেঙ্গে দিয়েছে; কি নিষ্ঠুর—" জড়িত ও ব্যথিত স্বরে চয়ন কথাগুলো বলে নিমাইয়ের দিকে পিছু করে পাশ ফিরলে।

নিমাই চমকে উঠল চয়নের কথায়। হাতে পাখাটা নিয়ে সে এতক্ষণ অন্যমনস্ক ভাবে নাড়াচাড়া করছিল - এবার কিছুক্ষণ চয়নের মাথায় হাওয়া করলে। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সে

ঘুড়ী

ভাবল,—মরীচিকার পশ্চাধ্বাবন করে কেন সে একটা জীবনকে অমানুষিক ভাবে যন্ত্রণা দিচ্ছে ? বন্ধুকে সে ভালোবাসে ; কিন্তু প্রতি দানে এ পর্যান্ত নির্লজ্জ স্বার্থপরতা ছাড়া ভালোবাসার ক্ষীণ আভাসও সে পায়নি বন্ধুর কাছে থেকে। কিন্তু চয়ন প্রাণ মন দিয়ে তাকে ভালোবাসে এপ্রমাণ যথেষ্ট সে পেয়েছে।

নিমাই হয়ত জানে না,—সত্যিকারের ভাল যারা বাসতে পারে বাস্তব ক্ষেত্রে তাদের আঘাত অনিবার্য্য। সে ভালবাসা দিগ্বীজয়ী বীরের মতো ভেতরে ভেতরে মনরাজ্য দখল করে ; কিন্তু লোক-লজ্জা চক্ষুলজ্জা আশু সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মোহ প্রভৃতি দানবিক প্রবৃত্তিগুলো সাময়িক ভাবে সেই সত্যের ঘাড়ে পা দিয়ে ডুবিয়ে রাখতে চায়। কিন্তু, সে-ভালবাসার কমল শৈল-দল প্রভৃতি শত আবিলতার মাঝে—একদিন, অলক্ষ্যে—ধীরে ধীরে পাপড়ি মেলে প্রস্ফুটিত হ'য়ে চারিদিক আলোকিত করে তলে ; ঘুচে যায় সেদিন মনের কোণের অন্ধকার।

নিমাই পারলে না ; শত চেষ্টা করেও সে তার মনের মোড় ঘোরাতে পারলে না। বন্ধু তার বুক জুড়ে বসে আছে ; তাকে অস্বীকার করতে গেলেই তার টুঁটিটা কে যেন চেপে ধরে ; মুখ খোলে, কিন্তু রা বে'র হয় না। সে যেন স্বপ্নে দেখেছে—বন্ধুর বোঝা তাকে আজীবন বয়ে বেড়াতে হবে।—হ্যাঁ, নিঃস্বার্থ ভাবেই !...

জানালা দিয়ে ঝির্ ঝিরে হাওয়া এসে চয়নের মাথায় লাগছে-

দেখে নিমাই হাওয়া করা বন্ধ করে ধীরে ধীরে উঠে বেড়িয়ে গেল ঘর থেকে; গিয়ে বারান্দায় একটা ক্যাম্বিসের আরাম কেঁদারায় ক্লান্ত, তন্দ্রাতুর দেহখানা এলিয়ে দিলে।

…পূর্ব্ব-দক্ষিণ-পশ্চিম—বহুদূর পর্যান্ত প্রসারিত নিবীড় অন্ধকার নীরবে নিদ্রা যাচ্ছে!…ঘর-বাড়ী, গাছ-পালায় অন্ধকার জমে গাঢ় করে তুলেছে আঁধিমাকে। মসীলিপ্ত আকশটার একদিকে কাল-পুরুষের করাল মূর্ত্তি দেখলে সর্ব্বাঙ্গ শিউরে ওঠে! হীরা-জহর-পান্না-মনি-মুক্তা সম কোটি কোটি জ্যোতিষ্করাজি নীলিমার সারা অঙ্গে শোভা পাচ্ছে।…সির্ সির্ সির—নারকেল গাছের পাতাগুলোর উপর দিয়ে বাতাসের তরঙ্গ ব'য়ে গেল।…পাশের আম গাছটার অন্তরাল থেকে একটা পাখীর পালক ঝাড়ার শব্দ…। হঠাৎ…কয়েকটা পেঁচার তীক্ষ্ণ চীৎকার কাণে এসে ঢুকতেই নিমাই চমকে উঠলো।…বহু পূর্ব্বেই তার তন্দ্রা ছুটে গিয়েছে।…তার চোখ দুটো জ্বলছে; সে-জ্বালা বাড়িয়ে তুলল—হাওয়া ঢুকে।…রেল ষ্টেশনে জয়নিং কাটিং-এ রত মাল গাড়ীর শব্দ ভেসে আসছে বাতাসে মাঝে মাঝে—ভোঁস্ ভোঁস্ ভোঁস্—ধমাম্…

চয়নের ঘুম ভেঙ্গে যেতেই উঠে বসল বিছানায়।…চারদিক ধীরে ধীরে দেখে নিলে একবার।…প্রদীপটা শুধু জ্বলছে মিট্ মিট্ করে। টিকটিকিগুলোর তখনও ক্ষুন্নিবৃত্তি হয়নি বোধ হয়—টিক টিক টিক্…। নিস্তব্ধ রাত্রিতে এই টিকটিকির ডাক কি

বিরাট শব্দে পরিণত হ'য়ে কাণে বাজে!···একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে চয়ন তার মাথার এলো চুলগুলো খোঁপা বাঁধলে; ঠিক করে নিলে পরনের কাপড়খানা, আঁচলখানা জড়ালে গায়ে।···দেহটা কত হাল্‌কি হ'য়ে গিয়েছে···বড় দুর্ব্বলতা! ধীরে ধীরে নামলে সে মেঝেয়···একটু হ'লেই পড়ে যেত! তাড়াতাড়ি ধরে ফেললে চেয়ারখানা। উঁকি মেরে দেখলে নিমাই বসে রয়েছে বারান্দায়। ধীরে···ধীরে···নিঃশব্দে চয়ন এগুলো নিমাইয়ের দিকে।···পিছুতে গিয়ে দাঁড়াল সে। কান্নায় তার বুক ভরে উঠেছে···এই বুঝি ফেটে বেরুলো!···চাইলে তার প্রাণটা—গলা জড়িয়ে ধরে নিমাইয়ের মুখ চুম্বন করতে···তার প্রশস্ত বুকের মাঝে জ্বর-ক্লান্ত দেহখানা এলিয়ে দিতে···কিন্তু পারলে না।

নিমাই তখনও টের পায়নি—এলোমেলো চিন্তায় তাকে ঘুরপাক খাইয়ে নিয়ে গেছে তাকে কোন্ এক অজানা রাজ্যে!···

চয়ন বসল নিমাইয়ের পা-তলায়—আঁকড়ে ধরলে তার হাঁটুটা···কান্না আর বাধা মানলে না।

একি! তুমি ঠাণ্ডায় উঠে এলে কেন?—নিমাই চমকে উঠে পাশ ফিরে চয়নকে দেখে কথাগুলো যেন বলতে চাইলে; কিন্তু সেগুলো শব্দে পরিণত হল না।···কাঁদুক··· সে ভাবলো।··· নিমাই তার চোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে নক্ষত্র-খচিত-আকাশটায়।

নিমাইয়ের হাঁটুতে কপালটা রেখে চয়ন অঝোরে কাঁদছে—ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে।···বিয়ে কোরেছো, বেশ কোরেছো; তুমি

আমাকে বোললে না কেন?…তার মধ্যে আমিও ঠাঁই করে নিতাম;—কথাগুলো চয়নের বলতে ইচ্ছা হলো চীৎকার করে।

নিমাই অনুভব করলে—একটা অসহনীয় বেদনা তার বুকের ভেতর থেকে বেরুবার চেষ্টা করছে—তাই দমন করবার জন্য সে নীচের ঠোঁটটা দাঁত দিয়ে চেপে ধরলে।… নক্ষত্রের ম্লানালোকে তার চোখ দুটো চক্ চক্ করছে।…এই কি আমি চেয়েছিলাম, প্রভু? নিমাই অন্তর্দেবতাকে জিজ্ঞাসা কোরলে। এ-তো আমি চাইনি মনে-প্রাণে! লোকের চোখের জল আমার গায়ের রক্ত, একথা তো তুমি জানো, অন্তর্য্যামী? কেন তুমি আমার বুকে বল দিচ্ছ না, মুখে ভাষা ফোটাচ্ছ না—সত্য কথাটা বলবার?… নারীর চোখের জলে আমার পা ধূয়ে যাচ্ছে,—এ যে আমার জীবনে অশান্তি আরো বাড়িয়ে তুলবে! দয়াময়, রক্ষা করো…।… টপ্ টপ্ টপ্—পুরুষের পাষাণ বুক ভেদ করে, নিমাইয়ের পৌরুষত্বকে ম্লান করে দিলে তার চোখের তিন ফোঁটা জল।

"চয়ন—" একটা হাত চয়নের মাথায় রেখে কম্পিত স্বরে নিমাই ডাকলে। কিন্তু ওই পর্য্যন্তই…। তারপরে সে আর যোগ করতে পারলে না 'চয়ন তুমি ভুল করেছো, আমি বিবাহিত নাই' কথাগুলো!…কি নিষ্ঠুর সেই ভ্রমর দুটো! যারা তার বুকের মাঝে ঘুমিয়ে আছে! বসু স্বহস্তে সে দুটোকে যেন নিমাইয়ের বুকের মধ্যে রেখে দিয়েছে। পাছে নিমাই বসুকে ভুলে গিয়ে অন্যের প্রতি আসক্ত হয়! হ'লেই ভ্রমর দুটো জেগে

উঠে তাকে ভুলিয়ে দেয় সব কিছুকে। সেই ভ্রমর গুঞ্জরণের মধ্যে সে যেন কেবলি শুনতে পায়—না, না, না—তুমি বাঁধা আছো একজনের কাছে।

"বেশ্ কোরেছো—" জ্যা মুক্ত ধনুকের মতো হয়ে চয়ন উঠে পড়লো; অন্ধকারে চয়নের মুখের ভাব দেখা গেল না, কিন্তু রোগক্লিষ্ট দেহখানা নিয়েও সে তীক্ষ্ণ স্বরে বলতে লাগল,—"খুব কোরেছো; যাও, যাও তুমি এই অন্ধকার থাকতে থাকতেই। তোমার আমার মধ্যে দিনের আলোয় যেন মুখ দেখাদেখি হয় না আর।...তুমি কাছে থাকলেই জ্বর সেড়ে যাবে। আমি মরতে চাই; যখন মরবো, মুখে আগুন দেবার জন্য তোমাকেই ডাকবো। তখন এই কথাটা ভেবো একবার,—একটা মেয়ে প্রাণ-মন দিয়ে ভালোবেসেছিল তেমায়। মেয়েমানুষরাই ভালবাসতে জানে, পুরুষরা নয়—" তীর বেগে ঢুকে গেল ঘরের ভেতর।

যন্ত্রচালিতবৎ নিমাই উঠে পড়লো। ব্যাগ আর ছড়িগাছটা নিয়ে সে বেড়িয়ে এলো ঘর থেকে; ভুলে গেল কোটটা গায়ে চড়াতে।

বড় রাস্তার মোড়ে যে লাইট-পোস্টটা ছিল, সেইখানে দাঁড়িয়ে একবার পিছু ফিরলো নিমাই। কিন্তু দেখতে পেলে না—চয়ন বারান্দার রেলিং-এ মাথা খুঁড়ছে।

—পঁয়ত্রিশ—

কারুর কাছ থেকে কিছু পাবার আশা বুকে নিয়ে একজন তার মুখ পানে চেয়ে ততক্ষণ বসে থাকতে পারে, যতক্ষণ তার মন দীঘির কালো জলের মতো নির্ম্মল—অর্থাৎ সর্ব্বাঙ্গীন সুস্থ্যাবস্থায় থাকে। কিন্তু সেই দীঘির স্বচ্ছ জলে একটা ঢিল ফেললে যেমন যুগপৎ জল ঘুলিয়ে গিয়ে তরঙ্গোত্থিত হয়, তেমনি মানুষের স্বাভাবিক জীবনে কোনো ঘটনা ঘটে গেলে তার মন তখন তোলপাড় করে তোলে; রাগ অভিমান প্রভৃতি তার মগজে ঠাঁই করে নিয়ে তাকে করে তোলে উন্মত্ত। তাই, যদি ধরে নেওয়া যায় যে, তার প্রার্থীত বস্তুটি একটি ফুল তখন সে স্থির থাকতে পারে না ফুলটি গাছে ফুটে থাকার সৌন্দর্য্য শুধু চোখে দেখে; সে তাকে তখন বৃন্তচ্যুত করে দু' হাত দিয়ে ছিঁড়ে মাটিতে ফেলে মারিয়ে তার স্বার্থকতা খোঁজে। এক কথায় সে পেতে চায় হাত দিয়ে, দেহ দিয়ে। এই প্রার্থিত বস্তুটি পাবার পথে যদি কোনো প্রতিবন্ধক তার চোখে পতিত হয়, তবে তখন সে মনে মনে কোমড় বাঁধতে ও আস্তিন গোটাতে সুরু করে!....

এই রকম অবস্থাই সেদিন নিমাইয়ের হ'য়েছিল ট্রেণে আসতে আসতে। সেদিন সে আপন মনে দাঁত কড়মড় হাতে হাতে ঘুঁষোঘুঁষি প্রভৃতি অনেক কিছু করেছে—বন্ধুর কাছ থেকে পাকা কথা নেবার জন্য। সে ঠিক করেছিল বাসায় হাজির হ'য়েই

বন্ধুকে জানাবে যে,—সত্যকে সাক্ষী রেখে কোনো রকম বন্ধন ছাড়া সামাজিক জীবন যাপন করা অসম্ভব। সেইজন্য বন্ধু অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য তার নিরুদ্দিষ্ট স্বামীর পথ চেয়ে বসে থাকবে, না, জীবন-বীণার সুর নূতন করে বাঁধতে চায়। কেননা এরকম বে-সুরে জীবন যাপন করে গোপনে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বুক শুকিয়ে ফেলার কোনো অর্থই হয় না। তাতে উভয়ের পক্ষে মঙ্গল নাও হ'তে পারে।···এই রকম অনেক কিছু নিমাই ভেবেছে একটা খোলাখুলি সিদ্ধান্ত করার জন্য। কি ভাবে কোন্ কথাটা আগে বলবে, সে-সবের পাঁয়তারা সে ভেঁজে রাখল।

সত্যিই, রিপুর তাড়নাই মানুষকে অমানুষ করে তোলে। সেদিন যদি কোনো অন্তর্দ্দিষ্টি সম্পন্ন লোক নিমাইয়ের পাশে থাকতো, তবে দেখতে পেত, যে-নারীর প্রতি তার পবিত্র প্রেম ছিল একদিন, সে প্রেমকে সে সেদিন কি ভাবে অাবিল করেই না তুলেছিল!···

প্রেম-ভালবাসা হ'চ্ছে সত্য। মানুষ এই সত্য থেকে দূরে সরে যায় তখন, যখন তার মধ্যে স্বার্থবোধ প্রবল হ'য়ে ওঠে, প্রেমাস্পদের কাছে যখন সে প্রতিদানের চণ্ডালিক দাবী নিয়ে হয় হাজির।

বন্ধুর সামনে হাজির হ'য়েই নিমাইয়ের সমস্ত মতলব ফেঁসে গেল। কোনো কথাই সে বলতে পারলে না। না পারার জন্য তার নিজের প্রতি রাগ গেল শতগুণে বেড়ে। সে খাওয়া নাওয়া

কারুর সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলা বন্ধ করে দিলে। সকাল বেলা উঠে বাড়ী থেকে বেড়িয়ে যায়, রাত্রি হ'লে তবে ফেরে। ঝি-কে দিয়ে বসুকে, জানিয়ে দিয়েছে যে তার অসুখ করেছে ; আর বাইরে কাজ বেড়ে গিয়েছে অনেক।

মনের মধ্যে রাগ গোপন করে তাকে অসুখ বলে চালিয়ে দেবার মতো হাঁসির কাজ আর নেই। কেউ যদি রাগ করে এবং তা' চেপে রাখে তবে বাড়ীর আবহাওয়াটা স্বতই যেন ভারি হ'য়ে ওঠে ; সেটা ধরতে বিলম্ব হয় না অপরের।

বসু টের পেয়েছে। টের সে পেয়েছে অনেক দিন আগেই ; পূজোর ছুটীতে দেশ ভ্রমণের সময়—নিমইয়ের চিন্তাধারা অন্য খাতে বইছে। দেশ বেড়িয়ে আসার পর থেকে খুব কম কেন, একেবারে নয় বললেও অত্যুক্তি হয় না, নিমাই বসুর সঙ্গে হেঁসে বা স্বাভাবিক ভাবে কথা বলেছে।....একেই চতুরা নারী পুরুষের মুখ দেখলেই বলে দিতে পারে যে, পুরুষটির মনের কোণে কি ভাব লুকানো আছে ; তার উপর আবার বসু। তাই নিমাই লুকোতে পারলে না, ধরা পড়ে গেল।

তিন দিনের দিন।

রাত তখন প্রায় দশটা। নিমাই চুপি চুপি এসে বিছানায় শুয়ে পড়ল সর্ব্বাঙ্গ চাদরে ঢেকে।

টেবিলের 'পর ছোট লণ্ঠনটার আলো মিট্ মিট্ করে জ্বলছে।

টাইমপিস ঘড়িটা এক ঘেয়ে শব্দ করে চলেছে—চিকি-চিক্, চিকি-চিক্, চিকি-চিক্....

বসু নিঃশব্দে এসে ঢুকলো ঘরে। তার মন বেদনা ভারাক্রান্ত। নিমাইয়ের খাটের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ চুপ করে। সে ঠিক করে নিলে যে,—নিমাই ঘুমিয়ে পড়েছে। পরে বসু তার ডান হাত দিয়ে নিমাইয়ের কপাল বুক স্পর্শ করলো হাতের এপিট ওপিট দু'দিক দিয়েই। নাকের কাছে কিছুক্ষণ ধরে রাখল হাতটা, নিঃশ্বাস গরম কিনা জানবার জন্য। না; নিমাইয়ের গায়ে জ্বর নেই, নিঃশ্বাসও ঠাণ্ডা। নিমাই ঘুমুচ্ছে।...তার পা-তলায় বসু গিয়ে বসল ধীরে ধীরে। ঘরের ম্লানালোকে নিমাইয়ের মুখটা অস্পষ্ট। বসু একবার করে নিমাইয়ের মুখের দিকে তাকায় আবার মাথা নীচু করে এক হাতের আঙুল দিয়ে অপর হাতের আঙুল খুঁটতে থাকে। এই ভাবে প্রায় পনের কুড়ি মিনিট কেটে গেল। সে নিমাইকে ওঠাবে কি না, এবং ওঠালে কি কথা বলবে তাই ভাবতে লাগল। কান্নায় তার বুক ভরে উঠেছে, বিষ সংযোগ কিংবা উদ্বন্ধনের দ্বারা আত্ম-হত্যা করবার প্রবৃত্তি উঠেছে জেগে।

এ রকম হওয়া স্বাভাবিক। যার গলগ্রহ হ'য়ে যখন কেউ থাকে, আর সেই অন্নদাতাই যদি বিরূপ হয় তবে তখন, অবশ্য যদি তার মন সজীব হয়, বাতাসের কাছেও মুখ দেখতে মরমে মরে যেতে হয়। করুণা, সে সকলের কাছে হ'য়ে পড়ে তখন করুণার বস্তু। জীবন তখন হয়ে ওঠে দুর্বিবসহ।

নিমাই ঘুময়নি। আর সেটা প্রকাশ হ'য়ে পড়ল—একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস গোপনে ধীরে ধীরে ফেলতে গিয়ে।

"তোমার তো অসুখ-বিসুখ কিছু করেনি—" নিমাই জেগে আছে টের পেয়ে বসু বললে কান্না-অভিমান-দুঃখ-মিশ্রিত স্বরে,—"তবে যে-বড় তিনটে দিন কিছু খেলে না দেলে না, একটা কথা পর্য্যন্ত কওনি, বাড়ীর আর কেউ খেলে কি-না খেলে একবার জিগ্যেস করা বা দেখলে না—"

নিমাই নির্ব্বাক নিশ্চল। সে এ পর্য্যন্ত যে-সমস্ত আঘাত নীরবে সহ্য করে এসেছে সেই আঘাত ব্যথা বেদনা বুকের ভিতর থেকে কুণ্ডলী পাকিয়ে উপর দিকে ওঠবার চেষ্টা করছে, অবশেষে সেটা এসে তার গলায় আটকে গেল যেন, গলাটা তার ফেটে গেল গেল অবস্থা; কিন্তু সে পড়ে রইল নির্জীব হয়ে। কথা সে বলবে না, ব্যথা জানাবে না, অভিযোগ মূল্যহীন—নীরবে মুখ বুজে সহ্য করবে।

"তোমার আশ্রয় ছাড়া জগতে আর কোথাও যাবার জায়গা নেই বলে, এই রকম হেনস্তা করতে হয় বুঝি ?" বসু বললে কথাগুলো তার অন্তরের অবরুদ্ধ বেদনায় সিক্ত করে; তার চোখ দুটো ফেটে ঝর্ ঝর্ করে অশ্রুর বন্যা বইতে লাগল দু' কপোল বেয়ে।

নিমাই কিন্তু পাষাণ হ'য়ে পড়ে আছে।

"কেন—কেন—কেন—কি করেছি আমি—" ঠক্ ঠক্ ঠক্ করে বসু নিমাইয়ের পায়ে মাথা খুঁড়তে লাগল। তার খোঁপা খুলে গিয়ে লুটিয়ে পড়ল নিমাইয়ের পা দুটোর 'পরে। সে তার

কপালটা নিমাইয়ের পায়ে ঘষতে ঘষতে আবার বললে,— "বল, বল আর কোনো দিন আমার উপুর রাগ করবে না—"

নিমাইয়ের তবু কথা নেই। আলিপুরের চিড়িয়াখানার চৌবাচ্চায় ছাড়া ক্ষুধার্ত্ত কুমীরটার মতো সে পড়ে রইল নির্জ্জীব হয়ে। চোখের জলে আজ তার পাষাণ প্রাণ গলবে না।

বসু আবার খাড়া হ'য়ে বসল। বুকে মুখে যদেচ্ছা ভাবে তার চুলগুলো লুটিয়ে পড়ে আছে। চোখের পাতা ভিজে; সে জিভ দিয়ে ঠোঁট দুটো একবার চেটে নিলে কি বলবার জন্য; কিন্তু তার বাক্যস্ফূর্ত্তি হলো না।

নিস্তব্ধ! ঘরের মধ্যে দুটি প্রাণী যে আছে, তা বোঝবার উপায় নেই; দু' জনেই নিঃশ্বাস বন্ধ করে আছে যেন। দুজনেই আপ্রাণ চেষ্টা করছে অন্তর্দ্বন্দ্বের ঘোর কাটিয়ে ওঠবার জন্য; কিন্তু বৃথা। সেকেণ্ড মিনিট, ঘণ্টাও উত্তীর্ণ হয়ে কেটে গেল নাকি—নীরবতার মাঝে? ঠিক নেই।

"কি হ'বে দুটো জীবনকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে, তার চাইতে চল—" অবশেষে বসু নীরবতা ভঙ্গ করলে অসমাপ্ত কথা দিয়ে; কথাটা যেন তার গলায় আটকে গিয়েছে, আবার কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বললে কোনো রকমে,— "চল, আমরা রেজেস্টিরি করে বিয়ে করিগে—"

ক্ষুধার্ত্ত ডাল কুত্তোকে এক খণ্ড মাংস দেখালে যেমন সে লাফিয়ে আসে, ঠিক সেই ভাবে নিমাই তরাক্ করে উঠেই বসুর একখানা হাত চেপে ধরলে।···বসু ভয় পেয়ে অস্বাভাবিক রকম

সঙ্কুচিত হ'য়ে পড়লো পিছু দিকে! ...উপবাসী নিমাই তাকে ছিঁড়ে খুঁড়ে খেয়ে ফেল্লে বুঝি! ..

দেবে? দেবে বসু তোমার ভার আমাকে বইতে? তা হলে....তাহলে আমি তোমায় মাথায় করে নিয়ে....না, না—বুকের ভেতর পুড়ে দেশ দেশান্তরে ঘুরে বেড়াবো—সব-পাওয়ার-আনন্দে মত্ত হ'য়ে। কথাগুলো নিমাইয়ের বলতে ইচ্ছা হ'ল আগ্রহ ভরে, কিন্তু তরে মুখ দিয়ে কথা বেরুল না। সে বসুর হাতটা চেপে ধরে বসে রইল কিছুক্ষণ নির্নিমেষ নেত্রে বসুর মুখের পানে চেয়ে।

বসুর দৃষ্টি কিন্তু নত। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললে খুব ধীরে... কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে।....

নিমাই সজোরে চেপে ধরে আছে বসুর হাতখানা। গেল গেল—পুরুষের দৃঢ় হস্তের চাপে বসুর হাতখানার হাড়গুলো গুঁড়িয়ে চূর্ণ হ'য়ে গেল বুঝি!

অবশেষে হাতে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে শুক্‌নো ঢোঁক গিলে বললে নিমাই ঃ

"সত্যি বোলছো বসু—"

"হ্যাঁ—" বসু বললে; কিন্তু তার বুক কাঁপছে, কি একটা অজানা আশঙ্কায়। সে ধীরে ধীরে হাতখানা উদ্ধার করে নিলে নিমাইয়ের বজ্রমুষ্টির কবল থেকে।

"ঠিক—"

"ঠিক—"

ঘুড়ী,

"ঠিক তো ?"

"কতবার বোলবো আবার ; বোললুম তো—"

নিমাই খেয়াল করলে না কিন্তু যে, বসু ত্রিসত্য করলে না ; সে অন্তরে অন্তরে আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে পড়েছে, একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললে,—"যাও, ভাত বাড়ো গে—"

বসু ধীর পদবিক্ষেপে ঘর থেকে বেড়িয়ে গেল।

—ছত্রিশ—

বসু-পাওয়ার আনন্দে নিমাইয়ের দিন কয়েক বেশ কেটে গেল ; তলে তলে সব যোগাড় করতে সুরু করে দিলে। ইতিমধ্যে তার মধ্যে একটা কর্ত্তব্য বোধের হ'ল উদয়। সেটা হ'চ্ছে—বসুর পূর্ব্বের বন্ধনটা কি ভাবে ছিন্ন করা যায়, না-যায়, আইনজ্ঞের কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়া।

এই পরামর্শ নেবার জন্য তার অর্দ্ধ-পরিচিত এক বিহারী উকীলের কাছে সেদিন সে গিয়েছিল। উকীল সাহেব নিমাইকে যে-পরামর্শ দিলে, তাতে তার অন্তরের সকল আশাকে দিলে একেবারে উড়িয়ে। উকীল জানালেন যে, বসুর বিবাহ বন্ধন ছেদন করা যায় না : তার স্বামী নিরুদ্দিষ্ট হ'য়েছে, কিন্তু বেঁচে থাকতেও

পারে। সেইজন্য বার বৎসর অপেক্ষা করে, তারপরে নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তির কুশ-পুত্তলিকা দাহ করে শ্রাদ্ধ শান্তি সমাপন্তে পুনর্ব্বিবাহ সম্ভব। হিন্দু-বিবাহ আইন বড় কড়া আইন।—তারপরে উকীল ভদ্রলোক আরো জানালেন যে, তিনি আইনের বই পত্তর ঘেঁটে দেখবেন যদি কোনো উপায় থাকে।

উকীল বাবুর শেষের কথায় ভাঙ্গা-বুকে ক্ষীণ আশা নিয়ে চলে গেল সে গঙ্গার ধারে বেড়াতে।

কালেক্‌টারী ঘাটে পাণ্ডা ঠাকুরের চৌকির 'পর বসে আছে।

অগ্রহায়ণ মাস। সবেমাত্র সূর্য্য অস্ত গিয়েছে। উত্তর-পূর্ব্ব কোণে পল্লীর-প্রান্তর-রেখাগুলি সন্ধ্যার কালো ছায়ায় তখনও ঢেকে ফেলতে পারেনি।···ওপারে বনান্তরাল দিয়ে বি. এন. ডবলিউ. আর. লাইনের একখানা ট্রেণ এক প্রান্তর হ'তে অন্য প্রান্তর পর্য্যন্ত ধূমধ্বজা উড়িয়ে চলে গেল। কুণ্ডলীয়মান ধোঁয়াগুলি ধীরে ধীরে আকাশের উপরে উঠবার চেষ্টা করছে।···কিছুক্ষণ আগে ঘাটের কাছ থেকে যে-মাঝিটা নৌকাখানা নিয়ে ওপারের উদ্দেশ্যে রওনা হ'য়েছিল সে এখনো গঙ্গা-বক্ষ পাড়ি দিয়ে উঠতে পারেনি।—ছপ্‌ ছপ্‌ ছপ্‌—দাঁড়া দুটো পার্শ্বে প্রসারিত হ'চ্ছে আর নামছে: দিনান্তে খেলার শেষে ধূলি ধূসরিত বালক যেমন আপন মনে তার হস্তদ্বয় প্রসারিত করে উরুর পার্শ্বদেশ চাপড়াতে চাপড়াতে গৃহাভিমুখে অগ্রসর হয়, নৌকার হাল দুটো দেখাচ্ছে সেই রকম।

ঘুড়ী

উত্তর-পশ্চিম কোণে প্যালেইজ্যা ঘাট ষ্টেশনে ষ্টীমারের বৈদ্যুতিক আলোগুলো একসঙ্গে জ্বলে উঠলো;—কুহেলিকাময় বাতাসের ভেতর দিয়ে দেখা যায়—আলোগুলো মিট্ মিট্ করছে : মনে হ'বে যেন ধারায় নক্ষত্র ফুটেছে।···

···ঘাটের উপরকার আলোটা জ্বলে উঠল। নিমাই পাশ ফিরতেই দেখতে পেল অনতি দূরে এক গৈরিক-বসন-পরিহিত সন্ন্যাসী অপলক নেত্রে তাকিয়ে আছেন ওপারের দিকে।

সন্ন্যাসী পূর্ণ বয়স্ক যুবক। মাথাটা—কিছুদিন পূর্ব্বে নেড়া হ'য়েছিল বোধ হয়, সেইজন্য দেখলে মনে হবে যেন কুচি কুচি চুলের একটা টুপি পরে আছে মাথায়। দাড়ি গোঁফ কামানো। দোহারা গড়ন। গায়ে একটী বেনিয়ান। পায়ে ক্যাম্বিসের জুতো। শ্রীমান্ সন্যাসীর মুখখানা দেখলে মনে হ'বে যে, যে-সত্যটি উপলব্ধি করতে পারলে লোক সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ করে, এ যেন তা' নয়।···সন্যাসীর সারা মুখখনায় যেন একটা দুঃখের ছাপ। তাঁর হাতে একটী অর্দ্ধপক্ক বংশদণ্ড লাঠিটির একপ্রান্তে এক টুকরা গৈরিক বসন জড়ানো।

"আপনি—" বলে সন্যাসী ঠাকুর নিমাইয়ের দিকে এমন ভাবে সরে এলেন, যেন তিনি এতক্ষণ এই চিন্তাই করছিলেন যে—নিমাইয়ের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করবেন কিনা।

"হ্যাঁ, বলুন—" নিমাই বুঝতে পারলে সন্যাসী ঠাকুরের কথায় যে, সে বাঙ্গালী কিনা।

"যাক্ –" নিজের অনুমান সত্য হ'য়েছে বলে সন্ন্যাসী ঠাকুর মনে মনে একটু আনন্দিত হয়ে নিমাইয়ের পাশে বসে পড়লেন।

"আপনার নাম—"

"নিমাই সন্যাল—"

"আরে! আমিও অধিকারী; নাম দেবেশ—"

"বেশ ভালো; আমাকে আপনার শিষ্য করে নিন তাহালে—" সহাস্যে বলে নিমাই মুখ টিপে টিপে হাঁসতে লাগল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই গল্প বেশ জমে উঠলো। নানা দেশের কথা—আচার পদ্ধতি।···সন্যাসীর ঈশ্বরোপাসনা। পরিব্রাজক বেশে পথে পথে ভ্রমণ।

"একটা জিনিষ আমার ভারি আশ্চর্য্য লাগে নিমাই বাবু—" সন্যাসী বল্লেন হর্ষচিত্তে,—"মানুষ মনে প্রাণে যা কামনা করে, কি করে এবং কে-যে সেই কামনা পূর্ণ করে, চিন্তা করলে সত্যিই আশ্চর্য্য হোতে হয়—" বল্পে হাঁসিমাখা মুখে নিমাইয়ের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

নিমাই মৌন হ'য়ে রইল; সে এই কথাটাই ভাবছে যে, তার প্রাণে অনেক কামনাই আছে, কিন্তু এপর্য্যন্ত একটাও পূর্ণ হয়নি। সন্যাসী ভাবাবেগে বলছেন হয় তো!

"ছেলেবেলা থেকেই আমার বড় আশা ছিল মনের মধ্যে যে, পায়ে হেঁটে ভারত ভ্রমণ করবো; পাকেচক্রে সে-আশা পূর্ণ হোলো শেষ পর্য্যন্ত—" সন্যাসী বললেন।

কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে ঘনিষ্টতা যখন বেড়ে উঠল, তখন নিমাই সন্ন্যাসী ঠাকুরের এই কঠোর ব্রত গ্রহণের কারণ জিজ্ঞাসা করলে।

সন্ন্যাসী ঠাকুর জানাতে একটুও দ্বিধা করলে না যে,—তার পারিবারিক ঘটনা বাধ্য করেছে এই কঠোর ব্রত অবলম্বন করতে। এর পর সন্ন্যাসী ঠাকুর তাঁর মনের দ্বার নিমাইয়ের কাছে একেবারে উন্মুক্ত করে দিলেন। অন্তরের অনেক গোপন কথা বললেন। শেষ কালে যে-কথাটা বললেন, তা শুনেই নিমাই কেন চমকে উঠলো কে জানে। সে তার চোখ মুখ অত্যধিক কুঁচকে তীক্ষ্ণ ভাবে আলো-আঁধারে সন্ন্যাসীর মুখখানা দেখে নিয়ে দু' হাতে চোখ-মুখ ঢেকে নত মুখে এমন ভাবে বসে রইল যেন সে অসহ্য যন্ত্রণায় মুহ্যমান হ'য়ে পড়েছে।

সন্ন্যাসী ঠাকুর বিচলিত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলেন যে, কি হলো নিমাইয়ের হঠাৎ!

নিমাই ঘাড় নেড়ে জানালে—বিশেষ কিছু হয়নি।···বহুক্ষণ নীরবে কাটালো। তার পরে নিমাই হঠাৎ ঘোর কাটিয়ে উঠে বললে,—"আপনি আজ এখানে থাকছেন তো?"

"শুধু আজ নয়; দিন দু'তিন এখানে থাকতে হ'বে আমায়, ওপরের সাধু বাবার গুরুদেব আসবেন, তাঁর সঙ্গে কাশী যাবো, সেখানে এক উৎসবে যোগ দিতে—"

"আমার বাসায় একবার পায়ের ধূলো দেবার জন্য অপনাকে

নেমন্তন্ন করছি; এ-দীনের আবেদন অগ্রাহ্য করবেন না নিশ্চয়ই—?" বলে জোড় হাতে সকৃতজ্ঞ নয়নে নিমাই চেয়ে রইল সন্যাসী ঠাকুরের দিকে।

"আহা, অত করে বলছেন কেন; যাব তার জন্য আর কি—" সন্যাসী সানন্দে সম্মতি দিলেন।

"তা হোলে আজ আমি বিদায় নিচ্ছি; কাল সকালে আমি আসবো আটটা নটার সময়—"

"বেশ; আমি আপনার পথ চেয়ে বসে থাকব—"

বিদায় কালীন নমস্কার আদান-প্রদানের পর নিমাই চলে গেল।

বাঁকীপুর ময়দানের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে এসে নিমাই একার অপেক্ষায় ইতঃস্তুতঃ পদ-সঞ্চরণ করতে লাগল। তার মন চিন্তাকুল।····হঠাৎ চোখে পড়লো তার—সহরের এই নির্জ্জন প্রান্তে স্বর্গ হ'তে শান্তি দেবী স্বয়ং আবির্ভূতা হ'য়েছেন যেন।··· আকাশচুম্বী বট-অশ্বত্থ-দারু গাছগুলোর মধ্য দিয়ে শুক্লা দ্বাদশীর জ্যোৎস্না-কণা ঝড়ে পরছে পিচের পথের 'পরে।····

ময়দানের এদিকের প্রকৃতির এই অরূপ রূপ; আর পূর্ব্ব প্রান্তে—প্রায় কোয়ার্টার মাইল দূরে—সিনেমা-সার্কাসের মনুষ্য-বেশি পতঙ্গকুলকে পথ ভ্রষ্ট করবার চোখ ঝলসান নানা রঙ বে-রঙের বৈদ্যুতিক আলো. আর লাউড স্পীকারের গান—যেন পল্লীবালার বুক নেঙরানো প্রেম আর লম্পটকে লয়িত করবার জন্য গণিকার হাঁসিরূপী দাঁত খিঁচুনী!···

কিছুক্ষণের মধ্যেই একখানা টোঙা এসে পড়ল; তার 'পর নিমাই উঠে বসতেই বিথীকার মধ্য দিয়ে জ্যোৎস্না-আঁধারে ভাসতে ভাসতে দূরে অদৃশ্য হ'য়ে গেল।

পরদিন যখন নিমাই একখানা গাড়ী নিয়ে হাজির হলো সন্যাসী সমীপে তার মুখমণ্ডল অস্বাভাবিক দীপ্তিময়। কেন, তা' সে-ই জানে।

ঘাটের পাশে শান দিয়ে বাঁধান অশ্বত্থ গাছের তলে বসে সন্যাসী ঠাকুর বুড়ো সাধু বাবার সঙ্গে গল্প করছিলেন।

"ভারি খুশী খুশী দেখাচ্ছে যে—" নিমাই গাড়ী থেকে অবতরন করতেই সন্যাসী ঠাকুর হাত জোড় করে একটা ছোট নমস্কার করে বললেন সহাস্যে।

"কি বলেন—সাধু সজ্জনের সেবার সৌভাগ্য হ'লে আনন্দ হয় না কার?" হাতে হাত রগরাতে রগরাতে সহাস্যে নিমাই জবাব দিলে।—"আর দেরী নয়, চলুন—"

সন্যাসী ঠাকুর দ্বিরুক্তি না করে উঠে পড়লেন।

পথে বাজারের ধারে গাড়ী থামিয়ে নিমাই এত বাজার করলে, যেন তার বাড়ীতে ছোট খাট একটা যজ্ঞী হ'বে।

"কি ব্যাপার বোলুন তো?" সন্যাসী ঠাকুর নিমাইয়ের বাজার করার বহর দেখে বললেন সবিস্ময়ে,—"আপনার বাড়ীতে কোনো উৎসব টুৎসব আছে নাকি?"

"তেমন কিছু নেই; তবে ও-বেলায় ছোট খাটো একটা আনন্দোৎসব কোরবো, আমার বিহারী প্রতিবেশীদের নিয়ে। তত্ত্বজ্ঞানী সন্ন্যাসী ঠাকুরের কাছ থেকে পরকালের কথা শুনে তারা ধন্য হ'বে—' বলে মুখ টিপে হাঁসতে হাঁসতে গাড়ীতে চড়ে বসলো।

বাড়ীর দোরগোড়ায় এসে পৌঁছুতেই ঝি রাতনী তড়াতাড়ি এসে নিমাইয়ের হাতে একখানা চিঠি দিলে; দিয়ে চিঠিখানা তাকে যে দিয়ে গিয়েছিল একটু আগে—সে মুখে যা বলেছিল তাও বললে। আরো জানালে যে, বসু পাড়ার এক বুড়ীর সঙ্গে ঠাকুর বাড়ীতে পূজো দিতে গিয়েছে, আসতে দেরী হ'বে।

চিঠিখানা পড়েই নিমাই অত্যধিক মুস্ড়ে পড়লো; নীচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরে চোখ কুঁচকে সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ চিন্তা করলে।

সন্ন্যাসী ঠাকুর নিমাইয়ের অবস্থা দেখে সংবাদ শুভ কিনা জিজ্ঞাসা করলেন।

"সংবাদ শুভ অশুভ কিছু নয়—" নিমাই সন্ন্যাসী ঠাকুরকে আশ্বস্ত করলে,—"বোলছি; আপনি নামুন—"

সন্ন্যাসী ঠাকুরকে নিমাই রামদহিনের বৈঠকখানায় নিয়ে গিয়ে বসিয়ে প্রাথমিক পরিচর্যা করার পর জানালে যে, তাকে এক্ষুনি মুঙ্গের যেতে হবে, তার অফিসের বড় সাহেব এসেছেন বিশেষ কাজে; তাকে নিতান্ত প্রয়োজন।

নিমাই বাঁ হাতের আস্তিনটা ঈষৎ তুলে ঘড়ি দেখেই সবিনয়ে বললে,—"ট্রেণেরও আর বেশী দেরী নেই; আমাকে এক্ষুণি বেড়িয়ে যেতে হবে, আমি সমস্ত ব্যবস্থা করে যাচ্ছি, অনুগ্রহ করে আজকের দিনটা আপনি থাকবেন—"

সন্ন্যাসী সম্মত হ'ল।

নিমাই বাড়ীর ভেতর গিয়ে পোষাক পাল্টিয়ে যে-এক্কাটা করে এসেছিল, সেইটাতে চেপে বেড়িয়ে গেল।

যাবার সময় একখানা চিঠিতে বসুকে জানিয়ে গিয়েছিল যে, সন্ন্যাসী ঠাকুরের সেবা-যত্নের যেন কোনো ত্রুটি হয় না। বসু আসতেই রাতনী ফিস্ ফিস্ করে ব্যাপারটা কিছু জানালে; তার পর বসু চিঠিখানা পড়ে বাড়ীর বাইরে এসে পা টিপে টিপে রামদহিনের বৈঠকখানার এক পাশে গিয়ে উঁকি মারতেই সন্ন্যাসী ঠাকুরের সঙ্গে চোখাচোখি হ'য়ে গেল; যেতেই সে ত্রস্তে পিছু হ'টে বাড়ীর ভিতর ঢুকে গেল। বাড়ীর ভিতর গিয়ে অব্যবস্থিত ভাবে সে এ-ঘর সে ঘর ঘুরলে কেন, তা সেই জানে।

সন্ন্যাসী ঠাকুর বসুকে দেখে ঠিক করে নিলে যে—সে নিমাইয়ের স্ত্রী। হয়ত স্ত্রী-মুখ দর্শনে সন্ন্যাসী ঠাকুরের ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারে আঘাত লেগেছিল, তাই আসন ত্যাগ করে উঠে পড়ে আলিপুর চিড়িয়াখানার পিঞ্জরাবদ্ধ সুন্দর-বন-মার্কা ক্ষুধার্ত্ত বাঘটির মতো ঘুরপাক খেতে লাগল। কিছুক্ষণ এই ভাবে কাটার পর সন্ন্যাসী ঠাকুর একবার চারদিক সন্ত্রস্ত ভাবে তাকিয়ে লঠিগাছটা নিয়ে

সকলের আগোচরে পিটটান দিলে—হন্ হন্ করে হেঁটে মাঠের বড় জাঙ্গালটার নীচে নেমে সন্ন্যাসী ঠাকুর হাঁপ ছাড়লে; তারপরে এক রকম ছুটতে ছুটতে সহরের কোলে নিজেকে লুকিয়ে ফেল্লে।—

তারপরদিন সকাল বেলা নিমাই এসে যখন শুনলে যে, 'সন্ন্যাসী ঠাকুর সকলের অগোচরে চলে গিয়েছেন তখন নিমাই অত্যধিক চিন্তিত হ'য়ে পড়লো; হয়তো সন্ন্যাসী ঠাকুর অভুক্তাবস্থায় বাঁড়ী থেকে চলে যাওয়ার ফলে নিজের কোনো রকম অমঙ্গলের আশঙ্কায়। যে-ভাবে ছিল, সেই ভাবেই ছুটলো কালেক্টরী ঘাটের উদ্দেশ্যে—সন্ন্যাসী ঠাকুর সেখানে নিশ্চয়ই আছেন মনে করে।

নিমাইকে ব্যর্থকাম হ'তে হোলো। বুড়ো সাধুবাবার কাছে শুনলে যে, সন্যাসী ঠাকুর গত কাল রাত্রি বেলাতেই কাশী চলে গিয়েছেন—সেখানে একটা আখড়ার উৎসবে যোগ দিতে।

নাওয়া খাওয়া-ত্যাগ করে নিমাই ছুটলো কাশীর উদ্দেশ্যে। তাই সে এসে দাঁড়ালো পাটনী ষ্টেশনে—পশ্চিম মুখগামী যে-ট্রেণ সে প্রথমে পেল, চড়ে বসল সেটাতেই।

রাত্রি তখন দ্বিতীয় প্রহরে পড়েছে।

নিমাইয়ের ঘরে ছোট গোল টেবিলটার দুপাশে বেতের চেয়ার দুটোয় সন্যাসী ঠাকুর ও নিমাই মুখোমুখী ভাবে বসে গল্প করছে।

বস্থ ঘোমটায় মুখ ঢেকে ঘরে ঢুকল—এই ঘরেই আহারের আসন পাততে।

সন্যাসী ঠাকুর তাঁর অজ্ঞাতসারেই একবার বস্থর পানে তাকালেন; তাকিয়েই তিনি হ'য়ে পড়লেন অত্যধিক সঙ্কুচিত। তিনি কি যেন ভাবছেন; ভাবছেন হয় তো,—এই নারী জাতটাই হ'চ্ছে ব্রহ্মচারীর পরম শত্রু। এদের দৃষ্টিতে যেন আগুন আছে; তাই, চকিতের জন্য দৃষ্টিবাণ নিক্ষেপ করলে ব্রহ্মচারীদের অন্তরাত্মা গুড়্ গুড়্ করে কেঁপে ওঠে; ব্রহ্মচর্য্যের বাঁধ ভেঙ্গে মাঠময় হবার উপক্রম হয় যেন!

নিমাই নীরবে মাথা নীচু করে নাকের ডগাটা খুঁটছে নিঃশ্বাস বন্ধ করে; সন্যাসী ঠাকুরের অবস্থা দেখে সে মনে মনে হাঁসছে নাকি? হাঁসলেও তার বহিঃপ্রকাশ নেই।

বস্থ আসন দু'খানা পেতে স্থানটি জল তর্ তরা দিয়ে নিকিয়ে দিলে; পরে ঘর থেকে বেড়িয়ে যাবার সময় সে টলে পড়ে কপাটের সঙ্গে একটা ধাক্কা খেলে। তারপর টাল সামলে নিয়ে কম্পিত পদে চলে গেল রান্না ঘরের দিকে।

"আচ্ছা—" সন্যাসী ঠাকুর নিমাইকে কি-কথা জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে থেমে গেলেন। তারপরে চিন্তাভারা-ক্রান্ত মুখে এক টুকরো মরা-হাঁসির রেখা টেনে বললেন,—"আপনাকে একটা কথা জিগ্যেস করতে পারি কি?" বলে সবিনয়ে হাত দুটো ঘোষতে লাগল।

"স্বচ্ছন্দে—" নির্ব্বিকার ভাবে নিমাই সম্মতি দিল।

"ইনি, আই মিন, যিনি এক্ষুনি ঘরে এসেছিলেন, আপনার স্ত্রী ?" বলে সন্যাসী ঠাকুর সকাতর নয়নে নিমাইয়ের দিকে তাকিয়ে রইল।

অভিনয়ের ভঙ্গীতে নিমাই সন্যাসী ঠাকুরের প্রতি কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে মুখে চাপা-হাঁসি নিয়ে দৃষ্টিটা ধীরে ধীরে দক্ষিণ দিকের জানালা গলিয়ে ফেলে দিলে দিগন্তবিস্তৃত জোৎস্না প্লাবিত মাঠটায়। পরে শান্ত স্বরে বললে,— "না; আমার ঘনিষ্ট আত্মীয়া—" বলে সন্যাসী ঠাকুরের প্রতি পুনরায় তাকাতেই তার চাপা হাঁসিটা সারা মুখময় সংক্রামিত হ'য়ে পড়ল : বললে,— "তা' তো হোলো; কিন্তু আপনি সন্যাসী মানুষ হ'য়ে মেয়ে মানুষের মুখের দিকে তাকান কি বোলে ?"

নিমাইয়ের কথাগুলো সন্যাসী ঠাকুরের কাণে গিয়েছিল কিনা, তিনিই জানেন; তাঁর তখন অন্তর থেকে মাথার মনি কোঠা পর্য্যন্ত রক্তগুলো তোলপাড় করছে, তারই ভাব ফুটে উঠেছে তাঁর সারা মুখটায়।

হঠাৎ····একটা শব্দ নিমাইয়ের কাণে এসে ঢুকতেই সে নিঃশ্বাস বন্ধ করে উৎকণ্ঠিত হ'য়ে রইল। তারপরে একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ রান্না ঘর থেকে আসছে শুনে সে ঝটিতি বেড়িয়ে গেল ঘর থেকে।

রান্না ঘরে গিয়ে দেখে, বসু মেঝেতে মুর্চ্ছিতা হ'য়ে পড়ে আছে।

ঘুড়ী

"এই জল জল, পাখা পাখা—" বলতে বলতে ছুটোছুটি আরম্ভ করে দিলে।

বস্তুর চোখে মুখে জল দিয়ে আকুল ভাবে নিমাই ডাকলো,—"বস্তু, ও-বস্তু—" বস্তুর চেতনা নেই।

সন্ন্যাসী ঠাকুর যাবে-কি যাবে-না দো-ভাবায় পড়ে সারা ঘরটায় ঘুরপাক খাচ্ছে—বিক্ষিপ্তচিত্ত নিয়ে।

নিরুপায় হ'য়ে নিমাই সন্ন্যাসী ঠাকুরকে ডাকলে ব্যস্ত ভাবে,—দেবেশ বাবু শীগ্‌গির আসুন এঘরে—"

নিমাইয়ের অনুমতি পেয়ে সন্ন্যাসী ঠাকুর এক লাফে গিয়ে পড়ল রান্নাঘরে। ঘরে ঢুকেই তিনি বসলেন বস্তুর মাথার গোড়ায়; বসেই কোনো কথা বা কোনো কিছুর দিকে না চেয়ে মূর্চ্ছিতা বস্তুর মাথাটা তুলে নিলেন নিজের কোলের 'পর; পরে আকুলিত তথা স্নেহভরে ডাকলেন,—"বস্তু····বস্তু চেয়ে দেখ—"

বস্তু সজ্ঞাহীন। নিমাই পাশে হাঁটু গেড়ে বসে অনবরত পাখা চালাচ্ছে। সন্ন্যাসী ঠাকুর বস্তুর চোখে মুখে জল দিয়ে দাঁতে দাঁত-লাগা ছাড়াবার চেষ্টা করছে। কিছুক্ষণ পরে দাঁতকপাটি খুলে গেল।

সন্ন্যাসী ঠাকুর পুনরায় ডাকলেন ব্যথিত স্বরে,—"বস্তু একবার তাকাও—"

বস্তু ধীরে ধীরে একবার চোখ দুটো খুলে সন্ন্যাসী ঠাকুরের

মুখখানা দেখে নিয়েই কম্পিত স্বরে চীৎকার করে উঠল—উ-উ-উ-উ-উ ···

আরো কিছুক্ষণ কাটল নীরবে।

নিমাই যন্ত্র-চালিতবৎ পাখা চালিয়ে যাচ্ছে; তার দৃষ্টি মূর্চ্ছিতা বসুর মুখের 'পরে নিবদ্ধ।

সন্যাসী ঠাকুর ঘন-ঘন নিঃশ্বাস ফেলছে কেন, তা' তিনিই জানেন। বসু ধীরে ধীরে একটা দর্ঘনিঃশ্বাস মোচন করলেন।

বসুর চেতনা ফিরেছে টের পেয়ে সন্যাসী ঠাকুর তার চিবুক ধরে নাড়াচড়া দিয়ে স্নেহভরে ডাকলেন, —"বসু—"

"উঁ—" ক্ষীণভাবে বসু উত্তর দিলে।

"একবার ত'কাও—"

বসু আবার—একবার ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকালো; চোখের দু' কোণ বেয়ে অঝোরে অশ্রু ঝরছে তার। ক্ষীণ কম্পিত এবং শান্ত স্বরে বসু বললে,— "তুমি এত নিষ্ঠুর—"

"তার জন্য বহু দুঃখ কষ্ট ভোগ কোরেছি বসু; সারা দেশময় পায়ে হেঁটে তোমাকে খুঁজে বেড়িয়েছি; পাগলের মতো ঘুরেছি প্রতি দ্বারে—" প্রাণে যত বেদনা ছিল সব উজার করে দিয়ে দেবেশ অধিকারী বললেন।

পর পর তিন জনেরই একটা করে দীর্ঘশ্বাস পড়ল।···আরো কিছুক্ষণ কাটল নীরবে।

"নিমুদা—" বসু কম্পিত স্বরে ডাকলো।

"উঁ—" মাথা নীচু করে পায়ের নখ খুঁটতে খুঁটতে নিমাই উত্তর দিলে।

"ভগবান আছে—"

সেই কথাই ভাবছিল নিমাই; ভাবছিল সে,—এই সাধ্বী নারী কোন্ সাধনার বলে আভিনয়িক ভাবে তার হারাণো-স্বামীকে ফিরিয়ে পেলে!····

"বড্ড খিদে পেয়েছে, উঠে খেতে দাও—" আনন্দ-অভিমান-দুঃখ-মিশ্রিত স্বরে নিমাই বললে।

—সাঁইত্রিশ—

কলিকাতাগামী ট্রেণখানা ছাড়বার ঘণ্টা হ'য়ে গিয়েছে।

কামরার ভেতরে বসে জানালা দিয়ে মুখ গলিয়ে বসু নীরবে আঁচল দিয়ে মুচছে চোখ। তার সামনে প্লাটফর্ম্মে দাঁড়িয়ে আছে নিমাই—মাথা নীচু করে মুখে একটা অদ্ভুত হাঁসির রেখা টেনে ডান পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ শানে ঘষছে। কামরার দরজার সামনে চিতাকে বুকে নিয়ে দেবেশ বাবু তখনও প্লাটফর্ম্ম থেকে গাড়ীর ভিতরে উঠেননি।

"আমি গিয়েই বিয়ের ব্যবস্থা কোরবো।···যখনই যেতে চিঠি

লিখবো তখনই যেতে হ'বে কিন্তু।" বসু বললে তার সিক্ত-নয়ন আঁচল দিয়ে মুছতে মুছতে।

বিয়ে? তা' বটে!—ভাবলো নিমাই মনে মনে।—সঙ্গে সঙ্গে তার চোখের উপর চয়নের মুখচ্ছবিখানা ফুটে উঠতেই তার বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল।

ঢনং ঢনং ঢনং ঢনং····

গাড়ীতে উঠে পরল দেবেশ বাবু—।

কিন্তু শিশু চিতা ব্যাপার কি কিছুই বুঝতে পারেনি; সকলে ট্রেণে উঠলে অথচ নিমাই উঠলো না, তাই দেখে সে স-ক্রন্দনে শঙ্খ চিলের মতো তীক্ষ্ণ স্বরে ডাকলো,—"বাবু-উ-উ-উ-উ······

টু-উ-উ-উ-উ····

গাড়ী চলতে সুরু করেছে; জানালাটা ধরে চলন্ত গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে কিছুদূর গেল নিমাই।....তার প্রাণ চাইছে ওদের সকলের সাথী হ'তে।

ট্রেণ বেড়িয়ে গেল প্লাটফর্ম্ম ছেড়ে। লোহানিপুরের বাঁকের মধ্যে ট্রেনখানা অদৃশ্য হ'য়ে গেল।

নিমাই তখনও দাঁড়িয়ে আছে হাঁ করে।····চলে গেল!···হ্যাঁ, গেল তার প্রাণ। সে টলতে টলতে গিয়ে অনতিদূরে একটা লাগেজের উপর বসে পড়ল।

যাক্—নিমাই ভবল—জীবনের সুন্দরতম দিনগুলো কেটে গেল একটা ছায়ার পিছু পিছু ছুটে।····আর আসবে না, সেদিন

আর পাব না!…এজীবনে আর না! জীবন যৌবনের সকল আশা আকাঙ্ক্ষা ধূলায় মিশিয়ে দিয়ে চলে গেল পাষাণী আজ….

….ও—মা হ্যাঁ, নিমুদা-ই তো-অ অ….।…তা' পারি; কিন্তু আপনার ভদ্রতা জ্ঞানের মাত্রাটা একটু বেশী দেখছি যে…আমি অসহায় আমাকে রক্ষা করুন…আপনি শুনলে আমায় ঘৃণা কোরবেন …দাও না, দাও; এই ইন্দেরায় ফেলে ডুবিয়ে মেরে ফেল্লে কেউ দেখতে আসবে না….বসু চুল বাঁধছে পিঠের কাপড় তুলে….ওমা! কোথায় ছিলে সারা রাত্তির….তোমার আশ্রয় ছাড়া জগতে আর কোথাও যাবার যায়গা নেই বোলে এই রকম হেনস্ত কোরতে হয় বুঝি?…মূর্চ্ছিতা বসু দেবেশ বাবুর কোলে শুয়ে আছে—নিমাই স্বপ্ন দেখছে….

ভাবছে নিমাই,—চয়নের কাছে ছুটে গেল কেমন হয়? পাষানী বসু বুকের মধ্যে যে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে গেল, তা' নেবাতে পারবে না চয়ন?….কেন আমি সরলমতি চয়নকে সত্যি কথা বলতে পারিনি—এত সহজ ছোট্ট কথা?

ছোট্ট কথা! হ্যাঁ, ছোট্ট কথাই বটে। কিন্তু এই ছোট্ট কথা বলেই সে তুচ্ছ করেছিল প্রথম। আর মানুষ জীবনে সব চেয়ে বড় দুঃখ পায়—এই ছোট্ট কথা বা ঘটনাকে তুচ্ছ করে।

এত ঘটনা ঘটে যাবার পর নিমাইয়ের বুকে আর সাহস নেই চয়নের সম্মুখীন হ'বার; এই সপ্তকাণ্ড রামায়ণ গুছিয়ে, বুঝিয়ে

বলবার মতো ভাষাও যোগাবে না তার মুখে চয়নের সামনে।···
পাগল প্রায় নিমাই উঠে পড়লো।

বাসায় এসে নিমাই দেখে সব অন্ধকার! একি! সে ভাবল, একটা নারী এত বড় বাড়ীটাকে আলো করে ছিল?····সে ধীরে ধীরে ঢুকলো বসুর ঘরটায়—যেন খাঁচা থেকে পাখীটা উড়ে গিয়েছে!··· মূক হ'য়ে মেঝেয় দাঁড়িয়ে একবার চারদিক তাকিয়ে নিলে; পরে বেড়িয়ে এলো একটা বুক ফাটা নিঃশ্বাস মোচন করে।···এসে ঢুকলো নিজের ঘরে।···সব জিনিষ পত্তরগুলো যেন কালি হ'য়ে গিয়েছে।···অন্ধকার···অন্ধকার····সব দিক অন্ধকারে ছেয়ে গিয়েছে···।—ঘরের জিনিষ পত্র সব কিছু তাকে যেন উপেক্ষা করে জিভ ভ্যাঙাচ্ছে!···

অসহ্য···উঠে পড়ল নিমাই।

ব্যাগের মধ্যে কয়েকখানা কাপড় জামা পুরে ছড়ি গাছটা নিয়ে বেড়িয়ে পড়ল ঘর থেকে।··· ঘর-বাড়ীতে তালা বন্ধ করে সে বেড়িয়ে পড়ল কোন্ দিকে, তা' ঠিক নেই; চোখ দুটো তার পথ প্রদর্শক।····

পথ ধরে না গিয়ে নিমাই নেমে প'ড়ল মাঠের মধ্যে।···কিছুদুর এসে সে দাঁড়াল। পিছু ফিরে দেখে নিলে বাড়ীটাকে আর একবার!···কাঁদছে।··· হাপুসুটি কাঁদছে বাড়ীখানা যেন।····দূরে সহরের কোল থেকে যে-বাড়ীখানা দেখে তার বুক স্বতই আনন্দে

নেচে উঠত, সে-বাড়ীটার চেহারা দেখে আজ বুক ফেটে যাচ্ছে নিমাইয়ের!···সে কোঁচার খুঁট দিয়ে চোখ দুটোর কোণ মুছে নিয়ে আকাশটার চারদিক তাকাল ধীরে ধীরে।

····নিমাইয়ের আত্মাটা বলতে চাইল,—কে, কে, তুমি?···· আমাকে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছ?···বাঁশ-খড়ের ঠাটের উপর কাদা দিয়ে গড়া রং মাখানো দেবতা নই আমি।···অস্থি-মজ্জার কাঠামোর উপড় রক্ত-মাংস দিয়ে গড়া একটা জীব—আমি মানুষ····

হা-হা-হা-হা—তুমি? তুমি আমার হাতের ঘুড়ী!—আমি ওড়াচ্ছি তোমায়; ইচ্ছে মতো সূতো ছাড়ছি, আবার নিচ্ছি গুটিয়ে।···তুমি যদি কেটে পড়বার চেষ্টা কর, তবে ভাসতে ভাসতে গিয়ে পড়বে জলে কিংবা আগুনে, নয় তো বা কোনো গাছে পালায় আটকে থেকে—রোদ জল শিশির খেয়ে বিবর্ণ হ'য়ে একটু একটু করে, খসে পড়বে মাটিতে;—পড়ে হ'য়ে যাবে ধুলো।—এই কথাটাই শুনতে পেলে নিমাই আকাশের আড়াল থেকে কে যেন বলছে।···

—শেষ—

পাটনা, ১৯শে এপ্রিল '৪১